কল্পনা

সমালোচনী মাসিক পত্রিকা।

ষষ্ঠ বৎসর।

নব বর্ষে।

তবে হেসে চাই, হেসে ছুটো গাই,
ধরণী সেজেছে কুসুম-সাজে।
এখনো যখন র'য়েছে জীবন,
কেন বই ফাঁক সুরেব মাঝে?
যা গেছে গিয়েছে, কি ক্ষতি হ'য়েছে
ভাঙা বীণা নয় বেসুরো বাজে।

চারি-দিকে গান, বিহ্বল পরাণ,
অলস নয়ান হরষে ভাসে;
চারিদিক হাসি, কাছে আসা আসি,
ভালবাসা-বাসি সরম পাশে।
পরি তবে মালা, হয় হোক্ জ্বালা,
গাই তবে—প্রাণে থামুক্ শ্বাসে।

সমীব শিহরে; বিহগ কুহরে;
তটিনী সুধীরে পড়িছে লুটে।
আকাশের ভালে মেঘের আড়ালে
সোণামুখী ঊষা উঠিছে ফুটে।
নিশার স্বপন, যতন, যাতন,
নিশি সনে—দিনে যায় না টুটে?

এলে কুজ্ঝটিকা, আসে অহমিকা,
গাছে তো তখন ডাকে না পাখী।
এলে অন্ধকার, ঘরে যে যাহার,
আলোকে বাহিরে ডাকি যে ডাকি।
বর্ষ ঘুরে গেল, ধরা ঘুরে এল,
আমার হৃদয় ঘুরিবে না কি!

শ্রীঅক্ষয় কুমার বড়াল।

বেদান্ত কি ?

কথাটা বুঝা যে বিশেষ কঠিন তাহা না হইলেও কথাটা বুঝিতে অনেকে বড গোল করে। সময়ে সময়ে কেহ কেহ এতদূর ভ্রান্ত হইয়া পড়েন যে বেদান্তকে এক স্বতন্ত্র দর্শনশাস্ত্র বলিতেও কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু বস্তুতঃ বেদান্ত স্বয়ং স্বতন্ত্র দর্শনশাস্ত্র নহে, ইহা দর্শনের একতম শাখা মাত্র। বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ বিভাগে সৃষ্টিপ্রকরণের যে সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহাই একত্র করিয়া ক্রমপর্য্যায়ে বুঝাইবার চেষ্টা বেদান্তে দেখিতে পাওয়া যায়। বেদান্ত অর্থাৎ বেদের যাহা অন্ত, সে অন্ত কি ? আমাদের জ্ঞানের শেষ সীমা একমাত্র সেই—একং-এব-অদ্বিতীয়ম্। এই জন্য বেদান্ত শব্দের অর্থ কি তাহা মোটামুটি বুঝিতে হইলে বুঝিতে হইবে, যাহাতে পরব্রহ্মের বিষয় উক্ত হইয়াছে তাহারই নাম বেদান্ত।

ঠিক সর্ব্বতোভাবে এক না হইলেও বেদান্তে ও উপনিষদে বড একটা বিশেষ তফাৎ বলিয়া বোধ হয় না। উপনিষদের অর্থ, উপ = নিকটে, এবং নিষদ = যে দণ্ডায়মান হয়, অর্থাৎ পরব্রহ্মের যাহা অতি নিকটবর্ত্তী। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে উপনিষদেও পরব্রহ্মের সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম তত্ত্ব সকল কথিত হইয়াছে। তবে একটা প্রভেদ এই যে বেদান্তে যে অর্থে "অন্ত" শব্দের প্রযোগ বুঝি, উপনিষদে তৎস্থলে সেই অর্থে "রহস্য" শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই। নহিলে উভয়ই বেদের শাখা মাত্র, উভয়ই মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণভাগে পরব্রহ্ম সম্বন্ধে যাহা কিছু উক্তি তাহার সাবল্য লইয়া রচিত। ঋক্‌বেদের দশম মণ্ডলের শেষ অধ্যায়ে এবং কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের আরণ্যকভাগে প্রথম এবং তৃতীয় প্রপাঠকে বর্ণিত পরব্রহ্মের অনেক কথা উভয়েতেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

কিন্তু উপনিষদ সংখ্যায় অনেকগুলি, বেদান্ত তাহা নহে। সচরাচর দশখানি উপনিষদের কথাই শুনা গিয়া থাকে, কিন্তু দক্ষিণ ভারতে অষ্টোত্তর শত উপনিষদের বিষয় কথিত হয়। কেহ কেহ ইহার সংখ্যা তিন শ পর্য্যন্তও গণনা করিয়া থাকেন। বলিতে পারা যায় না, এ গণনা কতদূর প্রামাণিক এবং বিশ্বাসযোগ্য; তবে ইহা বলা যায় যে যথার্থতঃ যদি

এতগুলি উপনিষদের অস্তিত্ব থাকে তাহা হইলেও বাস্তবিক তাহার সকলগুলি প্রকৃতপক্ষে উপনিষদ নহে। হইতে পারে, কোনও মহাত্মা স্বমত সমর্থনের জন্য একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া পশ্চাৎ তাহার নাম দিয়াছেন উপনিষদ্। শুনা যায়, "আল্লা উপনিষদ্" নামেও নাকি একখানি উপনিষদ্ এক সময়ে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া, এরূপ উপনিষদ্‌কে কি উপনিষদ্ সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে ? শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজ উভয়েই অসাধারণ ভাষ্যকর্ত্তা, উভয়কেই দশখানির বেশী আর উপনিষদের নাম করিতে দেখা যায় না। আর কি কথা কি, ভগবদ্গীতাকেও কেহ কেহ উপনিষদ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গীতা কি উপনিষদ ?

তা সে যাহাই হউক, উপনিষদের সহিত বেদান্তের খুব নিকট সম্বন্ধ। তবে উপনিষদের ন্যায় বেদান্ত সংখ্যায় বহুল না হইলেও সামান্য নহে। বেদান্ত অতি বিস্তৃত গ্রন্থ। সেই বিস্তৃত গ্রন্থের সমস্ত মত আয়ত্ত করা যার তার পক্ষে সহজ নহে। তাই একজন অসাধারণ বৈদান্তিক তাবৎ বেদান্ত মন্থন করিয়া সারভাগ লইয়া এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাহার নাম বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্মসূত্র। সেই ব্রহ্মসূত্র সম্বন্ধে কিছু সম্যক আলোচনা করিতেছি। বলিয়াছি, উপনিষদের সহিত বেদান্তের খুব নিকট সম্বন্ধ ; সুতরাং বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্মসূত্রের সঙ্গেও উপনিষদের অনেক ঘনিষ্ঠতা আছে। তাই ব্রহ্মসূত্রের প্রণেতা দশখানি উপনিষদের বিপরীতবাদী মতগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বুঝাইতে এত আয়াস স্বীকার করিয়াছেন, এবং তাই তাহার মীমাংসাকারগণ কোন কোন কূটতত্ত্ব মীমাংসা স্থলে এত উপনিষদের দোহাই দিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্র সমগ্র বেদান্ত দর্শনের সংক্ষিপ্তসার। এই গ্রন্থখানিতে চারিটী অধ্যায়, ষোলটী পদ এবং পাঁচ শত পঞ্চাশটী শ্লোক মাত্র আছে। গ্রন্থের কলেবর তত বড় নয়, কিন্তু গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় অতিশয় মহৎ। আশ্চর্য্য, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের অসংখ্য টীকাকার, অসংখ্য মীমাংসক, অসংখ্য ভাষ্যকর্ত্তা। সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্য্য এই যে, সেই ভাষ্যকারগণ কেহই সামান্য নহেন, সকলেই মহা মহা অসাধারণ পণ্ডিত, অথচ একজনের টীকার সহিত অন্য সকলের টীকা মিলে না, একজনের মীমাংসা সাধারণ মীমাংসা বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না, একজনের ভাষ্যের অন্যজন ভুল ধরে। এই ক্ষুদ্রকায় অসামান্য গ্রন্থে আছে কি ?

বলিয়াছি, ব্রহ্মসূত্র চারিটী অধ্যায়ে বিভক্ত; তাহার প্রথম অধ্যায়ে সাঙ্খ্য দর্শনের মত সকল অতি গভীর যুক্তির সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচারিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে গ্রন্থকর্ত্তা নিজের মত উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তাহার বিরোধী অন্যান্য দার্শনিকগণের মত সমূহ অতি সতর্কতার সহিত ধীরভাবে যুক্তিপূর্ণ ন্যায় মতে খণ্ডন করা হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে দ্বাত্রিংশৎ "বিদ্যা" অথবা 'উপাসনা' প্রণালী যথাক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে একমাত্র "মোক্ষ" সম্বন্ধেই নানা বিষয় কথিত হইয়াছে—মোক্ষ কাহাকে বলে, মোক্ষের পাত্র কে, কবে এবং কি অবস্থায় মোক্ষ লাভ হইতে পারে, মুক্ত ব্যক্তির লক্ষণই বা কি প্রকার ইত্যাকার নানা তত্ত্বকথার মীমাংসা করিয়া শেষ অধ্যায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে। লেখক অশেষ চিন্তাশক্তির ও বুদ্ধিশক্তির পরিচয় দিয়া শেষ স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য বদরি, অশ্মরথ্য, জৈমিনি কাকুৎস্থ, বদরায়ণ প্রভৃতি প্রথিতনামা দার্শনিকশ্রেষ্ঠ অনেক ঋষির মত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। সুতরাং স্পষ্ট প্রতীত হয় যে ব্রহ্মসূত্র যখন লিখিত হইয়াছিল তখন মহা মহা দার্শনিকের অগণ্য মত প্রচলিত সম্মানিত এবং সমর্থিত হইত, কিন্তু সেই মহা মহা দার্শনিকের মতসিন্ধু যে ব্যক্তির ক্ষুদ্র লোষ্ট্রনিক্ষেপে সংক্ষুভিত হইয়া উঠিয়াছিল সে কখনই সামান্য নহে। সে অসামান্য মতগুরু কে?

এই খানে বড়ই মতবিরোধ দেখা গিয়া থাকে। নানা মুনি, নানা মত। স্কন্দপুরাণ এবং গরুড় পুরাণের মতে ব্রহ্মসূত্রের প্রণেতা স্বয়ং বেদব্যাস। তবে সে গ্রন্থ মধ্যে প্রণেতা স্বমত সমর্থনের জন্য বদরায়ণের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার জন্য অনেকে স্কন্দপুরাণ এবং গরুড়পুরাণের কথা বিশ্বাস করেন না। বদরায়ণ এবং বেদব্যাস একই ব্যক্তি; সুতরাং তাঁহাদের মতে বেদব্যাসের ন্যায় লোকের পক্ষে নিজে নিজের মত তুলিয়া স্বপক্ষের পোষকতা করা কখনই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। কেহ বলেন, তাহাতেই বা দোষ কি? তিনি সত্যই কেবল আপনার মতটিই তুলেন নাই, তাহার সঙ্গে আরও অনেক মহারথীর মতও উদ্ধৃত করিয়াছেন, তবে কোন ও একস্থানে যাহা বহু আয়াস সহকারে একবার বুঝাইয়াছেন এবং যাহা সাধারণের গৃহীত ও আদৃত হইয়া একবার দাঁড়াইয়া গিয়াছে তাহা আবার অন্যত্র স্বতন্ত্র ভাবে না বুঝাইয়া পূর্ব্বকথিত কথা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। ইহা ধরিয়া বেদব্যাসের লেখকত্ব

অস্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। কেহ বলেন বৃহদারণ্যক উপনিষদে গুরু বংশের তালিকা মধ্যে যে বদরায়ণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা পরাশরাত্মজ বেদব্যাস নহে,—সে স্বতন্ত্র ব্যক্তি, তবে বদরায়ণের মত উদ্ধারের জন্য বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র লেখেন নাই, ইহা কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে? কেহ কেহ গোল মিটাইতে গিয়া বলেন, অবশ্য ইহা কোন প্রসিদ্ধ বৈদান্তিকের লেখা, তিনি হয়তঃ বেদব্যাস বা বদরায়ণের শিষ্য ছিলেন, শেষ এই গ্রন্থ রচনা করিয়া গুরুর নামে প্রচার করিয়া থাকিবেন। শিষ্য গ্রন্থ লিখিয়া গুরুর নামে তাহা প্রচার করার পদ্ধতিটা তখন বিরল ছিল না।

প্রচার-শক ধরিয়াও ইহার মীমাংসা করা বড় শক্ত কথা। জানি না, সে সময় কেহ কখন ঠিক নিরূপিত করিতে পারিবে কি না। পাণিনি তাঁহার ব্যাকরণের এক স্থানে এই গ্রন্থের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার মতে ইহার প্রণেতা পরাশরপুত্র। সুতরাং বেদব্যাসই যে গ্রন্থের প্রণেতা ইহা একরূপ নানা বিরোধী মত সত্ত্বেও বুঝা গিয়া থাকে। কথাসরিৎসাগরে দেখা যায়, পাণিনির এক গুরু ছিলেন, তাঁহার নাম উপবর্ষ। উপবর্ষ আবার ব্রহ্মসূত্রের একজন টীকাকার। সুতরাং ব্রহ্মসূত্র যে পানিনির অনেক পূর্ব্বের গ্রন্থ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ব্রহ্মসূত্রের আর এক জন বিখ্যাত টীকাকারের নাম বোধায়ণ। বোধায়ণ ঋষি ব্যাসের শিষ্য ছিলেন। সুতরাং বোধায়ণের কথা যদি অপেক্ষাকৃত অনেক প্রামাণ্য বলিয়া মানিতে হয়, তাহা হইলে বেদব্যাসই যে ব্রহ্মসূত্রের প্রণেতা সে বিষয়ে আর বিশেষ সংশয় থাকে না। শঙ্করাচার্য্য যদিও তাঁহার টীকায় এ সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ কোনও মত প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু দ্রাবিড়াচার্য্য, ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চ, ভর্ত্তৃহরি, ভর্ত্তৃদত্ত প্রভৃতি টীকাকারগণের উক্তিতে ইহার অনেক আভাস পাওয়া যায়।

সেই অসামান্য পুরুষের অসামান্য গ্রন্থ স্বয়ং ক্ষুদ্র হইয়াও বৃহৎ বৃহৎ মতবাদের জন্মহেতু; নিজে এক হইয়াও বহু পাত্রে বহু ফলপ্রদানকারী। সেই সার্দ্ধ পঞ্চশত শ্লোক মাত্রের ভাষ্য করিয়া শঙ্করাচার্য্য যেমন অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তেমনি তাহাই মাত্র অবলম্বন করিয়া রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, মাধবাচার্য্য আনন্দতীর্থের দ্বৈতবাদ, শ্রীকণ্ঠ শিবাচার্য্যের শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং বল্লভাচার্য্যের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এই সমস্ত

মতবাদ এক একটি এক এক দিন সমস্ত দর্শনজগৎ আমূল আলোড়িত করিয়াছিল, আজিও তাহা এক একটি দর্শনশাস্ত্রের চরম তত্ত্ব ও মনুষ্য মস্তিকের অপূর্ব্ব আবিষ্কার বলিয়া সমগ্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ে পরিকীর্ত্তিত হইতেছে। সেই সকল যে মহামণির এক একটু কনিকামাত্র না জানি সেই মহামণির অধিকারী কি অলোকসামান্য পুরুষ! না জানি সেই আগাধসত্ব তত্ত্বদর্শী কতই শক্তি ধারণ করিতেন।

ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্র পাঠে আমরা কি উপদেশ শিক্ষা করিতে পারি, অতঃপর তাহা মোটামুটি কতকটা বলিতেছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পরব্রহ্মের বিষয়ই ইহাতে সম্যক্ আলোচিত হইয়াছে। সেই পরব্রহ্মের সত্তা দুই ভাগে বিভক্ত। এক প্রকাশ অপর অপ্রকাশ। পরব্রহ্ম সম্বন্ধে যতদূর আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত তাহা তাঁহার প্রকাশভাগ লইয়া। আর সেই অপ্রকাশভাগ আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি মনুষ্য আমাদের সমস্ত চিন্তাশক্তি ও যুক্তিশক্তি ব্যয়িত করিয়াও কিছুই উপলব্ধি করিতে পারি না। আর সেই প্রকাশভাবও আমরা বুঝিতে পারি যখন আমরা তাঁহাকে সকল শক্তির কেন্দ্র বলিয়া জানিতে পারি। সেই সময়ে আমরা তাঁহার নাম দিই ঈশ্বর। দর্শনে তাঁহার আর এক নাম আছে, তাহা পরমাত্মা। সেই পরমাত্মার জ্ঞান পরমাত্মজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু আত্মা ও পরব্রহ্ম এক হইলেও যখন আত্মা দেহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হয় তখন আর দুইজনে পূর্ব্ববৎ এক নহে। তখন আত্মা ও পরব্রহ্ম দুই জনে দুই জন। তখন এমনই পার্থক্য আসিয়া উপস্থিত হয় যে যাহারা এতকাল এক হইয়া অবস্থান করিতেছিল তাহাদের মধ্যে ব্যবধান বহুযোজনব্যাপী হইয়া পড়ে, পরব্রহ্ম কোথায় তাহার সংবাদও মিলে না। মাঝখানে প্রকৃতি আসিয়া তাহার ভীষণ দেহের বিস্তার লইয়া আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। এই দুষ্ট প্রকৃতিই যত নষ্টের মূল। এই জন্য পণ্ডিতে ইহার নাম দিয়াছেন, অবিদ্যা, অজ্ঞান বা মায়া। এই প্রকৃতিকে পরাজয় করিয়া তাহাকে পিছাইয়া আত্মা যাহাতে পরমাত্মার সহিত পুনর্মিলিত হইতে পারে, তাহাই তখন ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া পড়ে, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধন জন্য ইহা অনবরত ইহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে থাকে। এই চেষ্টার জন্যই সৃষ্টি মধ্যে ক্রমবিকাশ পদ্ধতি চলিতেছে। এই চেষ্টার অন্য নাম মহাচৈতন্য। সংক্ষেপতঃ জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ের

মধ্যে সম্বন্ধ বিচারই বেদান্তসূত্রের একমাত্র শিক্ষা এবং উপদেশ। সেই সম্বন্ধে বিচার করিয়া চলিতে যে পারিয়াছে সেই যথার্থ বেদান্তসূত্র পড়িয়াছে।

বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্মসূত্র পড়িয়াছে অনেকে কিন্তু তাহা পড়িয়া যথার্থ শিক্ষা-লাভ করিতে পারিয়াছে অতি অল্পমাত্র লোকে। সেই অল্পমিত লোকের মধ্যে প্রধানস্বামী শঙ্করাচার্য্য। শঙ্কর অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। আর আর যে মহাত্মা ইহা পাঠে যেরূপ মতের প্রচলন করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে অদ্বৈতবাদিরা বলেন, জীবাত্মা পরমাত্মার প্রতিকৃতি মাত্র। তাহাদের মধ্যে প্রভেদ এই যে জীবাত্মা বদ্ধ আর পরমাত্মা মুক্ত! জীবাত্মার এই বদ্ধভাব মায়া-জন্য। জ্ঞানে এই মায়া বা অজ্ঞান নষ্ট হয়। জীবাত্মা যদি সেই জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন তবেই পরমাত্মার সহিত পুনর্মিলিত হইবার সম্ভাবনা, নহিলে অন্য গতি নাই। অদ্বৈতবাদীগণের মতে—জীবদেহ—যাহা জীবাত্মার আবরণ স্বরূপ—পঞ্চকোষে বিভক্ত। সেই পঞ্চকোষের নাম অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ আর আনন্দ-ময় কোষ। পূর্ব্বের চারিটী কোষ জীবাত্মা ক্রমান্বয়ে অতিক্রম করিয়া তবে শেষ আনন্দময় কোষে উপনীত হইতে পারে। যে জীবাত্মা পূর্ব্বের চারি কোষ অতিক্রম করিতে পারে না সে সেই আনন্দধামের সদানন্দ-ময়তা আস্বাদন করিতে পারে না। সে চিরদিন বদ্ধাবস্থায় কালযাপন করে। অদ্বৈতবাদীগণ আরও বলেন, এই পঞ্চকোষ অতিক্রম করিতে হইলে জীবাত্মাকে তিনটী শরীর পর্য্যায় ধারণ করিতে হয়। সে তিন শরীরের নাম, স্থুল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর, ও কারণ শরীর। কেহ আবার এই তিন শরীরকে তিন অবস্থা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। সে তিন অবস্থার নাম—জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি। সুষুপ্তি অবস্থায় আর কোনও চৈতন্য থাকে না, সমস্ত সত্ত্বা সুপ্তিতে ডুবিয়া যায়, তখন আত্মা সেই অবিদ্যা-রূপিনী প্রকৃতিকে পরাজয় করিয়া দৈবীপ্রকৃতি লাভ করতঃ পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হয়েন।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীগণের মতে আবার জীবাত্মা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। নিত্য, মুক্ত ও বদ্ধ। নিত্য তাঁহারা যাঁহারা কর্ম্মের অবশীভূত হইয়া চিরদিন সমভাবে অনন্ত সুখের অধিকারী। যাঁহারা জ্ঞানপ্রভাবে মায়াময়ী প্রকৃতির ইন্দ্রজাল ছিন্ন করিয়া সমস্ত দুঃখ ক্লেশ জয় করিয়া মোক্ষ লাভ

করিতে পারিয়াছেন তাঁহারা মুক্ত। আর যাঁহারা কর্ম্মের অধীন, সুতরাং জগতের সমস্ত দুঃখদারিদ্রের সম্পূর্ণ বশতাপন্ন তাহাদিগকে বদ্ধ কহিয়া থাকে। এক মোক্ষ আবার রামানুজের মতে চারি প্রকার। কৈবল্য, সাযুজ্য, সালোক্য এবং সারূপ্য। জীব যখন আপন স্বভাবেই অনন্ত সুখ-ভোগ করে তখন তাহাকে কৈবল্য বলে। সাযুজ্যের অপর নাম ব্রহ্মানন্দ, অর্থাৎ পরব্রহ্মের সমান জীব যখন পূর্ণানন্দ উপভোগ করে। সালোক্য অর্থে পরব্রহ্মের সহিত জীবের এক লোকে বাস। আর সারূপ্য মোক্ষের চরম সীমা, জীব তখন পরব্রহ্মের সহিত অভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া ভূমানন্দ উপভোগ করিতে থাকে। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীগণের মতে আবার মোক্ষ তিন উপায়ে লাভ করা যাইতে পারে। কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তি-যোগ। এই তিন উপায়ের মধ্যে ভক্তিযোগই সর্ব্বশেষ এবং সর্ব্বপ্রধান। ভক্তি বিনা জীবের মুক্তি অসম্ভবনীয়।

ভক্তির মহিমা অনন্ত। দার্শনিকের কূটতত্ত্ব সকলের কূট মীমাংসা কিছু না বুঝিয়াও ইতর সাধারণ সকলেই ভক্তির মাহাত্ম্য চিরকালই গাহিয়া আসিতেছে। "ভক্তি বিনা মুক্তি নাই" এ কথা যেমন দার্শনিকের তেমনি সাধারণের। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয় সুহৃদ্ ধনঞ্জয়কে কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, সন্ন্যাসযোগ প্রভৃতি নানা যোগের কথা বুঝাইয়া শেষ ভক্তিযোগের মাহাত্ম্য কহিয়াছেন।

ভগবান্ বলিয়াছেন,

মায্যাবেশ্য মনো যেষাং নিত্যযুক্তা উপাসতে
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ।

অতএব, হে পার্থ,

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥

কিন্তু ভক্তি বিনা জীবের মুক্তির অন্য উপায় যে আর নাই তাহা ভগবান বলেন না। তিনি অর্জ্জুনকে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইয়া শেষ আবার বলিয়াছেন,

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরং
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥

এইখানে বৈদান্তিক মতের অপেক্ষা গীতোক্ত মতের শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করিতে পারা যায়। ভগবান্ জানেন, ভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বসার হইলেও ভক্তিমার্গ অবলম্বন বড়ই কঠিন। কথায় জ্ঞানী অনেকেই হইতে পারে, কিন্তু এতকাল ধরিয়া যে পৃথিবী চলিয়া আসিতেছে ইহার মধ্যে কয় জন নারদ জন্মিয়াছে ? সাধকের মধ্যে কয় জন ধ্রুব প্রহ্লাদ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে ? ভক্তিযোগ বড়ই কঠিন যোগ। কিন্তু, তাই বলিয়া কি জীবের মুক্তি হইবে না ? এই জন্য গীতার ন্যায় মহোচ্চ এবং মহোদার ধর্ম্মগ্রন্থ আর নাই। বেদ বল, বেদান্ত বল, সকলেই মনুষ্যের উক্তি, আর গীতায় স্বয়ং ভগবানের উক্তি।

তা, সে যাহা হউক, বেদান্তে ভক্তির প্রাধান্য বিশেষরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। মাধবাচার্য্য আবার এই ভক্তি লাভের জন্য নয় প্রকার পাপ পরিত্যাগের বিধি দিয়াছেন। সে নয় প্রকার পাপ মনুষ্যের নয় প্রকার ভ্রমপূর্ণ ধারণা। যথা—

(১) ঈশ্বর এবং জীব সমতুল্য ;

(২) ঈশ্বর নির্গুণ,

(৩) ঈশ্বরে যদি কিছু গুণ থাকে তাহা অসম্পূর্ণ,

(৪) ঈশ্বরের সমকক্ষ আরও কিছু আছে,

(৫) ঈশ্বর হইতে শ্রেষ্ঠও কেহ আছেন,

(৬) ঈশ্বর তাঁহার অবতার হইতে বিভিন্ন ;

(৭) অবতারে ঈশ্বরত্ব আরোপ অযৌক্তিক, তাহারা মনুষ্য মাত্র ;

(৮) ভক্তের নিন্দা

(৯) ঈশ্বরের সর্ব্বপ্রভুত্ব অস্বীকার। এই নয় প্রকার দোষ পরিহার করিতে হইবে ইহার বিপরীত নয় প্রকার গুণ দ্বারা, তবে মানুষ যথার্থ ভক্তির অধিকারী হইতে পারিবে।

আসল কথা, ভক্তিযোগই বল, আর জ্ঞানযোগই বল, বৈদান্তিক মতে যে কোন উপায়ে মায়াময়ী প্রকৃতিকে পরাজয় না করিলে জীবাত্মার পরমাত্মার সহিত মিলনের উপায় নাই। স্বয়ং শঙ্কর বলেন এই মায়াপাশ ছিন্ন

করিবার জন্য চারি প্রকার অস্ত্র প্রয়োগ করা বিধেয়। বিবেক, বৈরাগ্য, ষট্ সম্পত্তি এবং মুমুক্ষা। ষট্ সম্পত্তি কি কি? না, চিত্তজয়, ইন্দ্রিয়জয়, নিঃস্পৃহা, সুখদুঃখে সমজ্ঞান, গুরুভক্তি এবং চিত্তস্থৈর্য্য। বিবেক ও বৈরাগ্য বলে এই ষট্ সম্পত্তি লাভ হইলে পর মানুষের যে মুমুক্ষা জন্মিবে, তাহারই সাধনে তখন সে মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম হইবে। তখনই আত্মার বদ্ধাবস্থা ঘুচিয়া গিয়া পরমাত্মার সহিত পুনর্মিলিত হইতে পারিবে। তখনই সেই অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইবে যখন আনন্দময়ের মিলনে আনন্দরূপ ধারণ করিয়া চিরানন্দ উপভোগ করিতে থাকিবে। বৈদান্তিকের মতে এই অবস্থা জীবাত্মার চরম অবস্থা। এই অবস্থার নামই মুক্তি বা ব্রহ্ম প্রাপ্তি। যে মুক্ত বৈদান্তিকের মতে সেই যথার্থ "সোঽহং।" যে শাস্ত্র এই মহামূল্য শিক্ষা ও উপদেশে পূর্ণ তাহার ন্যায় মহোচ্চ শাস্ত্র আর কি আছে? কুক্ষণে দর্শনের কতকগুলা জটিল কথা পাড়িয়া মানুষ এমন মত সকলও ভুলিয়া যাইতে শিখিতেছে। তেমন আশা নাই, যে আবার কোন দ্বিতীয় শঙ্কর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবেন, কিন্তু তাহা না হইলেও বেদান্তের চর্চ্চার যাহাতে বহুল প্রচার হয় তাহা অন্তরের সহিত কামনা করি।

বাঙ্গালায় উপন্যাস-লেখক।

আজ কাল বাঙ্গালায় উপন্যাসের ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। দিন নাই রাত্রি নাই মুদ্রাযন্ত্র ক্রমাগতই অজস্র উপন্যাস প্রসব করিতেছে। প্রথমে কবিতা লেখার একটা বড় ঢেউ উঠে, তখন কেনারাম মণ্ডল হইতে বীরেশ্বর তর্কপঞ্চানন পর্য্যন্ত সকলেই কবি। সে ঢেউ গিয়াছে বটে কিন্তু এখনও তাহার শেষ একেবারে মরে নাই। এখনও স্থানে স্থানে দু একটা ক্ষুদ্র বীচি ফুট কাটিয়া উঠিতেছে। মাঝখান হইতে নাটক লেখার বড়ই একটা তুফান উঠিয়াছিল; সে তুফান দিন কতক ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ অনেককে নাকানি চোবানি খাওয়াইয়া এখন একেবারে থামিয়া গিয়াছে। কিন্তু

বিশাল জলধি হৃদয় কখনই স্থির থাকিবার নহে। নাটক গিয়াছে, আবার উপন্যাসের স্রোত উজানে বহিয়াছে। এখন উপন্যাসের স্রোতে বাঙ্গালা তোলপাড়। তখন যেমন অক্ষর গণিয়া কবিতা হইত কথাবার্ত্তার উত্তর প্রত্যুত্তর থাকিলেই নাটক হইত, এখন সেইরূপ একটা গল্প হইলেই তাহাকে উপন্যাস (Novel) বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়া থাকে। এখন এই উপন্যাসের স্রোতে মুদ্রাযন্ত্র চালিত, পুস্তকবিক্রেতা পালিত, ক্রেতৃগণ প্রতারিত, বাঙ্গালার যুবকযুবতী শিক্ষিত এবং সমালোচক বড়ই ব্যতিব্যস্ত। ইংরাজিতে যাহাকে Novel বা Fiction বলে, আমরা সেই অর্থে এখানে ' উপন্যাস " আর Story বা Tale শব্দের পরিবর্ত্তে ' গল্প ' কথা ব্যবহার করিতেছি।

প্রথমে কথা হইতেছে উপন্যাস কাহাকে বলে ? বিবিধ আশ্চর্য্য ঘটনা পরিপূর্ণ যুবক যুবতীর প্রণয়মূলক গল্প হইলেই কি তাহাকে উপন্যাস বলিতে হইবে ? যদি ইহাই উপন্যাস হয় তবে Arabian Nights একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস। কিন্তু Arabian Nights উপন্যাস বা Novel নহে। বাঙ্গালায় ইহার "আরব্যোপন্যাস" কেন নাম হইল তাহা বলিতে পারি না। মানবচরিত্রের বিশ্লেষণকেই আমরা উপন্যাস আখ্যা প্রদান করিব। ইহা প্রণয় বা অন্য যে কোন বৃত্তিমূলক হউক না কেন, যদি গ্রন্থকার তাহা বিশ্লেষণ করিতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তবে তিনিই একজন প্রকৃত উপন্যাস-লেখক। অনেকের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস যে প্রণয় ভিন্ন উপন্যাস হইতে পারে না ; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম। তবে, প্রণয় মানব চরিত্রের একটি উৎকৃষ্ট বৃত্তি বলিয়া উপন্যাস-লেখকগণ প্রণয়ের এতদূর প্রাধান্য স্বীকার করিয়া থাকেন। Victor Hugo র Les Miserables নিতান্ত প্রণয়মূলক না হইলেও ফরাসী ভাষায় ইহা একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস। কিন্তু এ পোড়া বাঙ্গালা দেশে যুবক যুবতীর অপূর্ব্ব সম্মিলন না হইলে আর উপন্যাস হয় না।

উপন্যাস জিনিষটা খাঁটি ইউরোপের আমদানি। সুতরাং ইউরোপীয় উপন্যাসের সহিত বাঙ্গালার উপন্যাস একবার মিলাইয়া দেখা উচিত। প্রথমে ইউরোপে Romanceএর বড়ই ধুম দেখা গিয়াছিল, সেই কারণেই Cervantesএর Don Quixoteএর উৎপত্তি। ক্রমে সেই অমানুষিক অদ্ভুত ঘটনামূলক উপন্যাস পাঠ করিতে আর লোকের প্রবৃত্তি হইল না। এই সময় হইতে আর এক শ্রেণীর উপন্যাস বাহির হইল। সে উপন্যাসে মনুষ্য

জীবনের যথাযথ ঘটনা সকল বর্ণিত হইত। * ইহাতে সাংসারিক মনুষ্য-জীবনের দোষ-গুণ মিশ্রিত চরিত্র সকল অবিকল অঙ্কিত হইত। ইহা কবির কল্পনাবর্জ্জিত, সাংসারিক চরিত্রের স্বরূপবর্ণন। Cervantes এবং Le Sage এই শ্রেণীর উপন্যাস লেখক, এবং অধিকাংশে Smollet এবং Fielding এই পথ অনুসরণ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী প্রতিভাশালী উপন্যাস-লেখকদিগের মধ্যে Dickens ও একজন কতকাংশে এই শ্রেণীর উপন্যাস লেখকের মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু উপন্যাসের এ অবস্থা অধিক দিন থাকিতে পারে না। কারণ, প্রথমতঃ অনেক স্থলে পাঠকবর্গের রুচির অনুবর্ত্তী হইয়া লেখকের প্রতিভাকে প্রকাশ পাইতে হয়। দ্বিতীয়তঃ উপন্যাস লেখকের পাঠক মাত্রেই প্রায় অল্পবয়স্ক যুবক যুবতী, ইহাদের অন্যান্য বৃত্তি অপেক্ষা প্রণয় বৃত্তিই তখন বিশেষ প্রবল থাকে, সুতরাং উপন্যাস-লেখককে পাঠকের রুচির বশবর্ত্তী হইয়াও উপন্যাসকে প্রণয়মূলক করিতে বাধ্য হইতে হয়। আবার সে প্রণয়চিত্রে একটু নূতনত্ব থাকা আবশ্যক। সুতরাং উপন্যাস লেখকের কল্পনা-শক্তির পরিচয় চাই, উপন্যাসে শিক্ষা চাই, আদর্শ চরিত্রের সৃষ্টি চাই। এদিকে আবার যাহা লইয়া দিন রাত্রি ঘরকন্না করিতেছি, যে সব বিষয়ে জন্মিয়া অবধি হাড় ভাজা ভাজা হইতেছে, তাহা আর উপন্যাসেও পড়িতে আর কত দিন ভাল লাগিবে? ক্রমে মাত্র সাংসারিক ঘটনা-মূলক প্রণয়চিত্রে অথবা অন্য কোন বৃত্তিমূলক চিত্রে পাঠকের চিত্তকে আর সেরূপ আকর্ষণ করিতে পারিল না।

এই সময়ে আর এক শ্রেণীর উপন্যাস লেখকের সৃষ্টি হইল। Sir Walter Scottই ইহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। এই শ্রেণীর উপন্যাস অনেকটা Romance মিশ্রিত। ইহা কতকাংশে আশ্চর্য্য ঘটনা, আশ্চর্য্য প্রণয়, এবং অমানুষিক কাণ্ডকারখানায় পরিপূর্ণ। উপন্যাসের নায়ক নায়িকার রুচি উপন্যাস লেখকের রুচি, শিক্ষা এবং কল্পনাশক্তি অনুযায়ী উৎকর্ষতা লাভ করিয়া থাকে। এইরূপ অঙ্কিত চরিত্র সকল এ সংসারে অসম্ভব না হইলেও সচরাচর বড় দেখিতে

* One of these, which we may call the *ubiquitous*, aims at describing the whole of human life in all its spheres, in all its aspects, with all its varied interests, aims and objects. It searches through the whole life of man his practical pursuits, his speculative attempts, his romantic youth, and his domestic age. It gives an entire picture of these &c—*Walter Bagehot.*

পাওয়া যায় না। এই শ্রেণীর উপন্যাস প্রায়ই আদর্শ চরিত্রে (Ideal character) পূর্ণ থাকে। ইহা সাংসারিক অনেক জীবনের স্বরূপ চিত্র নহে, ইহা অনেক স্থলেই লেখকের কাল্পনিক চরিত্র। আজ কাল ইউরোপে এই শ্রেণীর উপন্যাসেরই আদর অধিক। তবে, বর্ত্তমান লেখকগণ ইহার উপর আরও কিছু রং চড়াইয়াছেন। তাঁহারা উপন্যাসে মানব চরিত্র বিশ্লেষণে প্রকৃত দর্শন বিজ্ঞানের অবতারণা আরম্ভ করিয়াছেন। George Elliot এই শ্রেণীর অগ্রণী, Elliot এর আদর আজ বিলাতে ধরে না।

বাঙ্গালা দর্শন বিজ্ঞানে আজ জড়বুদ্ধি, সুতরাং দর্শন বিজ্ঞান ব্যতিরিক্ত এই শেষোক্ত শ্রেণীর উপন্যাসেরই প্রাদুর্ভাব আজ বাঙ্গালায় দেখিতে পাওয়া যায়। খাঁটি romance বাঙ্গালায় নাই। Smollett বা Fielding এর ধরণের উপন্যাসও বাঙ্গালায় বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। বাঙ্গালার প্রথম উপন্যাস শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত "ঐতিহাসিক গল্প।" ইহাতে কতকটা romance এর ছায়া দেখিতে পাই বটে, কিন্তু ইহার উপর আমরা কোন বিশেষ মতামত প্রকাশ করিব না। তবে বাঙ্গালা উপন্যাসের জন্মদাতা বলিয়া চিরকাল তাঁহার পূজা করিব।

বাঙ্গালা সাহিত্যে বাঙ্গালা উপন্যাস এখনও বড় শিশু, ইহার বয়ঃক্রম বড় জোর পঞ্চবিংশতি বৎসর। কিন্তু ইহারই মধ্যে এই শিশুর রূপ দেখিয়া অনেকে মোহিত হইয়াছেন। বড় আহ্লাদের বিষয় যে সংখ্যায় দুই একটি হইলেও বাঙ্গালায় উৎকৃষ্ট উপন্যাস-লেখক আছেন। তাঁহারা দুগ্ধ পান করাইয়া এই শিশুর অঙ্গসৌষ্ঠব দিন দিন বৃদ্ধি করিতেছেন। কিন্তু এদিকে আবার দেখিতে দেখিতে আর একদল মহাপরাক্রমশালী উপন্যাস-লেখকগণ আসরে নামিয়াছেন, তাঁহারা এই শিশুকে দুগ্ধের পরিবর্ত্তে বিষদানে অথবা গলা টিপিয়াই মারিবার চেষ্টায় আছেন। বাঙ্গালা উপন্যাসে সুলেখকের সংখ্যা অপেক্ষা কুলেখকের সংখ্যা এত অধিক, যে এই উপন্যাসের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান হইয়াছেন। এবং সেই জন্যই বাঙ্গালার উপন্যাসের ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই আজ আমরা এই প্রবন্ধে হস্তার্পণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভরসা করি, স্থানে স্থানে আমাদের দুই একটা কথা কটু বোধ হইলেও লেখকগণ আমাদিগের প্রতি রুষ্ট হইবেন না, ঔষধ কটু হইলেও ভবিষ্যতে দেহকে নির্ব্যাধি করে।

প্রত্যেক উপন্যাস-লেখকের তিনটী বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। (১ম)—উপন্যাসের চরিত্র, (২য়)—উপন্যাসের ভাষা, (৩য়)—উপন্যাসের গল্প। আমরা বলি চরিত্রই উপন্যাসের জীবন, ভাষা তাহার বাহ্যিক পরিচ্ছদ, এবং গল্প তাহার দেহ। সুতরাং ভাষার লালিত্যই বল, আর গল্পের মনোহারিণী শক্তিই বল, উপন্যাস-লেখক চরিত্র-গঠনে সুনিপুণ না হইলে আর তাঁহাকে একজন উচ্চদরের উপন্যাস-লেখক বলিতে পারা যায় না।

মানব-চরিত্র চিত্রিত করিতে বঙ্কিম বাবু একজন অদ্বিতীয় চিত্রকর। তাঁহার কোন্ চিত্র রাখিয়া কোন্ চিত্রের প্রশংসা করিব? তিনি প্রত্যেক চিত্রে এক একটি নূতন সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা মানবচরিত্র বিশ্লেষণকেই উপন্যাস আখ্যা প্রদান করিয়াছি। এই মানবচরিত্র বিশ্লেষণে বঙ্কিম বাবু যতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, আর কাহাকেও এতদূর কৃতকার্য্য হইতে দেখি নাই। সুতরাং বাঙ্গালার উপন্যাসে সর্ব্বোচ্চ আসন আমরা বঙ্কিম বাবু ভিন্ন আর কাহাকেও দিতে প্রস্তুত নহি। তাঁহার প্রতিভা বড় উচ্চদরের। তাঁহার উপন্যাস গুলি জীবন্তভাবে পরিপূর্ণ, এরূপ ভাবমূলক উপন্যাসলেখক বাঙ্গালায়তো নাই এবং অন্যান্য ভাষায়ও অতি অল্পই দেখা যায়।

তাঁহার ভাষাও উপন্যাসের উপযোগী। কোথাও কাঁটা খোঁচা বাধে না, পড়িতে কোন কষ্ট নাই, অথচ আনন্দ অপরিসীম। ইংরাজিতে যাহাকে Witticism বলে বঙ্কিম বাবুর ভাষায় তাহা বিলক্ষণ আছে। আরো প্রশংসার বিষয় এই যে তিনি স্বয়ং এই ভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা। বঙ্কিম বাবু যে ভাষায় উপন্যাস লেখেন, সে ভাষা বঙ্কিম বাবুর নিজের সম্পত্তি। গল্পাংশেও বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস গুলি অতি সুন্দর। তিনি গল্পরচনা কৌশলেও বিলক্ষণ সিদ্ধহস্ত। তিনি আপনার উপন্যাসের চরিত্রানুযায়ী গল্প বেশ রচনা করিয়া লইতে পারেন। কি ঐতিহাসিক কি সামাজিক সকল প্রকার গল্প রচনাতেই তিনি বিলক্ষণ পারদর্শী। উপন্যাসের যাহা কিছু art তাহা তাঁহার অনায়াসলভ্য; সুতরাং উপন্যাস লেখকের সকল গুণই তাঁহাতে বর্ত্তিয়াছে।

ইংরাজ উপন্যাস-লেখকদিগের মধ্যে কাহার সহিত যে বঙ্কিম বাবুর সাদৃশ্য আছে, তাহা আমরা ভাবিয়া ঠিক করিয়া উঠিতে পারি না

আমাদের বোধ হয়, কাহারও সহিতই নাই। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে বঙ্কিম বাবু Sir Walter Scott এর ধরণের উপন্যাস লেখক। কিন্তু কথাটা ঠিক নহে। Scott এর উপন্যাস কেবল মনুষ্যজীবনের sentimental part লইয়া নহে। তাঁহার উপন্যাসে সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা, বিস্ময়জনক কার্য্যকলাপ, অতীত সমাজের উজ্জ্বল চিত্র, পূর্ব্বকালীন আচার ব্যবহার, রীতি নীতি প্রভৃতি বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার নায়ক যে জঙ্গলে বেড়াইয়া বেড়ায়, আমরা সে জঙ্গল পর্য্যন্ত ভুলিতে পারি না, তাহাও আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া যায়। ফল কথা, Scott এর উপন্যাসে মানবপ্রকৃতি এবং বাহ্য প্রকৃতি সমভাবে বর্ণিত। কিন্তু বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস গুলি এ ধরণের নয়। তাঁহার উপন্যাসে sentimental part অধিক। তিনি একজন ভাবমূলক উপন্যাস লেখক। তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসে তৎকালীন সামাজিক আচার ব্যবহার, রীতি নীতি Scott এর উপন্যাসের ন্যায় সুন্দররূপে চিত্রিত নহে। Scott এর উপন্যাস পড়িতে পড়িতে আমরা বর্ত্তমান সমাজ ভুলিয়া গিয়া তাঁহার উপন্যাসবর্ণিত সমাজের মধ্যে মিশিয়া যাই, কিন্তু বঙ্কিম বাবুর কোন ঐতিহাসিক উপন্যাস এরূপ ধরণের নহে। তাঁহার প্রাচীন ঐতিহাসিক গল্পেও বর্ত্তমান সমাজের আচার পদ্ধতির গন্ধ অনুভূত হয়। লেখকের ইহা অবশ্যই গুণের কথা নহে। কিন্তু তিনি মানবপ্রকৃতি বর্ণনায়ই ব্যস্ত, তাহাতেই নিবিষ্টচিত্ত; বুঝি তাই বাহিরের ঘটনা লক্ষ্যের বিষয়ীভূত হইলেও সেদিকে ততটা দৃষ্টি থাকে না। তাঁহার সমস্ত রচনাকৌশল সেই মানবপ্রকৃতি বর্ণনায়ই নিয়োজিত হইয়া থাকে। তবে বাহ্যিক ঘটনার সহিত সেই মানবপ্রকৃতির আন্তরিক ভাবের সম্বন্ধ কি তাহা আমরা বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসে বেশ দেখিতে পাই। Scott এর উপন্যাসে যেরূপ অধিক মাত্রায় romance মিশ্রিত, বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসে সেরূপ অধিক মাত্রায় romance মিশ্রিত নাই। বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসে ঘরকন্নার কথা অনেক আছে, অথচ তাহা আদর্শ চরিত্রে পূর্ণ। আমরা অতঃপর একে একে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি।

(ক্রমশঃ)

বংশাবলি।

ইয়ুরোপ ও আমেরিকার যে যে কারণে অভ্যুদয় হইয়াছে, ইতিহাস, জীবনচরিত, বংশানুচরিত, প্রাচীন তত্ত্বানুসন্ধান, প্রভৃতির আলোচনাই যে তাহার কারণ এবিষয়ে কাহারও দ্বিমত নাই। ভারতবর্ষে এ সম্বন্ধে নিতান্ত ঔদাসীন্য লক্ষিত হয়। বিষ্ণুপুরাণাদি কোন কোন পুরাণ গ্রন্থে কিছু কিছু বংশাবলিঘটিত প্রাচীন বিবরণ মাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাতে মনের ক্ষোভ বিদূরিত হয় না। বড় সুখের বিষয় যে, বর্ত্তমান সময়ে এদিকে কিয়ৎ পরিমাণে লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। বংশাবলি, ইতিবৃত্ত পুরাতত্ত্বালোচনা ও জীবনবৃত্তাদির প্রতি আমাদের যতই আসক্তি জন্মিবে, ততই দেশের মঙ্গল সাধিত হইতে থাকিবে। সুদীর্ঘ সূচনা না করিয়া, একেবারেই অবলম্বিত প্রবন্ধ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। এই প্রস্তাবে প্রসঙ্গ ক্রমে কোন কোন ঐতিহাসিক, সামাজিক, প্রাচীনতত্ত্ব-বিষয়ক বৃত্তান্ত সমাবেশিত হইবে।

স্মৃতি, সংহিতা ও পুরাণের মতানুসারে ব্রহ্মাই সৃষ্টির প্রথম পুরুষ। বাইবেলে আদম যেমন প্রথম ব্যক্তি, হিন্দুশাস্ত্রে ব্রহ্মা সেইরূপ। ব্রহ্মার মানসপুত্র সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার এই চারিজন সৃষ্টি রক্ষার অমনোযোগী হইলে ব্রহ্মার ঔরসে ভৃগু মরীচি অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ ও নারদ এই কয়জন জন্মগ্রহণ করেন। কশ্যপ নামে এক জন অসাধারণ জ্যোতির্ব্বেত্তা ছিলেন। তিনি মরীচির পুত্র কশ্যপ কিনা নিঃসংশয় বলা কঠিন। এইকশ্যপ ঋষি হইতে অনেক বংশ উৎপন্ন হইয়াছে। কশ্যপ প্রণীত বেদমন্ত্র ঋগ্বেদসংহিতার ৯ম মণ্ডলের ৬৪ সূক্তে, ৮ মণ্ডল ২৯ সূক্তে এবং ১ মণ্ডল ৯৯ সূক্তের ১ ঋকেও ৬৭ সূক্তের ৪, ৫, ৬ ঋকে, এবং ৯১, ৯২ ১১৩, ১১৪ সূক্তে নিবদ্ধ আছে। ইঁহার গোত্রে অপ্সার, নিধ্রুবি প্রভৃতি অনেক ঋষি উৎপন্ন হন। তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব নামে পরিচিত। নিধ্রুবির বিরচিত ঋক গুলিও নবম মণ্ডলের অন্তর্গত ৬৩ সূক্তে সংগৃহীত হইয়াছে। রেভসূনুও ৯৯, এবং ১০০ সূক্ত বর্ত্তা। কোন কোন মতে অপ্সার ৯ম মণ্ডল, ১০৪ সূক্ত সঙ্কলন করেন। ভূতাংশ ১০ মণ্ডল, ১০৬ সূক্ত, এবং বিরহা ১৬৩ সূক্ত প্রণয়ন কর্ত্তা। কশ্যপতনয় কাশ্যপও একজন

প্রধান লোক। তিনি অতি প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম শাণ্ডিল্য মুনি। তিনি, পিতামহ কশ্যপের সমান বিখ্যাত ঋষি। (১) তাঁহার নামে এক গোত্র চলিতেছে। তিনি ভক্তিরসাত্মক যে এক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা তদীয় নামে প্রচলিত। তাহার নাম "শাণ্ডিল্যসূত্র।" কোন কোন লোকের মতে তাহা মূল শাণ্ডিল্য ঋষির বিরচিত নয়, তদ্বংশীয় অন্য কোন লোকের লিখিত। ইহার বিশেষ প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা শাণ্ডিল্যসূত্রকে মূল ঋষির প্রণীত বলিয়া স্বীকার করিতেছি। শাণ্ডিল্য স্বয়ং একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক। (২) এরূপ প্রবাদ, তদীয় সহধর্ম্মিণী বেদের কোন কোন মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াও আমরা শাণ্ডিল্য-পত্নীর রচিত বেদাংশ এখনও প্রাপ্ত হই নাই।

শাণ্ডিলী।

যাঁহারা নারীগণের বেদ-রচনার বিষয় সন্দেহ করেন, তাঁহাদের সংশয় নিরসন জন্য ভূরি ভূরি রমণীর নাম করিতে পারি। বিশ্ববারা, অপালা, যমী, উর্ব্বশী, ঘোষা, মমতা, শশ্বতী, উশিজ, লোপামুদ্রা, শচী, সরণ্যু, অদিতি, ইন্দ্রমাতৃবর্গ, বাক্, রোমশা, দেবযামি ইত্যাদি নারীগণ বেদের কোন কোন ভাগ প্রণয়ন করেন। ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিবার যাঁহাদের বাসনা হইবে, তাঁহারা মৎপ্রণীত "প্রাচীন আর্য্যরমণীগণের ইতিবৃত্ত" অধ্যয়ন করুন। উক্ত নারীদের অনেকেরই স্বামীর নাম ধাম বা অন্যান্য বিষয় অজ্ঞাত। সে যাহা হউক, সম্প্রতি আমরা সাধ্বী শাণ্ডিলীর পাতিব্রত্যের যে বিবরণ, মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে পাইয়াছি, তাহার অনুবাদ সর্ব্ব সমক্ষে প্রদর্শন করিলাম। পাঠকেরা তাহা দেখিয়া, শাণ্ডিলীর পবিত্র চরিত্র অবগত হইবেন। ইনিই শাণ্ডিল্যের পত্নী। দক্ষপত্নী আর এক শাণ্ডিলী।

যখন সতী শাণ্ডিলী, দেবলোকে গমন করেন, তখন স্বর্গস্থিতা সুমনা-

---

(১) শাণ্ডিল্য মুনির আশ্রম, নৈমিষারণ্যের নিকটবর্ত্তী। তথায় রেলওয়ে ষ্টেশন হইয়াছে, তাহার নাম শাণ্ডিল্য ষ্টেশন। অযোধ্যা ও নেপালের মধ্যবর্ত্তী বনভূমি নৈমিষারণ্য।

(২) কোন পুস্তকে অত্রির বংশে শাণ্ডিল্যমুনি সমুৎপন্ন হন বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। সবিশেষ প্রমাণ না পাইলে, এই মত গ্রহণীয় নয়।

নাম্নী কামিনী, তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, আপনি কোন্ সুকৃতির ফলে এমন উচ্চ স্থানে আসিতে পারিলেন? শাণ্ডিলী কহিলেন,—আমি মস্তক-মুণ্ডন, জটা-ধারণ, কাষায় বাস অথবা বৃক্ষত্বক পরিধান করাতে, তাহার ফলে এখানে আসিয়াছি, মনে করিবেন না। কস্মিন্ কালেও আমি ভর্ত্তাকে অপ্রিয় কথা বা কটুবাক্য বলি নাই। দেবগণ, পিতৃলোক ও দ্বিজকুলের সেবায় কায়মনোবাক্যে যত্ন করিতাম। প্রাণপণে শ্বশুর ও শ্বশ্রূর শুশ্রূষায় নিবিষ্ট থাকিতাম। কদাচ আমার হৃদয়-নিলয়ে অসাধু ভাবের আবির্ভাব হয় নাই। কোন সময়েই বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান হইতাম না, কখনও কোন ব্যক্তির সহিত অধিক ক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিতাম না। গোপনীয়ই হউক, বা প্রকাশ্য হউক, হাস্যকর ও অনুপকারী কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে, সর্ব্বদা বিরত থাকিতাম। আমার স্বামী, কোন স্থান হইতে ভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, আমি সমাহিত মনে তাঁহাকে আসন দিতাম। পতির অনভিমত ও অপরিচিত ভোজ্য দ্রব্য কদাচ স্পর্শও করিতাম না, দূরে নিক্ষিপ্ত করিতাম। অপত্যবৃন্দের কারণ যে যে কর্ম্ম করা আবশ্যক, প্রত্যহ প্রাতে শয্যা ত্যাগ পূর্ব্বক নিজে তৎ-সমুদায় নির্ব্বাহ করিতাম, স্থানবিশেষে অন্য দ্বারাও তত্তৎ কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। আমার ভর্ত্তা, ভিন্ন দেশে গমন করিলে, কেশসংস্কার, গন্ধমাল্য-গ্রহণ প্রভৃতি কোন কর্ম্মই করিতাম না। গোরোচনা বা অঞ্জন দ্বারা শরীর-সংস্কার করিতাম না। সদা সমাহিতান্তঃকরণে অশেষ প্রকার মাঙ্গলিক ক্রিয়ায় উদ্যোগিনী হইতাম। পতির নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহাকে পরিত্যাগ পুরঃসর স্থানান্তরে যাইতাম না। পরিজনের ভরণপোষণে যাহাতে তাঁহাকে বিব্রত হইতে না হয়, তদ্বিষয়ে সচেষ্ট থাকিতাম। সর্ব্বদা আবাসস্থল নির্ম্মল রাখিতাম। যে নারী, সংযত হইয়া, এই সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তিনিই অরুন্ধতীর ন্যায় স্বর্গের পরম সুখানুভব করিতে পারেন।

কাত্যায়ন।

কাত্যায়ন মুনি, পাণিনি ব্যাকরণের সুবিস্তৃত প্রগাঢ় টীকা রচনা করিয়াছেন। তাহার নাম বৃত্তি। তিনি, কীদৃশ অগাধশক্তিশালী মহাজ্ঞানী ছিলেন, উক্ত টীকায় তাহার ভূরি ভূরি বিশদ প্রমাণ পাওয়া যায়।

অসিত ও দেবল।

শাণ্ডিল্য-কুলে অসিত ও দেবল নামক দুই উৎকৃষ্ট ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা উভয়েই বেদমন্ত্র প্রণয়ন করেন। ঋগ্বেদের ৯ নবম মণ্ডলের ৫ পঞ্চম হইতে ২৪ চতুর্ব্বিংশ সূক্ত পর্য্যন্ত ২০ কুড়িটি সূক্ত তাঁহাদের দুই জনের সঙ্কলিত।

বীরদেবাদি।

শাণ্ডিল্য মুনির বংশে বীরদেব, জন্মগ্রহণ করেন। দিনাজপুর ও বগুড়ার সীমার অন্তর্গত বোদাল গ্রামের অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে মঙ্গলবাড়ী নামক এক স্থান আছে। উহার সন্নিধানে এক দেবমন্দির ও পাষাণস্তম্ভ বিদ্যমান রহিয়াছে। স্তম্ভগাত্রে ক্ষোদিত লিপি পাঠে বীরদেবের বংশবিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায়। বীরদেব বিলক্ষণ খ্যাত্যাপন্ন লোক ছিলেন। তাঁহার গোত্রে পঞ্চাল নামে এক ব্যক্তির উদ্ভব হয়। কালক্রমে পঞ্চালের গর্গ নামক এক পুত্র জন্মে। তাঁহার জ্ঞান অতিশয় প্রখর ছিল। গর্গের ইচ্ছা নাম্নী প্রণয়িনী যার পর নাই পতিব্রতা ছিলেন। গর্গ, এক রাজার মন্ত্রী ছিলেন, গর্গ-তনয় দর্ভপাণি। তিনি, দেবপালদেবের সচিব হইয়াছিলেন। দেবপাল, ভারতবর্ষের যে নানা স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হন, মহামন্ত্রী দর্ভপাণির বুদ্ধিকৌশলই তাহার প্রধান কারণ; ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। দর্ভপাণি, শর্করা দেবীর পাণিপীড়ন করেন। তাঁহাদের যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তিনিও পিতৃনাম রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম সোমেশ্বর। সোমেশ্বরের সহিত তরলা দেবীর পরিণয় সংঘটিত হয়। সোমেশ্বরের উপাধি "মিশ্র"। যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞানে প্রখ্যাত হইতেন, তাঁহারাই "মিশ্র" উপাধি পাইতেন। সোমেশ্বর মিশ্রের তনয় কেদারনাথ। তিনি পৈত্রিক "মিশ্র" উপাধি ব্যতীত "ভট্ট" এই অতিরিক্ত উপাধি পাইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তিনি, পালবংশীয় বিগ্রহপাল রাজার অমাত্য ছিলেন। দেবগ্রাম-নিবাসিনী বব্বা দেবীর সহিত ভট্ট কেদারনাথ মিশ্রের উদ্বাহক্রিয়া সমাহিত হয়। কেদারনাথ মিশ্রের সন্তান গুরব মিশ্র। তিনি, নারায়ণপাল নৃপতির

অমাত্য-পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, নানা প্রকারে রাজ্যের হিতানুষ্ঠান করিয়া যান। তিনি, পিতা-পিতামহের সদৃশ জ্ঞান-নিরত ছিলেন। বেদশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। গুরব মিশ্রের ধনেরও অভাব ছিল না।

মহেশ্বরাচার্য্য ও ভাস্করাচার্য্য।

কালক্রমে এই বংশে মহেশ্বর উদিত হন। উত্তর কালে তিনি আচার্য্য উপাধিতে ভূষিত হন। মহেশ্বরাচার্য্যের অদ্যাবধি বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। তাঁহার পুত্র ভাস্করাচার্য্য পিতৃদেবের উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন। ভাস্কর ১০৩৬ শকাব্দে সহ্যাদ্রির নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ভূমিষ্ঠ হন। ঐ স্থান এক্ষণে বিদর বলিয়া খ্যাত। তিনি ৮ অষ্ট ব্যাকরণ, ৮ অষ্ট ভিষজ, ১৮ অষ্টাদশ সংহিতা, ৬ ষট্ তর্ক, ৫ পঞ্চ গণিত, ৪ চতুর্ব্বেদ, ৩ রত্ন-ত্রয় ও ২ দুই মীমাংসায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার কবিত্বও প্রশংসনীয়। ১০৭২ শকে অর্থাৎ ৩৬ বর্ষ বয়সের সময়ে লীলাবতী, বীজগণিত, গণিতাধ্যায় ও গোলাধ্যায় এই ৪ ভাগে বিভক্ত "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" রচনা করেন। সিদ্ধান্ত শিরোমণি মনোরম পদ্যচ্ছন্দে বিরচিত। তাঁহার এক কন্যা ছিল, কন্যার নাম লীলাবতী। পশ্চাৎ তাঁহার বিবরণ কিছু সবিস্তরে লিখিত হইল।

লীলাবতী।

লীলাবতী নামে ৩ তিনটি রমণীর উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে। এক লীলাবতী ভাস্করাচার্য্যের দুহিতা; উদয়নাচার্য্যের কন্যাও লীলাবতী নামে পরিচিত। ভাস্করসুতা ঐ নারী হইতে অভিন্ন কি না, বলা যায় না। স্মৃতিশাস্ত্রে, আর এক লীলাবতীর নির্দ্দেশ আছে, তিনি কোন মন্দ কার্য্য করিয়াছিলেন, তজ্জন্য অজস্র লবণ দান করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করেন। এই কামিনীর সহিত আমাদের প্রস্তাবের কোনই সম্বন্ধ নাই। প্রথমোল্লিখিত নারীই আমাদের আলোচ্য। কেহ কেহ বলেন, লীলাবতী ভাস্করাচার্য্যের ভার্য্যা। "বাল-কুরঙ্গনয়না" লীলাবতীর এই বিশেষণ দেখিয়া, অনেকে ঐ মত প্রচার করেন। এরূপ সম্বোধন উপস্থিত সময়ে রীতিবিরুদ্ধ বটে কিন্তু তৎকালে

উহা দূষ্য ছিল না। কাহারও কাহারও মতে ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতী নামে বনিতা ও দুহিতা ছিলেন। এ বিষয়ের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

মহা মহোপাধ্যায় ভাস্করাচার্য্য ১০৩৬ শকে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং লীলাবতীও ঐ উহার কিছু কাল পরেই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। লীলাবতী ভিন্ন ভাস্করাচার্য্যের অন্য পুত্র বা কন্যা ছিল কি না, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। আচার্য্য ভাস্কর, কন্যাকে যে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তাহার প্রমাণ,—তিনি স্বীয় কন্যার নামানুসারে নিজের একখানি গণিত পুস্তকের "লীলাবতী" নামকরণ করেন। লীলাবতীর পিতামহের নাম মহেশ্বর। তিনি সুবিখ্যাত সুপ্রাচীন শাণ্ডিল্য গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন।

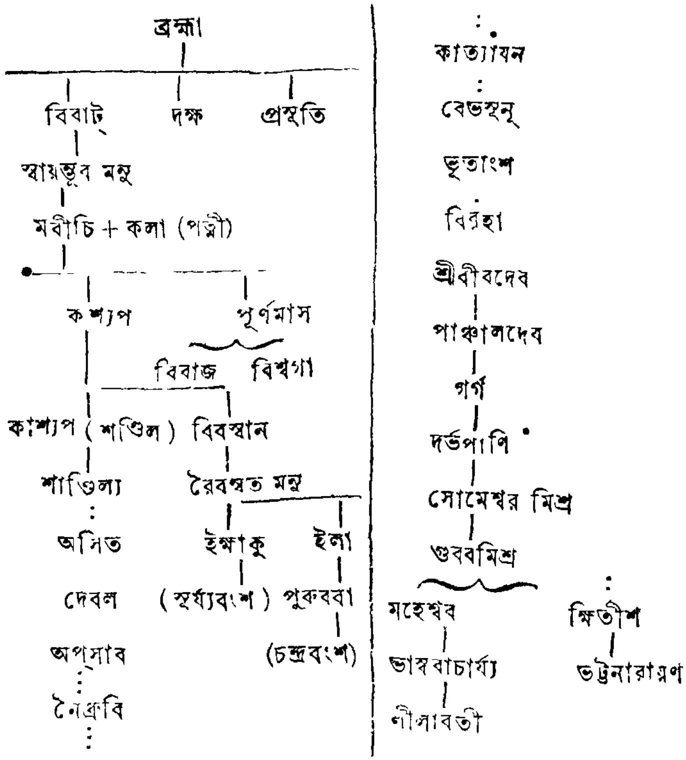
এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে, ভাস্করাচার্য্য গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন, তাঁহার সেই স্নেহের ধন বালবিধবা হইবেন। আচার্য্য, তদবধি স্বীয় কন্যার এই ভবিষ্য বিপদ্ নিবারণার্থে সর্ব্বদাই চিন্তিত থাকিতেন। অবশেষে তাঁহার মনে এক সদুপায় উপস্থিত হইল। তিনি উদ্বাহের লগ্ন এমন সময়ে নির্দ্ধারিত করিবেন, সঙ্কল্প করিলেন যে, সেই লগ্নে পরিণীতা হইলে, কন্যা বিধবা হইবেন না। তদনুসারে লগ্ন-নির্ণয়ার্থ জলপূর্ণ এক পাত্রের উপরিভাগে সূক্ষ্ম-রন্ধ্র-বিশিষ্ট এক তাঁবি স্থাপন করিলেন। যখন ঐ তাঁবি ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা জলে ব্যাপ্ত হইবে, তখনই তদীয় কন্যার বিবাহ হইবে। আচার্য্য ভাস্কর, এইরূপ স্থির করিয়া রাখেন এবং সভাস্থ সকলকেই তাহা বিজ্ঞাপন করিয়া দেন। দৈবের কর্ম্ম দেখ, লীলাবতী, ক্রীড়া কৌতুক বশতঃই হউক, আর চাঞ্চল্য প্রযুক্তই হউক, ঐ তাঁবির মধ্যে কিরূপে জল-প্রবেশ হইতেছে, সন্দর্শন করিতেছিলেন। ইত্যবসরে অকস্মাৎ তাঁহার শিরোদেশের আভরণ হইতে, একটী মুক্তা ঐ তাঁবির অভ্যন্তরে নিপতিত হইল। যাঁহারা ঐ কার্য্য পর্য্য-বেক্ষণের ভার লইয়াছিলেন, তাঁবি জলে পরিপূর্ণ হইবার সম্ভাবিত সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, অথচ তাহা জলমগ্ন হইল না স্থির করিয়া, সেই দৈবজ্ঞগণ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। তদনন্তর ঐরূপ বিলম্ব ঘটিবার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, রন্ধ্রপথে একটি ছোট মুক্তা পড়িয়া রহিয়াছে। এত ক্ষণে লগ্নকাল নিশ্চয়ই অতীত হইয়া গিয়াছে,

তখন সকলেরই প্রতীতি জন্মিল। অগত্যা তদ্দণ্ডেই লীলাবতীর পরিণয়-ক্রিয়া সম্পাদিত হইল। ভাস্করাচার্য্যের মনোরথ ব্যর্থ হইয়া গেল।

পরিণয়ের কিছু কাল পরেই লীলাবতীকে পতিহীনা হইতে হইল। তখন ভাস্করাচার্য্য সিদ্ধান্ত করিলেন, তনয়াকে অঙ্কশাস্ত্রে ও জ্যোতিষ তত্ত্বে পারদর্শিনী করিবেন। এইরূপ উচ্চ শাস্ত্রের আলোচনা অবলম্বন করিলে, তাঁহার দুহিতা দুঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণা অনায়াসেই বিস্মৃত হইতে পারিবেন।

লীলাবতীর জনক, যাহা ভাবিয়াছিলেন, কার্য্যেও তাহাই ঘটিয়াছিল। লীলাবতী সেই উচ্চ শাস্ত্রের অনুশীলনে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন। ভাস্করাচার্য্য স্বীয় কুমারীর নামে অঙ্ক পুস্তকের নাম "লীলাবতী" রাখেন। কোন্ সময়ে এই অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণীত হয়, "লীলাবতী" পুস্তকে তাহার কোনই নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তৎপ্রণীত "সিদ্ধান্ত শিরোমণির" অন্তর্গত "গোলাধ্যায়" গ্রন্থের শেষাংশ পাঠে জানা যায়, শক নৃপের স্থাপিত অব্দের ১০৭২ দশ শত বাযাত্তর বৎসর, উহার প্রণয়ের কাল। এক্ষণে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইল, লীলাবতী এই সময়ে বা ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভর্তৃবিহীনা হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জন্ম-মরণের সময় অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই।

এই বংশে ক্ষিতীশ নামে এক ব্যক্তি সমুদ্ভূত হন। সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে তিনি, বঙ্গীয় বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রাহ্মণগণের আদিপুরুষ। লোকপিতামহ প্রজাপতি ব্রহ্মা হইতে যেরূপে সেই ক্ষিতীশের বংশনির্ণয় করিতে পারিয়াছি, পশ্চাৎ তদনুসারে একটি বংশতালিকা পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।



ক্ষিতীশ।

ক্ষিতীশের বঙ্গাগমন সম্বন্ধে বিরোধী বহু মত প্রচলিত আছে। আমরা একে একে তাহা বিবৃত করিতেছি। ক্ষিতীশ, কান্যকুব্জে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র ভট্টনারায়ণ বহু অপত্যশালী ছিলেন। তদীয় শাখা-প্রশাখাগণ কালে দেশ-বিদেশ-ব্যাপী হইয়া উঠেন। আদিশূর, বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণের শাস্ত্রে অজ্ঞানতা সন্দর্শনে মর্ম্মাহত হন। তন্নিমিত্ত তিনি, কান্যকুব্জাধিপতি বীরসিংহের নিকট পাঁচ জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ ও বেদাদি-বিদ্যাবিশারদ ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করেন (৩)। তদনুসারে ক্ষিতীশ,

(৩) এ বিষয়ে মতান্তর দৃষ্ট হয়। "বারেন্দ্র কুলজ্ঞেরা কহেন, আদিশূর কান্যকুব্জ দেশের রাজা চন্দ্রকেতুর চন্দ্রমুখী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। চন্দ্রমুখী চান্দ্রায়ণ ব্রতানুষ্ঠান করেন, দেশীয় ব্রাহ্মণেরা বেদজ্ঞান-বিমূঢ়তা নিবন্ধন রাজ্ঞীর অভিলাষানুরূপ যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে না পারাতে, রাজ্ঞীর অনুরোধ-ক্রমে আদিশূর স্বকীয় শ্বশুরকে পত্র লিখিয়া সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া রাজ্ঞীর ব্রত সম্পন্ন করেন।"—[গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ৫১ পৃষ্ঠা।]

মেধাতিথি, সৌভরি, সুধানিধি ও বীতরাগ এই ৫ পঞ্চ বিপ্র বঙ্গে সমাগত হন। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র মতে এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে অনেক মতদ্বৈধ দেখা যায়। রাঢ়ীয় গ্রন্থকার ধ্রুবানন্দাদির মতে ভট্টনারায়ণ, শ্রীহর্ষ, বেদগর্ভ, ছান্দড় ও দক্ষ এই ৫ পাঁচ জন যাজ্ঞিক বঙ্গে আগমন করেন। আবার বারেন্দ্র কুলপঞ্জীর মতে নারায়ণভট্ট, সুষেণ, ধরাধর, পরাপর ও গৌতম এই ৫ পাঁচ আদিশূরানীত ব্রাহ্মণ।

কিন্তু আমরা যে ৫ পাঁচ জনের নামোল্লেখ করিলাম, দেবীবর ঘটক-বিশারদ, তাঁহাদের নামই উল্লেখ করিয়াছেন, এবং ইহাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কেননা, উহাঁরাই রাঢ়ীয় বারেন্দ্রের আদি পুরুষ। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কুলের পূর্ব্বপুরুষ ৫ পাঁচ জন গৌড়ে আগমন করেন বলিলে, কোনই বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনাও দেখা যায় না।

এতদ্ব্যতীত কি হেতুতে ও কি কার্য্য করিতে, সাগ্নিক দ্বিজাতিগণ. আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত হন, তদ্বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন মত পরিদৃষ্ট হয়; যথা—

(ক) কেহ কেহ কহেন, আদিশূর, পুরোহিত-পাত্র-মিত্র বেষ্টিত হইয়া সভা-মণ্ডপে উপবেশনপূর্ব্বক বলিতেছেন, আমি ক্ষত্রিয়কুলে সঞ্জাত হইয়াছি, বেদবিধি-বিহিত যজ্ঞ-ব্রতানুষ্ঠানের কামনা করি। অতএব বেদ-বিদ্যাপারদর্শী বিপ্র কোথায় পাইব, বলুন। সভাস্থ কোন দ্বিজ কহিলেন, কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া যাগ নিষ্পন্ন করুন (৪)।

(খ) কাহারও কাহারও মতে গৌড়ে অনাবৃষ্টি হওয়ার জন্য রাজা, ব্রাহ্মণ আনয়ন করিতে বাধ্য হন।

---

(৪) "অহং ক্ষত্র-কুলে জাতো ন কুর্য্যাং ব্রত-যজ্ঞকং।
অগ্নিহোত্রীয়যজ্ঞঞ্চ করিষ্যামি দ্বিজোত্তম! ॥
কুত্র কুত্র স্থিতা বিপ্রা বেদপারগসাগ্নিকাঃ।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি, কৃপয়া কথয় প্রভো! ॥"

বিপ্র উবাচ।

কান্যকুব্জস্থিতা বিপ্রাঃ সাগ্নিকা বেদপারগাঃ।
তস্মাৎ পঞ্চ সমানীয় যজ্ঞনিষ্পন্নতাং কুরু ॥

(গ) কেহ বা বলেন, রাজপত্নীর ব্রতোদ্যাপনার্থ ব্রাহ্মণ আনয়নের চেষ্টা হয়।

(ঘ) বৈদ্য-কুলশাস্ত্রের মতে পুত্রেষ্টি যজ্ঞার্থই দ্বিজগণকে আনয়নের প্রয়োজন হইয়াছিল।

মহারাজাধিরাজ অশোক রাজার সময় হইতে আদিশূরের রাজত্বকালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব ছিল। সেই নিমিত্তই এ দেশ হইতে বৈদিক ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান লোপ পায়। এমন কি এদেশ হইতে এককালে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বর্জিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল বলিলেও বলা যায়। আদিশূরের প্রভাবে যখন পুনর্ব্বার বঙ্গদেশে বৈদিক ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান হয়, তখনও সমস্ত বঙ্গদেশ মধ্যে ৭৫০ সাড়ে সাতশত ঘরের অতিরিক্ত ব্রাহ্মণ ছিল না, ঐ ব্রাহ্মণগণ, বৌদ্ধদিগের প্রভাবে এমন নিস্তেজ হইয়াছিলেন যে, মহারাজ আদিশূর পুত্রেষ্টি যাগের প্রসঙ্গ করিলে, তাঁহারা তদ্বিষয়ে অজ্ঞ ও অক্ষম বলিয়া রাজার নিকট পরিচয় দিলেন। রাজা তখন ক্ষুব্ধ হইয়া ৯৫৪ শকে কান্যকুব্জাধীশ্বরের নিকটে পঞ্চ গোত্রের পঞ্চজন সচ্চরিত্র, সাগ্নিক, বেদজ্ঞ, যজ্ঞনিপুণ, বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করিলেন।

কান্যকুব্জাধিপতি মহারাজ বীরসিংহ, গোত্রপ্রবর্ত্তক মুনিদিগের মধ্যে যে পঞ্চ গোত্র অগ্রগণ্য দেখিলেন, সেই পঞ্চ গোত্র হইতে বিশিষ্ট-বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন, সুকবি, সৎ-ক্রিয়াশীল, মুনিবিশেষ বাক্‌সিদ্ধ পঞ্চ ব্রাহ্মণ পাঠাইলেন। তাঁহাদিগের সঙ্গে সদ্‌গুণবান্, ও পরম ভক্ত পাঁচ জন কায়স্থ ভৃত্যভাবে আসিয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে বিস্তর অলৌকিক ঘটনার বিষয় বর্ণিত আছে।

নির্দ্ধারিত শুভ দিবসে পঞ্চ ব্রাহ্মণ দ্বারা পুত্রেষ্টি যাগ সমাপিত হইল। তাঁহাদিগের যাগ-প্রভাবে রাজমহিষী গর্ভবতী ও কালক্রমে পুত্রবতী হইলেন। মহারাজ, তখন পরম শ্রদ্ধা সহকারে উক্ত দ্বিজগণকে বঙ্গদেশে বাস করাইবার জন্য অধ্যবসায়ারূঢ় হইলেন। তাঁহারা রাজার নির্বন্ধাতিশয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না, সুতরাং তাঁহাদিগকে এদেশে বসতি করিতে হইল।

(ক্রমশঃ

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

পঞ্চবটী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গ্রামের নাম পঞ্চবটী। তত ছোটও নয়, তত বড়ও নয়—আয়াতনে দুয়ের মাঝামাঝি। পূর্ব্ব, পশ্চিম ও মাঝের পাড়া লইয়া তিনটী পাড়া। তিনটী পাড়াতেই ঘন বসতি। বিস্তর বাড়ী। কিন্তু একটীও অট্টালিকা নাই, সবই মেটে ঘর। সে সব বাটীর তেমন শৃঙ্খলা নাই, কদাচিৎ দুই একখানি চারিদিকে ঘেরা, নহিলে সব খোলা। একের উঠানে অপরের উঠান, একের ছাঁইচের নীচে অপরের খামার। একজনের উঠানে প্রবেশ করিলে সমস্ত পাড়া ঘুরিয়া আসা যায়। সাধারণতঃ চারিখানির বেশি ঘর কাহারও নাই, কাহারও বা তিন খানি, কাহারও বা দুই খানি, কাহারও বা কেবল এক খানি মাত্র—সে তাহারই চারিদিকে চাল তুলিয়া একদিকে রাঁধে, একদিকে শোয়, একদিকে গোরু রাখে, আর একদিকে ঢেঁকিশালা করে। কাহারও ঘরের পাশেই বাঁশঝাড়, কাহারও উঠানে সজিনা কি মাদার কি কুল গাছ, কাহারও রান্নাঘরের ছাঁইচেই প্রকাণ্ড ছাইগাদা, তার উপর বড় বড় মানকচুর ঝাড়। প্রায় সবারই উঠানে এক একটী মাচা, তাহাতে লাউ, শসা, সিম, বা পুঁই একটা না একটা গাছ দেখিতে পাইবে; তাহার একধারে হয়ত দুই চারিটা পোলো ভগ্ন অভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, একধারে একগাছি জাল শুকাইতেছে, নীচে খুঁটীর গায়ে বাঁধা দুটী বাছুর শুইয়া রোমন্থ করিতেছে। তবে, গ্রামের মণ্ডলদিগের বাড়ী এ প্রকার নহে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘর, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গোলা, উচ্চ প্রাচীর, উচ্চ চণ্ডীমণ্ডপ, সম্মুখে গোয়াল, তাহার পাশে বিস্তৃত খামার, অথচ সবগুলি কি সুন্দর নিকানো—যে দিকে চাও সেই দিকেই তক্ তক্ করিতেছে। পঞ্চবটীতে ব্রাহ্মণ কায়স্থ একঘরও নাই। দুই ঘর নাপিত, একঘর তেলি, দুইঘর কামার ও পাঁচ ঘর গোয়ালা ভিন্ন সবাই কৈবর্ত্ত জাতীয়। সবাই চাষি, সবাই হাল গোরু লইয়া ঘর করে। যাহার একখানি মাত্র কুঁড়ে তাহারও একখানা লাঙ্গল ও একজোড়া বলদ আছে। গ্রামের দক্ষিণেই প্রকাণ্ড মাঠ। তাহাকে লোকে পঞ্চবটীর মাঠ বলে।

হারাধন সর্দ্দার গ্রামের প্রধান মণ্ডল। হারাধনের বাড়ী পূর্ব্ব পাড়ায়। বাড়ী একধারে হইলেও তিন পাড়ার লোকে সর্ব্বদাই তাঁহার বাড়ী ভরিয়া থাকিত। প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপ, তাহার উপর বড় বড় সপ পাতিয়া সন্ধ্যার সময় গ্রামের বিস্তর লোক আসিয়া গল্প করিত, তামাকু খাইত, আপন আপন চাষ-বাসের সংবাদ বলিত। গ্রামের সকলেই হারাধনকে যথেষ্ট ভালবাসিত ও মান্য করিত; এমন কি দিনান্তে হারাধনের সঙ্গে একবারের জন্যও গল্প করিতে না পাইলে অনেকের নিদ্রা হওয়া ভার হইত। ভাল-বাসিবার গুণ হারাধনের অনেক ছিল। হারাধনের টাকা বা বীজ ধারিত না এমন লোক সে গ্রামে অল্পই ছিল। হারাধনের সুদ বড় সামান্য ছিল। তাহাও কেহ দিত, কেহ দিত না—দিয়া উঠিতে পারিত না। হারাধন সে জন্য কাহাকেও একটীও কড়া কথা কোন দিন বলেন নাই। যাহারা চাষী, বৎসর না যাইতেই যাহাদের পেটের ভাত ফুরাইয়া যায়, তার উপর জমি-দারের ভয়ে যাহারা সদা সশঙ্কিত, বীজের সঙ্গতি যাহাদের থাকে না, তাহাদের কাছে এমন মহাজন আর হয় কি? একবার বড় অজন্মার বৎসর, কেহ কিছুই দিতে পারিল না, হারাধন কাহাকেও একটীও কথা বলিলেন না। একদিন তাঁহার ছোট ভাই একজন খাতককে কি দুই একটা কথা বলিয়াছিলেন, হারাধন তাহা শুনিয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলে তাঁহার ভাই যখন বলিল "কেহই যদি একটিও দানা না দেয়, তবে আমরা কি খাইয়া বাঁচিব?" তখন হারাধন ধীরভাবে বলিয়াছিলেন, "ছি! তুমি পাগল, তাই অমন কথা বল। উহারা যে দুই এক মুঠা ধান পাইয়াছে, তাহাতে উহাদেরই আধপেটাও চলিবে না। তাথেকে আর দিবে কি? দিলে উহারা কি খাইয়া বাঁচিবে? উহাদের স্ত্রী পুত্র উপোষ করিয়া মরিবে আর আমরা তাহা দিয়া আপনাদের পেট পুরাইব।"

হারাধনের আরও অনেক গুণ। হারাধন শিষ্ট, শান্ত, মিষ্টভাষী। হারাধন কপটতা জানে না, চাতুরী বুঝে না, মিথ্যাকে বড়ই ঘৃণা করে। হারাধন বড়ই নিষ্ঠাবান, দেবদ্বিজে অচলা ভক্তি, মাতৃসেবায় মহা আনন্দ, অতিথি পাইলে হারাধন আহার নিদ্রা ভুলিয়া যায়। বাড়ীতে অনেক পরিবার—হারাধনের ছোট আর দুই সহোদর—মধ্যম ভগবান, কনিষ্ঠ গোবর্দ্ধন; হারাধনের দুই পুত্র,—নফর ও রসিক; ভগবানের একমাত্র কন্যা

প্রসন্নময়ী; কনিষ্ঠ অপুত্রক; তা ছাড়া, ভগিনী, ভাগিনেয়, ভাগনেয়ী অনেকগুলি ছিল, হারাধন সবার প্রতি যথোচিত ব্যবহার করিতেন, এক-দিনের তরে একটী বালক পর্য্যন্ত তাঁহার কথায় কখন অসন্তুষ্ট হয় নাই। বাড়ীতে চাষ আবাদের জন্য অনেক মাইন্দার থাকিত, তাহারাও বলিত বড় দোষ করিলেও কোন দিনের জন্য তাহারা হারাধনের মুখে একটীও কড়া কথা শুনে নাই।

অথচ, হারাধনের সকল দিকে সমান নজর ছিল। কেহ কখন কোন কাজে তাঁহাকে ফাকি দিয়া যাইতে পারিত না। হারাধন খুব ভোরে উঠি-তেন, উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া একবার পাড়া প্রতিবেশীর সম্বাদ লইয়া আসিতেন। যদি কাহারও জন্য তাহার কোনরূপ সাহায্য আবশ্যক হইত, অগ্রে প্রাণপণে তাহা করিয়া বাড়ী ফিরিতেন। বাড়ী আসিয়া আগে গোয়াল দেখিতেন, তাহা বেশ করিয়া পরিষ্কার হইয়াছে কি না, গোরুগুলি বাহির হইয়াছে কিনা, কিছু আবর্জ্জনা দেখিলে তাহা স্বহস্তে পরিষ্কার করিয়া ফেলিতেন, সে জন্য চাকরদিগকে কিছু বলিতেন না। গোরু বাহির না হইলে আপনি আনিয়া বাহির করিতেন। ভৃত্যেরা ইহা দেখিয়া আর আপন কাজে একটুও ঔদাস্য করিতে পারিত না। রাত্রেই বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন কে কোন ক্ষেতে কাজ করিতে যাইবে, মাইন্দারেরা ঠিক সেই মত কাজ করিল কি না প্রাতে আবার তাহার সংবাদ লইতেন। তার পর ভাই দুটীকে ডাকিয়া যথাকর্ত্তব্য বলিয়া দিয়া মাতার নিকট গিয়া সংসারের জন্য সে দিনের মত কি আবশ্যক অনাবশ্যক তাহার তত্ত্ব লইতেন, মাতার আদেশমত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া দিয়া দিবসের অন্য কার্য্যে লিপ্ত হইতেন। বাড়ীর বা পাড়ার কাহারও অসুখ হইয়াছে শুনিলে সেদিন তাহার তত্ত্ব লইতে দিনের অনেক সময় কাটিয়া যাইত।

হারাধনের সহোদর দুটীও বড় শান্ত, বড় নম্র। জ্যেষ্ঠকে পিতার ন্যায় মান্য ও ভক্তি করিত, কখনও কোন কথায় দ্বিরুক্তি করিত না, হারাধন যাহা বলিতেন তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাণপণে প্রতিপালন করিত। বধূ তিনটিতেও বড় ভাব। বাড়ির মধ্যে নফর ও রসিক দুই পুত্র, ভগবান ও গোবর্দ্ধন তাহাদিগকেই আপন পুত্র ভাবিত। মেয়ের মধ্যে একা প্রসন্ন, প্রসন্নের আদরের সীমা নাই। তায় প্রসন্নের অপরূপ রূপ অতি মিষ্ট কথা।

হারাধন প্রসন্নকে সদাই বুকে বুকে রাখিতেন। ভাগিনেয় ভাগিনেয়ী গুলিও কখন একটুও অনাদর বা অযত্ন পায় নাই। ভগিনীরা নিজের সংসার ছাড়িয়া অধিক সময়ই সুখ সচ্ছন্দে থাকিবার জন্য ভা'য়ের সংসারে আসিয়া থাকিত। হারাধনের মাতা বর্ত্তমান। বুড়ীকে কেহ বলিত স্বর্ণগর্ভা, কেহ বলিত পুণ্যবতী কেহ বলিত সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, নহিলে কি এমন লক্ষ্মীর সংসার হয় গা? বুড়ী স্থির হইয়া তাহা শুনিত, আনন্দে একবিন্দু অশ্রু নয়নকোণে দেখা দিত, নিঃশব্দে তাহা মুছিয়া নীরবে পুত্রপৌত্রের জন্য ইষ্টদেবতার নিকট কল্যাণ কামনা করিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যায়, পঞ্চবটীর সেই বৃহৎ সর্দ্দার পরিবার তেমনি সুখে, সচ্ছন্দতায় ও মানের সহিত কালাতিপাত করেন। নফর বার বৎসরে পড়িয়াছে, রসিক দশ বৎসরের; নিকটেই এক বর্দ্ধমানে গুরুমহাশয় আসিয়া পাঠশালা বসাইয়াছেন, দুই ভায়ে এখন সেইখানেই লেখা পড়া করে। প্রসন্ন সাত বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া আট বৎসরে পড়িবে, সেই মোহন রূপ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রসন্নের দেহে লাবণ্য ধরে না। বালিকা এত ধুলা কাদা মাখে, তবু যেন সে বড় বিবর্ণ হইতে জানে না, রূপের জন্য প্রসন্নকে সবাই আদর করে, অতি বড় শত্রুও একবার ফিরিয়া চায়। বালিকা পথে বসিয়া খেলা করে, পথের লোক তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিয়া যায়। একমাস মাত্র প্রসন্ন আট বৎসরে পড়িলে গৃহিণী জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন "হারাধন —বাবা, প্রসন্নর বিবাহের সম্বন্ধ দেখ, অমন মেয়ে দেখিও যেন পাত্রটী মনের মত হয়।"

হারাধন নতমুখে ধীরস্বরে বলিলেন "তার জন্য এত তাড়াতাড়ি কেন মা?"

মা বলিলেন, "তাড়াতাড়ি কি সাধে করিতেছি, তোমরা তো সব খবর নেবে না, তোমাদের মেয়ে যে বিয়ে নৈলে আর ঘরে থাক্‌তে চায় না।"

হারাধন তেমনি নতমুখে একটু হাসিয়া বলিলেন, "মার আমার সকলের সঙ্গেই পরিহাস!"

সে দিন কি একটা পর্ব্ব ছিল, এই সময়ে দূরে বাজনা বাজিয়া উঠিল। প্রসন্ন পুতুল খেলিতে ছিল, ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "ঠাকুমা ঠাকুমা, তুই যে বলেছিলি আমার বিয়েতে এমনি বাজ্‌না বাজ্‌বে, কৈ বিয়ে হলো না। কবে হবে ঠাকুমা?"

বৃদ্ধা হাসিয়া পুত্রকে বলিলেন, "ঐ শোন বাপু তোমাদের মেয়ের কথা শোন।"

হারাধন বৈকালে দুই ভাইকে ডাকিয়া সেই দিনই প্রসন্নর বিবাহের সম্বন্ধ দেখিতে উদ্যোগী হইতে বলিলেন। এত তাড়াতাড়ি করিবার বিশেষ কারণ, হারাধন স্ত্রীর মুখে শুনিয়াছিলেন মাতার একান্ত ইচ্ছা প্রসন্ন ও প্রসন্নর স্বামীকে লইয়া মরিবার পূর্ব্বে কয়দিন সুখে কৌতুকাদি করিতে পারেন। মাতার বয়স ৭০ পার হইয়াছিল।

খুঁজিতে খুঁজিতে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পাত্রের সন্ধান হইল। অনতিদূরেই তাহাদের ঘর। পাত্রপক্ষীয়েরা হারাধনের নাম বিশেষ অবগত ছিল, তার উপর যখন মেয়েকে আসিয়া দেখিল, তখন আপনারাই বড় ঝুঁকিয়া পড়িল। প্রথম দেখাতেই পাকা দেখা হইয়া গেল। দুই সপ্তাহ পরে বিবাহের দিন স্থির হইল।

এ কাজ ও কাজ করিতে, জিনিষ পত্র গুছাইতে, আত্মীয় স্বজন আনা লওয়া করিতে, দেখিতে দেখিতে দুই সপ্তাহ পূর্ণ হইয়া আসিল। মেয়ের ইচ্ছা, তাহার বিবাহে বাজনা হয়, হারাধন দেশের বাজন্দার আনিয়া বাড়ী পুরিয়া ফেলিলেন। ঢোলের তাকতাকিসিন্ শব্দে, সানায়ের পোঁ পোঁ আওয়াজে, কাড়ার কড়কড়ানিতে সে ক্ষুদ্র পঞ্চবটী গ্রাম সে দিন তোলপাড় হইয়া উঠিল। বিবাহের দিন সে গ্রামের কেহই একটীবারের জন্য মাঠে গেল না, সকলে সমস্ত দিন সেই সর্দ্দারের বাড়ী থাকিয়া নানা কার ফরমায়েস খাটিতে ও খাটাইতে লাগিল। সন্ধ্যার পর পাত্র আসিল। চাঁদপানা জামাই। যে দেখিল সেই শতমুখে প্রশংসা করিল। যথা লগ্নে শুভকার্য্য সম্পন্ন হইল। নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত বিস্তর লোক জমিয়াছিল, তাহাদিগকে খাওয়াইতে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া গেল।

ভোর বেলা হারাধন বাড়ীর ভিতর গিয়া মাকে ডাকিয়া বলিলেন, "কেমন মা, জামাই মনের মত হইয়াছে তো ?"

মা তখন বাসর ঘরে বসিয়া নাতজামাই লইয়া রঙ্গ করিতেছিলেন, পুত্রের সাড়া পাইয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন, 'তা, সে কথা আগে তোমার মেয়েকে জিজ্ঞাসা কর, বাপু।"

প্রসন্ন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উঠিয়া বাহিরে আসিয়াছিল, সে কাছেই দাঁড়াইয়াছিল, বৃদ্ধা তাহাকে দেখিয়া বলিলেন 'কিলো, কথা ক'না, বর মনে ধরেছে তো ?"

বালিকা লজ্জায়—হায়, সে লজ্জা কি মধুর।—বলিল 'দূর।' আর বালিকা সে দেশেও না, দুড় দুড় করিয়া একেবারে মার ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

দেখিয়া হারাধন একটু হাসিলেন, মাতাও হাস্য করিলেন। মাতা পুত্রে তখন ভাবিতেছিলেন, কি সুখ! নিকটে দাঁড়াইয়া যাহারা দেখিতেছিল, তাহারাও মুহূর্ত্তের জন্য ভাবিতেছিল, কি সুখ!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কিন্তু, সুখ পদার্থটা কি এতই মূল্যহীন। এতই ক্ষণভঙ্গুর! প্রতি নিশ্বাসে তাহার এতই আশঙ্কা! ধিক্ মনুষ্যজাতিকে, ইহার জন্য অহরহঃ কেন এত প্রাণপণ করে! অসার ক্ষণভঙ্গুর কাচখণ্ডের জন্য কেন তাহার সেই অমূল্য জীবনরত্নকে তুচ্ছ করিতেও উদ্যত হয়! ভগবন্ এ অনিত্য প্রলোভনের সৃষ্টি তোমায় কে করিতে বলিয়াছিল ?

বছর ফিরিতে না ফিরিতে অকস্মাৎ একদিন সম্বাদ আসিল, ওলাউঠা রোগে হঠাৎ জামাইয়ের মৃত্যু হইয়াছে। সেই নিদারুণ সংবাদ যে যেখানে শুনিল সে সেইখানে আছাড় খাইয়া পড়িল। সর্দ্দারদিগের সেই প্রকাণ্ড পুরী মুহূর্ত্তের মধ্যে ভয়ানক ক্রন্দনের রোলে পুরিয়া উঠিল। সর্দ্দারদিগের সেই আনন্দপুরীতে এই প্রথম ক্রন্দন শব্দ শুনিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল। দুপুর বেলা—অনেকের উনানে ভাত ফুটিতেছিল, সে ভাতের হাঁড়ি উনানেই

রহিল ; অনেকে গোরুর জাব দিতেছিল আর তাহা হইল না, গোরু অভুক্ত রহিল। যে যেমন অবস্থায় শুনিল সেই দিকে দৌড়িল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তিন পাড়ার লোকে বাড়ী ভরিয়া গেল। সকলেই সেই ভয়ানক সংবাদ শুনিয়া হায় হায় করিতে লাগিল। বালিকা প্রসন্ন দূরে সঙ্গীদিগের সঙ্গে ফুল কুড়াইতেছিল, সবাইকে তাহাদের বাড়ীর দিকে দৌড়াইতে দেখিয়া সেও দৌড়াইয়া আসিল। আসিয়া যাহা দেখিল বা যাহা শুনিল তাহা সে বুঝিতে পারিল না, যেখানে তাহার ঠাকুমা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছিলেন সেইখানে গিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ক্রমে যত বেলা পড়িয়া আসিতে লাগিল তত পাঁচজনের সান্ত্বনায় সমবেদনায় ও শুশ্রূষায় সে কান্না অনেক শান্ত হইয়া আসিল। ক্রমে অনেকেই চুপ করিল, অনেকের সুর কমিয়া আসিল, কিন্তু হারাধন ও তাঁহার মাতা একটুও শান্ত হইতে পারিলেন না। তাঁহাদের কেবলই মনে হইতে লাগিল প্রসন্নর বিবাহের জন্য তাঁহারা এত তাড়াতাড়ি না করিলে বুঝি এ সর্ব্বনাশ আর ঘটিত না। অন্য লোক বুঝাইলে পর ভগবান ও গোবর্দ্ধন দুই ভায়ে হারাধনকে বিস্তর বুঝাইতে লাগিল। কিছুতেই যে হৃদয়ে প্রবোধ মানে না। হারাধন ভগবানের হাত ধরিয়া বলিলেন, "ভগবান, আমিই তোর এই সর্ব্বনাশ করিলাম, হায় হায় কেন আমার মরণ হইল না।" ভগবান কাঁদিল। জ্যেষ্ঠকে এতাধিক আকুল দেখিয়া সে আরও আকুল হইয়া পড়িল। বলিল "তোমার কি দোষ দাদা, যা কপালে আছে তা অবশ্য ঘটিবে। তুমিতো যেমন দেখিয়া দিতে হয় দিয়াছিলে, উহার অদৃষ্টের দোষ তা, তুমি আমি কি করিব ?"

স্থির হইয়া হারাধন অনুজের কথা শুনিলেন ; বলিলেন, "ভগবান, বুঝি সব সত্য বটে , কিন্তু আমি আর কতদিন বাঁচিব ? আমি মরিলে যার অদৃষ্টে যা থাকে তাই কেন ফলিল না, তা'হলে তো আর শেষ অবস্থায় এত যাতনা পাইতে হইত না।"

ভগবান বলিল, "দাদা, অদৃষ্টের ফলাফল কি কাহারও ইচ্ছাধীন যে, যে দিন মনে করিবে তাহার একদিনও অগ্র পশ্চাৎ না হইয়া ঠিক সেই দিন তাহা ঘটিবে ? স্বপ্নে কে কবে ভাবিয়াছিল যে আমাদের আবার এমন সর্ব্বনাশ ঘটিবে ? আবার ইহার অপেক্ষা আরও যে অধিকতর সর্ব্বনাশ না ঘটিতে

পারে তাই বা কে বলিবে? দাদা, বিধাতার লিপি তুমি আমি কি বুঝিব ?"

ভগবান বড মেধাবী, বড বুদ্ধিমান ; হারাধন ভগবানকে বড স্নেহ করিতেন, স্থিব হইয়া তাহার কথা শুনিতে লাগিলেন। শুনি[illegible] হারাধন শিহরিয়া উঠিলেন। ইহার অপেক্ষা আরও অধিকত[illegible] বলে কি ! আবও কি সর্ব্বনাশ আছে ? আছে বৈ কি। কত লোকের কত তা-বড় তা-বড় সর্ব্বনাশের কথা শুনিয়াছেন, হারাধনেব তাহা মনে পড়িতে লাগিল। হাবাধন আবাব শিহরিয়া উঠিলেন। অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। মুহুর্ত্তেব জন্য হাবাধন কান্না ভুলিয়া গেলেন। সভয়ে করুণকণ্ঠে উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিলেন 'দুর্গে, রক্ষা কর মা।" হারাধনের স্বব প্রগাঢ়, ভয়কম্পিত, শ্বাসবিজডিত। সে স্বর শুনিয়া কে জানে কেন সকলেই ক্ষণেকের জন্য চমকিয়া উঠিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সে দুঃখেব দিন এক রকমে কাটিয়া গেল। তার পর আবার সূর্য্য উঠিল, সে সূর্য্য অস্ত গেল, রাত্রি আসিল, রাত্রির পর আবার দিন আসিল। তুমি সুখেই থাক আর দুঃখেই কাটাও, দিন কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। দিনেব পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে শোক অনেকেরই মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। বধূরা আবার ঘরকন্নায় মন দিল ; ভগবান্ গোবর্দ্ধন আবার সংসারের কাজে লিপ্ত হইল, যে যাহার কাজ পূর্ব্ববৎ আবার করিতে আরম্ভ করিল। বালিকার তো কোন বালাই নাই, সে তেমনি ফুল কুড়ায়, পুতল লইয়া খেলা করে, মাঝে মাঝে হাসিয়া আকুল হয়, কেবল যখন তাহার ঠাকুমাকে এক একবার চ'খের জল ফেলিতে দেখে তখনই তাহার চোখ দুটী ছল ছল করিয়া আসে। বৃদ্ধা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আপনাকে সামলাইয়া লয়েন। হারাধনের মুখে সেই পর্য্যন্ত আর কেহ কিন্তু একদিনের জন্যও আনন্দচিহ্ন দেখিল না। জামাতার শোক সময়ে অনেকটা সহিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সেই যে ভগবান বলিয়াছিল না জানি আরও কত ভীষণ হইতেও ভীষণতর

সর্ব্বনাশ ঘটিতে পাবে সেই কথাটা হারাধন খাইতে শুইতে উঠিতে বসিতে এক দণ্ডের জন্যও ভুলিতে পারিল না। কি জানি কেন হারাধনের সদাই শঙ্কা হয়, চিন্তার কোন কারণ নাই অথচ মন হু হু করে, একটা প্রকাণ্ড অন্ধকারের চাপ যেন মাথার উপর সদাই ঘুরিতে থাকে, কি একটা অস্পষ্ট ছায়া যেন আশে পাশে নৃত্য করিয়া বেড়ায়। হারাধন বড় বিমর্ষ, বড় অসুখী। মানুষ তো কত সময়ে কত কথা বলে, কিন্তু কে জানে কিক্ষণে এক একটা কথা মুখ দিয়া বাহির হয় তাহা মানুষকে একেবারে পাগল করিয়া তোলে। হারাধন বড়ই অসুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

—*০*—

বাট্‌খারা।

নিদাঘ মধ্যাহ্ন। সূর্য্যদেব পৃথিবীকে ভস্মীভূত করিবার অভিলাষে বিষুব-রেখায় গম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন। পবনদেব জ্বরবিকার-গ্রস্ত রোগীর ন্যায় উত্তপ্ত নিশ্বাসে শ্বসিতেছেন। ধূলিরাশি সূর্য্যকিরণে চিক্‌ চিক্‌ করিয়া সমীরণ-স্পর্শে লহরে লহরে উড়িতেছে। গৃহস্থের গবাক্ষাদি রুদ্ধ। পথে পান্থ নাই। কলে পানীয় নাই। আপণিতে ক্রেতা নাই।

মুদি মহাশয় মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে পাট্টার উপরে অর্দ্ধ-মুকুলিত নেত্রে নিদ্রা-মগ্ন। নাসারন্ধ্র-ধ্বনি দৈবদে নিখাদে উঠিতেছে—নামিতেছে। কণ্ঠে নামাঙ্কুলি ত্রিকণ্ঠি, বক্ষে সলোম চন্দন-চিত্র তালে তালে কাঁপিতেছে। ঈষদ্-ভিন্ন ওষ্ঠাধরের পার্শ্ব বহিয়া তাম্বুল-রাগ ঝরিতে ঝরিতে শুখাইয়া গিয়াছে। সর্ষা-করতল-সংস্পৃষ্টে তৈলাক্তদেহ কাশীদাসের মহাভারত-খানি শান্তি-পর্ব্বের বিশ পঁচিশখানা পাতায় মুচ্‌ড়াইয়া, বক্ষ-চ্যুত হইয়া, পার্শ্বে শুইয়া পড়িয়াছে।

পার্শ্বস্থ হালুইকরের দোকানে, আখার উপরে অনুনাসিক শব্দাবলী উচ্চারিত হইতেছে। হরিদ্রাবর্ণ বোলতা-শ্রেণী ও হৃষ্ট পুষ্ট মক্ষিকা-কুল, দড়ির ঝাঁপ ভেদিয়া, চক্রে চক্রে ঘুরিয়া উড়িয়া, সগুঞ্জরণে মিষ্টপাক দ্রব্যাদির আস্বাদন পরীক্ষা করিতেছে। লোল-জিহ্ব কুক্কুরী নিমীলিত নেত্রে ঝাঁপের ছায়ায় শুইয়া শান্তি-সুখ উপভোগ করিতেছে।

এমন সময়ে মুদি মহাশযেব সমল পাট্টার উপরে বাটখাবা মহোদয়গণ ভাবিতেছেন, আমাদেব জীবন ধন্য। দেখ, মুদি মহাশয় প্রত্যূষে উঠিয়া, সবাহ্যাভ্যন্তরে শুচি হইযা, গঙ্গোদকে স্বয়ং আমাদিগকে স্নান করাইয়া দেন। সন্ধ্যা-সঙ্গে স্বয়ং ধুনা-গুগ্‌গুল ধূপে আরতি কবেন। প্রাতঃসন্ধ্যায় ভক্তির সহিত প্রণাম কবেন। তাঁহাব সদা-করতল-স্পর্শে আমাদেব দেহ তৈল-লবণাক্ত, সমুজ্জ্বল ও রঞ্জিত। আমাদিগেব দীর্ণ বাবকশাসন তাঁহাব সপদ বাক্কাসনের সম্মুখেই। তাঁহার কি চাউল বা দাইল, কি বাতাসা বা সাগু—সমস্ত দ্রব্যই আমাদিগের দ্বাবা তৌলীকৃত হয। তিনি আমা-দিগকে লইয়াই শশব্যস্ত। এই পাল্লায় নামাইতেছেন উঠাইতেছেন, এই সতৃষ্ণ নয়নে আমাদিগেব গুণগরিমা পরীক্ষা কবিতেছেন, এই তুষ্ট চিত্তে সযত্নে আমাদিগকে পার্শ্বে বাখিতেছেন। যেন আমাদিগকে কোথায় রাখিলে, কি কবিলে তিনি যে পরিতৃপ্ত হয়েন, এমন কিছু একটা ঠিক কবিতে পাবিতেছেন না।

আর ঐ দুরন্ত তান্দবটাকে দেখ। কি প্রভেদ। আমরা সুখ সম্পদের চতুর্থ তল প্রাসাদ উপরি বিরাজিত, দুর্ভাগা দুঃখেব নিম্নতম কূপে পতিত। দেখ, প্রথমে পাট্টা, তদুপরি বাব্‌কসে কড়ি শয্যায় আমাদিগের আসন—শিব-চূড়া বুঝি চালে ঠেকে। আব বাবকশ গামলা দূরে থাক্‌, পাট্টার নিম্নে বহুদূরে—পাট্টার একটী বংশপাদেব পার্শ্বে, মূষিক-দন্তোত্তোলিত চূর্ণ মৃত্তি-কায় অর্দ্ধপ্রোথিতাবস্থায় নিষ্কর্ম্মা পড়িযা রহিয়াছে! হায়, কি ক্রেতা, কি বিক্রেতা, কেহ ভ্রম ক্রমেও তাহাব তত্ত্ব করে না। আমাদিগেব মসৃণ উজ্জ্বল দেহের প্রতি—মরিচাধরা বন্ধুর দেহ লইয়া দিবারাত্র হিংসাকুল দৃষ্টে ইতর চাহিয়া আছে। অনাদর-অভিমানে দিন দিন অর্দ্ধ বক্র দেহে মৃত্তিকাশায়ী হইতেছে। বিধাতা বুঝি দুর্বদৃষ্টের সমাধিপ্রাপ্তিই লিখিয়া-ছেন!

মহৎ সংসর্গের ফল দেখ। কাচ্চা-ভ্রাতাটী কি জানি কি কারণে, এক দিবস হঠাৎ কাহাব দাইলের সহিত, কক্ষভ্রষ্ট তারকাব ন্যায় নিরুদ্দেশ হন। মুদি মহাশয পথ হইতে একটী নুড়ি আনিয়া তৎস্থলাভিষিক্ত করিয়া দিয়া-ছেন। দেখ, সেই পথের নুড়ি আজ আব পথিকেব পাদুকাতল-চুম্বী ইতস্ততঃ শায়িত সাধারণ সামগ্রী নহে। আমাদিগের সহবাসে তিনি

আমাদিগের ন্যায়ই তৈললবণাক্ত ও উজ্জ্বল দেহ। আমাদিগের ন্যায়ই সমাদৃত। তাঁহার গুরুত্ব সম্বন্ধে কে আজ সন্দেহ করে? আমাদিগের সমধর্ম্মার ন্যায় তিনি পাল্লায় উঠিতেছেন; কখন বা আমাদিগের পারিষদের ন্যায় একাই আমাদিগের কার্য্য সমাধা করিতেছেন।

আর মহৎ সংসর্গ ত্যাগের ফল দেখ। আজ যদি প্রতিনিধি কাচ্চাটীকে পথে নিক্ষেপ করা হয়, বল দেখি, এ অসাধারণত্ব হারাইয়া পুনরায় তিনি কি সাধারণ সামগ্রীর অবস্থা প্রাপ্ত হন না! যাক্, অনুগতের নির্বাসন বিরহ কল্পনা করিয়া কাজ নাই। প্রত্যক্ষ উদাহরণ হাল্দরটাকে দেখিতেছ ত; হউক আমাদিগের একই বিধাতার করে জন্ম, বক্ষে একই বিধাতার নামাঙ্কণ; হউক একই আপণি হইতে আমাদিগের ক্রয়, একই বাহকের দ্বারা বহন; ঐ জাতিপরিত্যক্তের কথা স্মরণ করিলে আমাদিগের মর্ম্ম দগ্ধ হইয়া যায়।

উহার ঐ নিশ্চল বিকট আত্মম্ভরিতা আমরা এ সগহ্বর পৃষ্ঠে আর সহ্য করিতে পারি না। এত আদর যত্ন দেখিতেছে, এত অনাদর অপমান সহিতেছে, তথাপি ঐ বৃথাগর্ব্বিত আপনার গুরুভাব গর্ব্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া খণ্ড বিখণ্ড দেহ হইয়া, আমাদিগের সহিত মিলিবার চেষ্টায় চাটুপটু ব্যবহার করিবে না! এই লঘুচিত্তকে আমাদিগের সম্মুখ হইতে শীঘ্রই স্থানান্তরিত করা সুবোধ মুদি মহাশয়ের উচিত। অগ্নিতাপ ভিন্ন ঐ কঠোর হৃদয়ের সংশোধন হওয়াও সম্পূর্ণ অসম্ভব।

হেনকালে ভবঘুরে ঈসপ্ মুনি পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি ভাবিলেন, হায় হায়, যত গোল মুদি পাকালির দোকানে! এখানে ছটাক কাচ্চাগুলাই ধরাখানাকে সরাখানা দেখে! ইহারা জানে না, কিম্বা জানিয়াও জানিতে চাহে না যে, বড় বড় মহাজনদিগের ঘরে এই দু-দশ ছটাকে বাপু সকল ঝড়তি-পড়তির মধ্যেই গণ্য!

পাটের চাস।

পাটের চাস আগে আমাদের দেশে এত অধিক ছিল না। জিনিসের প্রয়োজনীয়তা অপ্রয়োজনীয়তা অনুসারেই আদর বাড়ে। তখন কলের কাপড় আমাদের দেশে ছিল না; সুতরাং পাটেরও এত আবশ্যকতা আমাদের হয় নাই। ম্যাঞ্চেষ্টারের প্রসাদে পাট এখন বড় প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। তুলার সে আদর আর নাই; চরকা-কাটা দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে তুলার চাস বন্ধ হইবার যো হইয়াছে, এখন তাঁতিরা যে দুই চারিখানা কাপড় বুনে তাহারও জন্য সূতা আসে বিলাত হইতে। সে সূতায় পাটের ভাগই বেশি। আর বিলাতি কাপড়? তাহার তো আগা গোড়া পাট ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখন বিলাত হইতে শাল দোশালা আসিতেছে তাহাও পাটে তৈয়ার হইয়া। পাটের ব্যবহার যেমন বাড়িয়াছে বড় সুখের বিষয় যে ইহার চাসও আজকাল আমাদের দেশে তত বাড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। ম্যাঞ্চেষ্টার আমাদের নিজের শিল্পের মাথা থাইয়া আমাদিগকে তাহাদের প্রসাদপ্রত্যাশী করিয়া তুলিয়াছে কলে আমাদের তাঁতিদিগের ডান হাত কাটিয়া দিয়াছে। মানুষের জীবন ধারণ করিবার প্রধান উপকরণ, ভাত কাপড়, সেই প্রধান উপকরণের অন্যতর সামগ্রীর বিনিময়ে সে আমাদিগের নিকট হইতে রাশি রাশি টাকা লইয়া যাইতেছে, তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। Birdwood সাহেব যাহাই বলুন আমরা তাহাদিগকে কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারিব না। তবে তাহাদিগকে পাট যোগাইয়া যদি দেশের কতক টাকাও তাহাদের কাছ হইতে ফিরাইয়া আনিতে পারি এখন আমাদিগকে তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সে সবদিকে আমাদের নজর নাই, আমরা লেক্‌চার দিতেই মজবুত। তা, লেক্‌চার দিতেই আমরা থাকি; কিন্তু চাসীরা—যাহাদিগকে আমরা Lower class of people বলিয়া নির্দ্দেশ করি—আমাদের অপেক্ষা অনেক গুণে ভাল। ভাল কেননা, তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে কাজ করিতেছে; তাহারা আজকাল পাটের চাসে বেশ মন দিয়াছে।

পাটের চাসে মন দিয়া তাহাদের হইয়াছে কি? হইয়াছে এই যে, তুমি আমি বক্তৃতাবাগীশ যে মাসান্তে ত্রিংশৎ মুদ্রার জন্য পরপদসেবী ছিলাম

তাহাই রহিয়াছি, আর যে পরাণমণ্ডল আগে একসন্ধ্যাও ভাল করিয়া পেট পূরিয়া খাইতে পাইত না, জমিদারের খাজনা দিতে না পারায় নিত্য পাইক পেয়াদার বেত্রাঘাত সহ্য করিত, মহাজনের তাড়নায় কখন তাহার যাকিছু যথাসর্ব্বস্ব বন্ধক দিয়াও দেনা শোধ করিতে না পারিয়া তাহার সেই প্রাণাধিক প্রিয়তর ছেলে গোরুটী পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে বাধ্য হইত, সে এখন চারি বৎসর ধরিয়া পাঁচ বিঘা ভুঁই পাটের চাস করিয়া বেশ গুছাইয়া উঠিয়াছে, এখন জমিদারের গোমস্তা তাগাদা না করিতেই কাছারিতে বসিয়া টাকা পান, মহাজন বাড়ী বসিয়া কড়ায় গণ্ডায় সুদে আসলে সমস্ত বুঝিয়া পাইয়া ভাবেন, টাকাটা বসিয়া না থাকিয়া যদি আরো দিন কতক খাটিত! পরাণের স্ত্রীর হাতেও এখন রূপার পৈঁচা এবং ছেলের কোমরে কোমরপাটা উঠিয়াছে। দায় বিদায় পড়িলে দু দশ টাকা দিয়া উপকার করিতে না পারে এমনও নয়।

কথাটা বেশি কিছু বলিতেছি না। এরূপ হইবার বিচিত্রতা কিছুই নাই। পাটের দর আজকাল সাড়ে পাঁচ টাকারও উপর। দরটা যেন এবার বেশী উঠিয়াছে, কিন্তু ৪ টা। ৪।। টাকার কম আর নামে না। আমাদের এ অঞ্চলের চাসীরা ইহার চাস তেমন জানে না তবু বিঘা প্রতি ৮ মণ পাট বেশ জন্মে। ভাল করিয়া চাস করিতে পারিলে, প্রতি বিঘায় দশ বার মণ পাট বেশ জন্মাইতে পারে। আট মণ জন্মিলেও ৬ বিঘা পাট চাস করিলে প্রায় ২০০৲ দুইশত টাকা হয়। ৬ বিঘা জমিতে খরচা ১০০৲ টাকার উপর পড়ে না। বাকি ১০০৲ টাকা লাভ। একজন চাষার পক্ষে ইহা কি সামান্য কথা! সে যদি আর পাঁচ বিঘা ধান করিয়া বৎসরের খোরাকটা করিতে পারে, তাহার উপর একশত টাকা পাইলে তাহার ভাবনা কি? ছয় বিঘা ব্যতীত বেশি চাস করিতে সে যে না পারে তাহাও নহে। ৮ বিঘা, ১০ বিঘা, ১০ বিঘাও পারে। তা যদি সে পারে, ভাব তার লাভ কত।

পাট যে খুব লাভের চাস হইয়া উঠিয়াছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু এত লাভের হইয়াও যে পরিমাণে ইহার প্রচলন হওয়া উচিত তাহা আজও আমাদের দেশে হয় নাই। উত্তর ও পূর্ব্ব বাঙ্গলাতেই পাটের আবাদ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। রঙ্গপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর পাটের জন্য বিখ্যাত। অনেকের বিশ্বাস সে স্থানের মাটী ভাল, এসব

দেশের মাটী তেমন উৎকৃষ্ট নয়, সুতরাং পাট এখানে তেমন হয় না। কথাটা নিতান্ত অযৌক্তিক না হইলেও তাহা ভাবিয়া চুপ করিয়া থাকা ভাল নয়। একটু বুঝিয়া সুজিয়া প্রক্রিয়া মত ইহার চাস করিলেই ভাল চলিতে পারে। পাটের চাস সম্বন্ধে দুই একটী সাধারণ নিয়মের কথা বলিতেছি।

১ মাটী। দোয়াশ মাটীতেই পাট সাধারণত হয় ভাল, তবে বালির ভাগ সমান না হইয়া যদি আঠালের ভাগ বেশি থাকে তাহাতেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু বালির ভাগ অধিক হইলেই পাট ভাল জন্মে না। লবণাক্ত মাটীতেও পাট ভাল হয় না। যে সকল স্থানে বর্ষার জলে ডুবিয়া পলি না পড়ে, কি যে ক্ষেত্রে বৃষ্টির জল আদৌ দাঁড়াইতে না পারে সেরূপ ক্ষেত্র পাটের উপযোগী নহে।

২ সার। পাটের ক্ষেতে প্রায়ই সার ব্যবহার হয় না। তবে যে সব জায়গায় আদৌ পলি পড়ে না, মাটি বড় টান, সেখানে কিছু সার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। সার দেওয়ায় খরচা পড়ে বলিয়াই টান জমিতে বড় একটা কেহ পাট করে না। এ অঞ্চলে সার দেওয়ার পদ্ধতিটা আছে।

৩ বীজ। নানা জাতীয় পাট আছে, তাহার মধ্যে বগি পাটই উৎকৃষ্ট এবং তাহার বীজই প্রশস্ত। সাধারণতঃ প্রতি বিঘায় এক সের হইতে তিন সেরের অধিক বীজ লাগে না।

৪ চাস। এ প্রদেশে পাটের জমিতে কার্ত্তিক মাসে এক চাস দিয়া মটর বুনে, তার পর তাহা উঠিয়া গেলে মাঘ মাসের শেষে সার ও দুই চাস দিয়া ফেলিয়া রাখে, অবশেষে বীজ বুনিবার সময় এক চাস দিয়া বীজ ছড়াইয়া তার উপর মৈ দিয়া ঢেলা ভাঙ্গিয়া দেয়। এ প্রথা ভাল নয়। পাটের জমিতে অন্য কোন চাস না করাই উচিত। মাঘ ফাল্গুন মাসে বৃষ্টি হইবা ক্ষেতের মাটি নরম হইলেই পাটেরচাস আরম্ভ করিতে হয়। সাত আট চাসের কম জমি তৈয়ারি হয় না। চৈত্র মাসে বৃষ্টি হইয়া মাটি ভিজিয়া গেলে বীজ বুনিতে হয়। বৈশাখের মধ্যেই বুনন কার্য্য শেষ করা আবশ্যক। গাছ আধ হাত প্রমাণ হইলেই একবার বিদা দিয়া নিড়ান দেওয়া দরকার। নিড়ান না দিলে পাট ভাল হয় না। ঘাস জঙ্গল তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে পাটের গাছও পাতলা করিয়া দিতে হয়। ৫।৬ আঙ্গুলের কম যেন পরস্পরে ব্যবধান না থাকে।

অতিশয় ঘন হইলে গাছ, যেমন মোটা হইতে পারে না, তেমনি অত্যন্ত পাতলা হইলেও ডাল পালা হইবা গাছ থাবাপ হইয়া যায়।

৫ কাটাই। আষাঢের শেষাশেষি আরম্ভ করিয়া শ্রাবণেই পাটকাটা শেষ করা ভাল। কেহ কেহ ভাদ্র মাস পর্যন্ত কাটে, কিন্তু তাহা ভাল নয়। তখন গাছ পাকিয়া শক্ত হইয়া যায়। পাটের গোড়া সমেত উপাড়িয়া তোলা অন্যায। কিছু ওজনে ভারি হয় বটে, কিন্তু দরে বড় ঘাটিয়া যায়। তাহা ছাড়াইতেও বড় কষ্ট।

৬ কাচাই। পাট কাটা হইলে ছোট ছোট আটি বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া ঝাঁক দিযা পচাইতে হয। বদ্ধ জলই ভাল, তাহাতে শীঘ্র পচে। কম পচিলে ভাল পরিষ্কার হয না। সাধারণতঃ পচিতে প্রায় এক পক্ষ লাগে। পাট পচিলে ঝাঁক হইতে বাহির করিয়া একটা কাটের বাড়ি গোড়ার দিকে ভাঙ্গিয়া আলগা পাট ধরিয়া জলের মধ্যে ঝাঁকি দিলেই গোড়াগুলি বাহির হইয়া যায়। তার পর ছাড়াইতে আর বড কষ্ট বা বিলম্ব হয় না। কোন কোন স্থানে অন্য পদ্ধতিতে কাচে, কিন্তু তাহা অপেক্ষা ইহাই প্রশস্ত ও সুবিধাজনক।

পাটের চাস যে বিশেষ একটা নটখটি কাজ তাহা নয; অথচ ইহাতে লাভ বেশ। মাল তৈয়ার হইলেই টাকা। খরিদদারের অভাব নাই। দালাল, পাইকির, আড়তদার, হৌসওয়ালা সবাই হা করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। ওজন দিতে পারিলেই পয়সা। দরও কিছু কম নয়, মণ প্রতি পাঁচ টাকারও উপর। এমন লাভের চাসও কি অবহেলা করিতে আছে? আমরা বাক্যধুরন্ধর, আমরা বাক্যেরই উপাসনা করি, কিন্তু ভাই চাষি, তুমি এ সব ফাকা কথায় কান না দিয়া যে কাজে ব্রতী হইয়াছ তাহারই সাধনায় শরীর উৎসর্গ কর। ভাগ্যদেবতা কখনই তোমার প্রতি অপ্রসন্ন থাকিবেন না। শাস্ত্রের কথা—"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী তদর্দ্ধং কৃষি কর্ম্মণি।' বাণিজ্যের সঙ্গতি আমাদের নাই; কিন্তু কৃষিকার্য্যে আমাদের যত সুবিধা এত সুবিধা আর কাহার? আর কাহার দেশ রত্নপ্রসবিনী—কোন্ দেশে আর এমন করিয়া মাটী আঁচড়াইয়া একটা দানা ফেলিলে তাহা হইতে সোণা ফলে? কিন্তু দূর হোক, সে সব কথার শ্রাদ্ধে আর কাজ নাই।

বংশাবলি। • দ্বিতীয় প্রস্তাব

আদিশূর, কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত মত। কিন্তু এই কান্যকুব্জ কোথায়, বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের কোন্ বিভাগে অবস্থিত, তাহা জানা উচিত। যত দূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়, কান্যকুব্জ নগর, অতীব প্রাচীন। "চন্দ্রবংশীয় পুরুরবার অন্ববায়ে দশম পুরুষে কুশনামা নৃপতি জন্ম গ্রহণ করেন। কুশের পুত্র কুশনাভ, 'মহোদয়'-নামে নগর বা দেশ স্থাপন করেন। কুশনাভের এক শত কন্যা ছিল, বায়ু কর্ত্তৃক কন্যাগণ কুব্জা হয়। (রামায়ণ, বালকাণ্ড, ৩০ সর্গ)। তাহাতেই 'মহোদয়ের' নাম কান্যকুব্জ হয়। "কান্যকুব্জমিতি খ্যাতং ততঃপ্রভৃতি তৎ পুরং।" কালক্রমে নগরের নাম হইতে দেশের নাম কান্যকুব্জ হইয়াছে। কুল্লুকভট্ট, মনুর টীকাতে কহেন, পাঞ্চাল দেশের নামই কান্যকুব্জ। সম্ভবতঃ দক্ষিণ পাঞ্চাল এবং কান্যকুব্জ এক বলিয়াই বোধ হইতেছে (৫)। কানপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে অদ্যাপি প্রাচীন কান্যকুব্জের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে।" [গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ৫৩ পৃষ্ঠা।]

(৫) পুরুরবার যে কয় পুরুষের পর কুশ ও কুশনাভ জাত হন, প্রদর্শিত হইল।

১ম পুরুরবা + উর্ব্বশী (পত্নী।)

- আয়ু
- ধীমান্
- ২ অমাবসু
  - ৩ ভীম
  - ৪ কাঞ্চন
  - ৫ সুহোত্র
  - ৬ জহ্নু
  - ৭ সুমন্ত
  - ৮ রূপবাজক বা অজজাপক
  - ৯ বলাকাশ্ব
  - ১০। কুশ
  - ১১ কুশিক (কুশাম্ব) কুশনাভ
    - কুশিক: গাথি বা গাধি
    - কুশনাভ: ১০০ কন্যা

যে স্থান, এখন কনোজ নামে পরিচিত, তাহার অন্য নাম গাধিপুর, মহোদয়, কান্যকুব্জ ও পাঞ্চাল। সম্ভবতঃ প্রথমে ঐ স্থানে গাধির নামানুসারে "গাধিপুর" ছিল। তদনন্তর কুশনাভ কর্ত্তৃক ঐ স্থান "মহোদয়" নামে খ্যাত হয়। কুশনাভের ১০০ একশত কুব্জা কন্যা হইতে "কান্যকুব্জ" তৎপরে "পাঞ্চাল" আখ্যা প্রচলিত হইয়াছিল। পাঞ্চাল ২ দুই ভাগে বিভক্ত, উত্তর পঞ্চাল ও দক্ষিণ পঞ্চাল। সর্ব্বশেষে কনোজ নাম হইয়াছে। কনোজ কান্যকুব্জের অপভ্রংশ মাত্র।

আদিশূর, কোন্ সময়ে বঙ্গের সিংহাসনে বিরাজিত ছিলেন, এস্থলে তাহার নিষ্পত্তি হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলেই, উক্ত ৫ পঞ্চ ব্রাহ্মণ, কোন্ সময়ে গৌড়ে সমাগত হন, স্থিরতর হইবে।

"গৌড়ে ব্রাহ্মণ"-প্রণেতা মহাশয়, আদিশূরের রাজত্বকাল নির্দ্ধারণ জন্য যে যে বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, এখন অগ্রে তাহাই আলোচিত হইতেছে।

১। "আদিশূর, পালবংশের শেষ নৃপতিকে পরাস্ত করিয়া গৌড়াধিকার করেন এবং গৌড় হইতে বৌদ্ধদিগকে দূরীভূত করেন, খ্রীষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দীর পরে, পূর্ব্ব প্রদেশে পালবংশীয়দের রাজত্ব ছিল না, সেনবংশীয়গণ একটি নূতন সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। অধ্যাপক লাসেন্ সাহেবের বিবেচনায় পালবংশীয় শেষ নৃপতি ১০৪০ দশ শত চল্লিশ খ্রীষ্টাব্দে (৯৬২ শকে) বৈদ্যজাতীয় নৃপতি কর্ত্তৃক গৌড় হইতে তাড়িত হন। ডাক্তার বকানন্ কহেন, পালবংশের শেষে যিনি রাজা হন, তাঁহার নাম আদিশূর। ইয়ুরোপীয় গ্রন্থকর্ত্তারা আদিশূরকে বৈদ্য বলিয়া জানেন এবং তাঁহাকে সেনবংশোৎপন্ন বিবেচনা করেন। "লঘুভারত"-প্রণেতাও কহেন, আদিশূর, মহীপাল-বংশ উচ্ছেদ করিয়া, গৌড়ে রাজা হন। তাঁহার মতে কলির ৪১৩০ বৎসর গতে অর্থাৎ ৯৫১ শকাব্দে আদিশূর রাজত্ব প্রাপ্ত হন। * * * লাসেন্, ১০৪০ খ্রীষ্টাব্দ কহেন, তাহাতে ৯৬২ শকাব্দে আদিশূরের রাজ্যারম্ভ শক হইতেছে। ঘটকদিগের গ্রন্থেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আদিশূর, ৯৫৪ শকাব্দে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন।"—[গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ৪৩,৪৫ ও ৪৬ পৃষ্ঠা।]

ইহা ব্যতীত এ সম্বন্ধে আর আর যতগুলি মত প্রচলিত আছে, একে একে সমস্তই অনুশীলন করা যাইতেছে। ঐরূপ আলোচনা করিবার তাৎপর্য্য এই, উহা দ্বারা তত্ত্ব-নির্ণয়ের অনেক সুবিধা হইবে।

২। ঘটকদিগের বাঙ্গালা কারিকার মতে, ৯৯৪ শকে দ্বিজ-পঞ্চক বাঙ্গালা দেশে শুভাগমন করেন।

৩। "ক্ষিতীশবংশাবলিচরিতম্" নামক সংস্কৃত গ্রন্থের মতে ৯৯৯ শকে আদিশূর ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন।

৪। "সম্বন্ধনির্ণয়"-লেখক বলেন, ৯৯৯ সংবতে (৮৫৪ শকে) ব্রাহ্মণগণ বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন।

৫। ১২৬৩ সালের ৮ই চৈত্রের এডুকেশন, গেজেটে "গৌড়ে পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমন"-প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে, ৯১৪ শক, ব্রাহ্মণগণের বঙ্গদেশে গমনের সময়।

৫। ঘটকদিগের সংস্কৃত গ্রন্থের প্রমাণে ৯৫৪ শকে ব্রাহ্মণেরা বঙ্গে আইসেন।

এখন উল্লিখিত মত গুলির মধ্যে কোন টি প্রমাণিক, তদ্বিষয়ের নিষ্পত্তি করা কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে আমাদের যুক্তি-প্রমাণ পশ্চাৎ লিপিবদ্ধ করা গেল।

(ক) ৯৯৪ শক দ্বিজ-পঞ্চকের বঙ্গাগমনের সময় হইতে পারে না। ঘটক-দের বাঙ্গলা কারিকার সর্ব্বস্থল বিশ্বাস-যোগ্য নয়।

(খ) ক্ষিতীশ বংশাবলিচরিতং গ্রন্থ যদিও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, তথাপি এস্থলে বিশ্বাস্য নয়। ৯৯৯ শকে যদি আদিশূর ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, ইহা স্বীকার্য্য হয়, তাহা হইলে বিষম ভ্রমে পড়িতে হয়। আদিশূরের ৮।৯ আট নয় পুরুষ পরবর্ত্তী বল্লালসেন ৯৮৮ শকে (১০৬৬খ্রীঃ) বঙ্গাধিপত্য প্রাপ্ত হন। আইন আকবরি পুস্তকে উক্ত বিষয় নির্দ্দেশিত আছে। অতএব উহা ভ্রান্ত মত।

(গ) 'সম্বন্ধ-নির্ণয়'-কর্ত্তা, ক্ষিতীশবংশাবলিচরিতের উক্তি অব্যাহত রাখিতে গিয়া, একটি কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। ৯৯৯ শক বলিলে যে ভ্রম হয়, তাহা উপরে বর্ণনা করা গিয়াছে। তন্নিমিত্ত লালমোহন বাবু ৯৯৯সংবৎ অনুমান করিয়াছেন। ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে ঠিক হয় নাই। বঙ্গদেশে শকাব্দই সমধিক প্রচলিত। বিশেষতঃ ঐ পুস্তক, বঙ্গদেশেই সঙ্কলিত হয়। এতদ্ব্যতীত আরও গুরুতর ভ্রান্তি দৃষ্ট হইতেছে। ৯৯৯ সংবৎ যদি ব্রাহ্মণানয়নের কাল ধরিয়া লওয়া যায়, তাহাতেও গোলযোগ থাকে। ঐ সংবতে ৮৬৪ শক। তখন পালবংশীয়গণ রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন। তাহার অনেক পরে তিনি রাজপদ লাভ করেন। অতএব এই মতও ভ্রান্তিসঙ্কুল হইতেছে।

(ঘ) এডুকেশন্ গেজেটের লেখক, কোন বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ-প্রয়োগ করেন নাই। তিনি ৯১৪ শক প্রমাণার্থ কেবল "বেদশশাঙ্ক-শাকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ" এই খণ্ড বচন উল্লেখ করিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। ঐ সংস্কৃত বচন, কোন প্রামাণিক পুস্তকের অন্তর্গত বলিয়া বোধ হয় না। যদি ৯১৪ শকে ব্রাহ্মণাগমন স্থির করা যায়, তবে বলিতে হয়, আদিশূর রাজা হইবার পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণ আসেন। "বেদশশাঙ্ক শাকে তু গৌড়ে বিপ্রা

সমাগতাঃ" বচনার্দ্ধকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলে, ৯৫৪ শকও লব্ধ হইতে পারে। শশী শব্দে এক ও পাঁচ বুঝায়। "চন্দ্র" শব্দ, শশী শব্দের প্রতিবাক্যমাত্র। সুতরাং 'চন্দ্র" শব্দেও ৫ পাঁচ বুঝাইবার বাধা নাই। আদিশূরের ও বল্লালসেনের রাজত্ব সময়ের সহিত ঐক্য-রক্ষার নিমিত্ত এইরূপ মীমাংসা অসঙ্গত নয়।

(ঙ) "বেদশশাঙ্ক শাকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ" এই বচনে যে ৯৫৪ শক পাওয়া যাইতেছে, তাহাই অনেকাংশে যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। অতএব বলিতে হয়, ৯৫৪ শকেই কান্যকুব্জ হইতে সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণের বঙ্গে শুভাগমন সংঘটিত হইয়াছিল।

'ক্ষিতীশ—৯৫৪ শকের প্রাক্কাল।

প্রাতঃ-স্মরণীয় ক্ষিতীশের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ৩ তিন পুরুষের নাম ঘটনাক্রমে পাওয়া গিয়াছে, এক্ষণে সেই বিষয় লিখিত হইল। তাঁহাদের নাম কলিব্যাস, কামদেব ও বামদেব। ক্ষিতীশ মহোদয় যে, অন্যান্য আর চারি ৪ জনের অর্থাৎ মেধাতিথি সৌভরি, সুধানিধি ও বীতরাগের সমভি-ব্যাহারে বঙ্গদেশে সমাগত হন, ইতিপূর্ব্বে তদ্বিবরণ নির্দ্দেশিত হইয়াছে। ক্ষিতীশের পুত্রের নাম ভট্টনারায়ণ বা নারায়ণ ভট্ট। মতান্তরে তাঁহার অন্যতর তনয় থাকার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। সে নামটি দামোদর সদাচার্য্য। এ স্থলে আমরা কেবল ভট্টনারায়ণের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

ভট্টনারায়ণ—(৯৫৪ শক)।

বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকার ও রাঢ়ীয় কোন কোন গ্রন্থের মতানুসারে ভট্টনারা-য়ণ মহাশয়, "নারায়ণ ভট্ট" নামে পরিচিত। ঐরূপ হওয়া অসম্ভব বা অসঙ্গত হয়। ১৯০৩ উনিশশত তিন সংবতে পুনানগরে লিথোগ্রাফ অক্ষরে ভট্টনারায়ণের "বেণীসংহার" নাটক দ্বিতীয় বার মুদ্রিত হয়। তাহার সমাপ্তি স্থলে "মৃগরাজ নারায়ণ ভট্ট"-প্রণীত নাটক বলিয়া ধ্বনিত আছে "ভট্ট' শব্দ উপাধি-মাত্র। কোন সময়ে উহা নামের অগ্রে কখন বা নামের পরেও প্রযুক্ত হইতে দেখা গিয়া থাকে। "আর্য্যভট্ট" পদে "ভট্ট" শব্দ তদীয় আখ্যার অন্তে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। রাঢ়ীয় সম্প্রদায়ে ভট্ট-নারায়ণ শব্দ এবং বারেন্দ্র সম্প্রদায়ে নারায়ণ ভট্ট শব্দ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

আদিশূর মহারাজ, গৌড়ে ২ দুই বার ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, কুলশাস্ত্রে এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথম বার রাজসূয় যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত ক্ষিতীশাদিকে আনয়ন করেন। দ্বিতীয় বার পুত্রেষ্টিযাগ সমাধার জন্য ভট্ট-নারায়ণ ও তদীয় সহচর শ্রীহর্ষ, বেদগর্ভ, ছান্দড় ও দক্ষ এই ৫ পাঁচ জন ব্রাহ্মণ ও সেই পাঁচ জনের সঙ্গে ৫ পাঁচ অনুচর বঙ্গে সমাগত হন। কান্যকুব্জের কোন কোন পুস্তকের মতে প্রথম বারে ব্রাহ্মণেরা কোন প্রকার যজ্ঞই করেন নাই। যাঁহারা গৌড়ে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম, গোত্র এবং তাঁহাদের ভৃত্যগণের নাম ও গোত্র পশ্চাৎ প্রদত্ত হইল।

গোত্রের নাম	বঙ্গাগতদ্বিজদের নাম	দ্বিজদেরভৃত্য নাম	ভৃত্যদের গোত্র
..	..	...	...
শাণ্ডিল্য	ভট্টনারায়ণ	মকরন্দ ঘোষ	সৌকালীন
কাশ্যপ	দক্ষ	দশরথ বসু	গৌতম
বাৎস্য	ছান্দড়	পুরুষোত্তম দত্ত	মৌদ্গল্য
ভরদ্বাজ	শ্রীহর্ষ	বিরাট গুহ	কাশ্যপ
সাবর্ণ	বেদগর্ভ	কালিদাস মিত্র	বিশ্বামিত্র

আদিশূর, পাঞ্চাল দেশের মহীপাল বীরসিংহ মহোদয়কে যে শ্লোক লিখিয়া পাঠান, তাহাতে লেখা আছে, "পুনর্বার" মদীয় রাজ্যে সাগ্নিক, বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণ প্রেরণ করুন (৬)। প্রথমাগত ব্রাহ্মণেরা রাজার যজ্ঞ সমাপন না করিয়াই, স্বদেশে প্রত্যাগত হন। বারেন্দ্র ঘটকেরা, উহার বিপরীত-মতাবলম্বী। তাঁহাদের মতে ব্রাহ্মণেরা, যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া নিজ দেশে গমন করিলে, তথায় হতাদর হন। পরে সস্ত্রীক সপুত্র বঙ্গে আগমন করেন।

আদিশূরের রাজত্বের পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালরাজগণের রাজ্য-সময়ে বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম্মের খর্ব্বতা হয়। তৎকালে বাঙ্গালা দেশে ৭৫০ সাড়ে সাত শত নব ব্রাহ্মণ ছিল। তাঁহারা ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম-বিহীন "সপ্তশতী" ব্রাহ্মণ

(৬) নৃপতি-সুকৃতি-সারঃ স্বীয়-বংশাবতারঃ,
প্রবল-বল-বিচারো বীরসিংহোতিধীরঃ।
ময়ি বরসখিতান্ তে, ভূমিদেবান্ সভৃত্যান্,
পুনরপি মম গৌড়ে প্রাপয় ত্বং নিতান্তং॥

সংজ্ঞায় অভিহিত হইতেন। তন্নিবন্ধন রাজাকে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিতে হয়।

পুত্রেষ্টি যজ্ঞের কারণ ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি পাঁচজন বিপ্র গৌড়ে আগমন করেন। "ব্রাহ্মণেরা, কান্যকুব্জ দেশ হইতে বহির্গত হইয়া, প্রথমতঃ প্রয়াগ তীর্থে উপস্থিত হন। প্রয়াগে তীর্থোচিত কার্য্য সকল সমাধা করিয়া বারাণসীতে আইসেন। তথায় বিশ্বেশ্বরকে দর্শন বন্দন এবং তীর্থোপযুক্ত কার্য্য করেন, তৎপরে ব্রাহ্মণেরা গয়াতীর্থে পিতৃলোকের পিণ্ডদান ও শ্রাদ্ধাদি করিয়া গৌড়দেশে আদিশূরের সভাতে উপস্থিত হন।"—[গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ৫৩, ৫৪ পৃঃ] তাঁহারা পূর্ব্ব বাঙ্গালার গৌরব-নিকেতন বিক্রমপুরে রাজ-প্রাসাদে উপস্থিত হন। কোন কোন ব্যক্তির মতে আদিশূর নরপতি, তৎকালে রামপালের নিজ-রাজ-প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন; দ্বিজগণ রামপালেই রাজদর্শনাভিলাষী হন। "মৃত মহাত্মা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রযত্নে বেণীসংহার নাটক মুদ্রাঙ্কনকালে পণ্ডিত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ যে ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলেন, যখন কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণেরা আইসেন, তখন আদিশূর রামপাল নগরীতে ছিলেন, এবং ব্রাহ্মণেরাও তথায় উপস্থিত হন। বিদ্যাবাগীশ, কোন্ প্রমাণের বলে ঐরূপ লিখিয়াছেন, তাহার প্রকাশ নাই। পক্ষান্তরে বিদ্যাবাগীশের লিপি, কুলগ্রন্থের লিখনের বিপরীত। রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র কুল-গ্রন্থে অতি স্পষ্টভাবে লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণেরা গৌড় নগরীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন (৭)। কুলগ্রন্থের লেখা, অন্যান্য ঘটনাবলি দৃষ্টে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। রামপাল নগরী বঙ্গদেশান্তর্গত (৮), বিক্রমপুরের মধ্যস্থ। গৌড়দেশে আগত বলিলে বিক্রম-পুরে যাওয়া বুঝায় না। যদি প্রকৃত পক্ষে বিক্রমপুরে যাইতেন, তাহা

---

(৭) "কোলাঞ্চতো দ্বিজবরা সমিতা হি গৌড়ং।
রাজাদিশূর-পুরতঃ জমদগ্নি-তুল্যাঃ।"—[কুলসার-সংগ্রহ]
"কণ্ঠ-নিষ্ঠ-বিষ্ণু-চক্র-মূর্ত্তয়োঽপি তে দ্বিজাঃ।
সুপ্রশস্ত-গৌড়দেশমাশুতোষমাযযুঃ॥—[বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকা।]

(৮) "পশ্চিমে করতোয়া, উত্তর এবং পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র নদ, দক্ষিণে বাঙ্গালার অখাত, এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন—পাবনা, বগুড়া ফরিদপুর এবং ময়মনসিংহ জেলার প্রায়শঃ ভূমিখণ্ড ও ঢাকা জেলা বঙ্গদেশ বলিয়া খ্যাত। চন্দ্রবংশীয়

হইলে বারেন্দ্র অথবা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের আদি নিবাসের চিহ্ন বিক্রমপুরে লক্ষিত হইত। * * * * বিক্রমপুরাঞ্চলে যে সকল বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের বসতি দেখা যায়, সেই সকল ব্রাহ্মণ, বহুকাল পরে বারেন্দ্র দেশ হইতে বিক্রমপুরে গিয়া বসতি করিয়াছেন। বারেন্দ্র কুলগ্রন্থের লিখন-দৃষ্টে আরও উপলব্ধি হয়, ব্রাহ্মণেরা প্রথমে গঙ্গাতীরে বসতি করিয়াছিলেন।"

"গৌড়ে ব্রাহ্মণ প্রণেতার ঐ সকল কথায় সায় দিতে পারা যায় না। বিক্রমপুর বা রামপাল গৌড়েরই অন্তর্গত। "গৌড়ে" আগমন বলিলে,কেন বিক্রমপুরে বা রামপালে আসা অসিদ্ধ হইবে?

সে যাহা হউক,যৎকালে সেই অমিত-প্রতাপশালী ব্রাহ্মণেরা রাজধানীতে শুভাগমন করেন, তখন রাজা, অন্তঃপুরে ছিলেন। দৌবারিক-মুখে দ্বিজ-কুলের বেশভূষাদি অবগত হইয়া (৯) তদ্দণ্ডেই সাক্ষাৎকারে ব্যাকুল না হইয়া সংবাদদাতা দৌবারিককে বলিয়া দিলেন, "আমি এখন কার্য্যান্তরে ব্যস্ত আছি, সময়ান্তরে সাক্ষাৎ করিব।" এদিকে ভূসুর-বৃন্দ আশীর্ব্বচন-প্রয়োগে সমুৎসুক হইয়া আশীর্ব্বাদীয় জল-পুষ্পাদি শুষ্ক মল্ল-কাষ্ঠোপরি

বলিরাজার অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও ওড্র নামে সন্তান জন্মে। তাঁহারা যে যে দেশ অধিকার করেন, অধিকর্ত্তার নামানুসারে সেই দেশের নাম হয়।

"বরেন্দ্র দেশ, গৌড়ের একাংশ। মহানন্দা নদীর পূর্ব্ব, এবং করতোয়া নদীর পশ্চিমস্থ ভূমিখণ্ড, বরেন্দ্র নামে অভিহিত। আদিশূর-বংশীয় প্রদ্যুম্ন-শূর এবং বরেন্দ্রশূর এক সময়ে রাজা হইয়া গৌড়দেশ দুই ভাগে বিভক্ত করেন। বরেন্দ্রশূরের অধিকৃত খণ্ডের নাম বারেন্দ্রদেশ। অদ্যাপি ঐ দেশ বরেন্দ্রী শব্দে অভিহিত আছে।" (গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ৫৭ পৃষ্ঠার টীকা)

(৯) গোযানে আরোহণ, পদে চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিয়া তাম্বূল চর্ব্বণ, হস্তে ধনুর্ব্বাণ ধারণ, পৃষ্ঠে লম্বমান তূণীর ইত্যাদি পরিচ্ছদ। "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" পুস্তক প্রণেতা কহেন, "কান্যকুব্জ দেশ, গৌড়দেশ হইতে বহু দূরে অবস্থিত। বর্তমান সময়ে যদি রেলওয়ে উঠিয়াও যায়, তাহা হইলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সুশাসনে এবং পথের সুব্যবস্থা নিবন্ধন,কান্যকুব্জ দেশ হইতে গৌড়দেশে আসা যেরূপ সুখসাধ্য, শকাব্দ-সহস্র-শতাব্দীতে ইহা হইতে সহস্র গুণ কষ্টসাধ্য ছিল। উপযুক্ত পথ ও শাসনাভাবে পথিমধ্যে দস্যু কর্তৃক (আক্রান্ত হইয়া) অনেকে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতেন। ইহাতেই ব্রাহ্ম

প্রক্ষেপ করিলেন। করিবামাত্র নীরস কাষ্ঠ, সরস ও মুকুলিত হইল (১০)। এই অভূতপূর্ব্ব সমাচার প্রতিহারী দ্বারা রাজগোচরে উপনীত হইল। তখন তিনি নিতান্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বহির্বাটীতে আগমনপূর্ব্বক দ্বিজপঞ্চকের চরণ বন্দন করিলেন। ইহার অব্যবহিত কাল পরে যজ্ঞ কার্য্য আরম্ভ হয়। ভট্টনারায়ণ, হোতার কর্ম্ম সম্পাদন করেন, এই হেতু তিনি অন্য ৪ চারি জনের মধ্যস্থলে আসীন হন।

ণেরা ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া অশ্বারোহণে গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন।" উক্ত হেতু ব্যতীত অন্য কারণও আছে। তৎকালে ব্রাহ্মণেরাও তৎসাময়িক প্রথানুসারে ঘোটকারোহণ ও ধনুঃ-শর ধারণ করিতেন। ইহার পূর্ব্বেও ঐরূপ প্রণালী ছিল। দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা তাহার প্রমাণস্থল।

(১০)। "বিক্রমপুরের লোকে বলেন, বল্লাল সেনের বাটীর দক্ষিণে যে দীঘী আছে, তাহার উত্তর পাড়ে পাকা ঘাটের উপর ঐ বৃক্ষ অদ্যাপি সজীব আছে। বৃক্ষ অতি বৃহৎ, নাম গজারি বা গজালি বৃক্ষ। এতজ্জাতীয় বৃক্ষ বিক্রমপুরের আর কোথায়ও নাই। ময়মনসিংহ জেলার মধুপুর পাহাড় ভিন্ন অন্যত্র কুত্রাপি লক্ষিতও হয় না।" (বহুবিবাহ পুস্তক)। 'সকলেই এই গজাড়ি বৃক্ষটিকে আদিশূরানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ প্রদত্ত আশীর্ব্বাদে জীবিত মল্লকাষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। এই একটিমাত্র বৃক্ষ ভিন্ন রামপালের চতুষ্পার্শ্বে আর কুত্রাপি গজাড়ি বৃক্ষ নাই। চতুষ্পার্শ্বের অজ্ঞ ব্যক্তিরা এই বৃক্ষকে দেবতাস্বরূপ সম্মান করে, এবং অপুত্রবতী রমণীরা সন্তান-লাভার্থ বৃক্ষমূলে পূজা মানস করে।" (আদিশূর ও বল্লালসেন, ৪ পৃষ্ঠার টীকা)

প্রণয় পরিণাম।

বাঙ্গালার উপন্যাসের আজ কি অবস্থা তাহা জনৈক প্রসিদ্ধ সমালোচক প্রস্তাবান্তরে এই পত্রিকায় বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন, সুতরাং বর্ত্তমান উপন্যাসখানির সমালোচনায় আর আমরা সে সব কথা তুলিতে চাহি না। বস্তুতঃ লেখকের দোষে উপন্যাস আজ কাল আমাদের দেশে বড়ই হেলা-ফেলার সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জানি না 'ছারপোকা' নাটকের ন্যায় আবার কোন 'মাকড়সা' উপন্যাস রচিত হইবে কি না, কিন্তু যেরূপ স্রোত তোড়ে বহিয়া চলিয়াছে, তাহাতে তাহা অতি বিচিত্র ও নিতান্ত অসম্ভব বলিয়াও বোধ হয় না। এই অবস্থায় যদি কচিৎ দুই একখানি ভাল উপন্যাস প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে অবশ্যই বড় আহ্লাদের কথা। প্রণয়-পরিণামের লেখক বিশেষ খ্যাতনামা না হইলেও আমরা তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া যার পর নাই পরিতৃপ্ত হইয়াছি। প্রণয়পরিণামে যে দোষ নাই, তাহা বলি না, সে গুণ ও দোষ উভয়েরই সংক্ষেপতঃ যতদূর সাধ্য আলোচনা করিতেছি।

উপন্যাস-লেখকের তিনটী বিষয়ে বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। প্রথম, উপন্যাসের গল্প; দ্বিতীয়, উপন্যাসের চরিত্র, তৃতীয়, উপন্যাসের ভাষা। এ ছাড়া আরও একটী অনতিসামান্য, সুতরাং অনুপেক্ষণীয় বিষয় আছে, তাহা, যদিও পূর্ব্ব কথিত তৃতীয় বিষয়টীর অন্তর্গত, তবুও তাহার নিজের একটু বিশেষত্ব আছে বলিয়া বোধ হয়। তাহার অভাবে উপন্যাস লেখায় আর গল্প লেখায় বিশেষ একটা প্রভেদ বলিয়া বোধ হয় না। সেই আবশ্যকীয় বিষয়টি উপন্যাস রচনার ভঙ্গী। আমরা এই কয়েকটী বিষয়ে প্রণয় পরিণামের লেখক কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছেন, অতঃপর তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

---

* শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

(গল্প)

প্রণয় পরিণামের গল্প সংক্ষেপতঃ এই :—প্রবোধচন্দ্র ললিতপুরের জমিদার। প্রবোধ অচিরপ্রাপ্ত যৌবন, শান্ত, ধীর, উন্নতস্বভাব। প্রবোধের প্রিয়সুহৃদ সুরেন্দ্রনাথ। সুরেন্দ্রনাথ শ্যামনগরের জমিদার, তিনিও প্রবোধের ন্যায় যৌবনবয়স্ক, সুশীল, সচ্চরিত্র, উদাত্তগুণসম্পন্ন। উভয়েই অকৃতদার, অথচ উভয়েই প্রণয়ী। প্রবোধ তাঁহাদেরই পাড়ার একটি গতসৰ্বস্বা অনাথিনীর মধুরস্বভাবা কন্যা বিরাজমোহিনীর রূপগুণে মুগ্ধ। আর সুরেন্দ্রনাথ প্রবোধের আশ্রিত কুসুমকোমলা কুসুমকুমারীর জন্য চিত্তহারা। প্রবোধ যাহাকে চান, সেও তাঁহাকে চায় ; বিরাজ বালিকা হইলেও তাহার বালিকা হৃদয়ে যতখানি ভালবাসা সম্ভব, তাহা দিয়া সে অন্তরে অন্তরে প্রবোধের পূজা করে। সুরেন্দ্রনাথের অদৃষ্ট কিন্তু সেরূপ প্রসন্ন নহে। সুরেন্দ্র একদিন হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় বেগ নিবারণ করিতে না পারিয়া কুসুমের নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। বজ্রাহতের ন্যায় চমকিয়া সুরেন্দ্র শুনিলেন, কুসুম অন্যের নিকট বিক্রীত। কুসুম অন্তরে অন্তরে প্রবোধকেই আত্ম সমর্পণ করিয়াছে। এইখান হইতে কয়জনের প্রণয় পরিণামের সূত্রপাত হইল। সুরেন্দ্র হৃদয়ের আবেগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া সমস্ত ত্যাগ করিয়া শ্মশানে গমন করিলেন। সেই শ্মশানক্ষেত্রে সহসা এক পাগলের সহিত দেখা হইল। আশ্চর্য্য পাগল! রমাপাগল তাঁহার সকল কথা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া তাঁহাকে ক্ষুদ্র প্রেম ত্যাগ করিয়া বিশ্ব প্রেম অবলম্বন করিতে বলিল। স্থির হইয়া সুরেন্দ্র সেই পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। গৃহে আসিয়া প্রথমতঃ তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি কুসুমের নামে দানপত্র করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। কুসুম কিন্তু সে দান গ্রহণ করিল না, দানপত্র খানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সুরেন্দ্রকে যথাবিহিত উত্তর লিখিল। গৃহে আসিয়া প্রথমতঃ অগত্যা সুরেন্দ্রনাথ বিষয়াদি পুনর্গ্রহণ করিয়া অর্থে সামর্থ্যে লোকের কল্যাণে ব্রতী হইলেন। অভাগিনী কুসুমও আপন অবস্থা বুঝিল। বুঝিল, প্রবোধ তাহার পক্ষে দুর্লভ ; বুঝিল বিরাজ মোহিনী ভিন্ন প্রবোধের বাঞ্ছিত আর নাই। তখন সেই রমণীললামভূতা রমণীর যাহা অসাধ্য, তাহা করিতে প্রবৃত্ত হইল। সে আপনার হৃদয়কে বলি দিয়া অতঃপর প্রবোধ বিরাজের মিলনের জন্য যত্নবতী হইল।

কিন্তু মাত্র এই চারি জনের প্রণয় পরিণাম লইয়া এ পুস্তক লিখিত হয় নাই। আরও কয়জনের কথা ইহাতে আছে। প্রবোধচন্দ্রের এক ভগ্নী ছিল, তাহার নাম সরমা, সরমা নারীকুলের চূড়া, সরমা সাধ্বী, পতিব্রতা। সরমা পতি-গৃহেই থাকেন,পতিরও তিনি আদরের আদরিণী। পতির নাম হরদয়াল। হরদয়াল বসন্তপুরের জমিদার। সহসা এক কাল মেঘ আসিয়া সরমার সুখসূর্য্য ঢাকিয়া ফেলিল। কুক্ষণে সরমা হরদয়ালকে কলিকাতায় যাইতে দিয়াছিল। হরদয়ালের সঙ্গে মেকিন্টস ও মেরী নামে এক ইংরাজ-দম্পতী আসিয়া রামদয়ালকে বশীভূত করিয়া বসন্তপুরে এক রেসমের কুঠি খুলিল। সাহেব দিনে দিনে গ্রামের পর গ্রাম অধিকার করিতে লাগিলেন; আর মেরী দিনে দিনে স্বয়ং হরদয়ালকে অধিকার করিয়া ফেলিল। হরদয়াল এখন অন্দরে যাওয়া একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছে, মেরী বৈঠকখানায় আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং সাহেবেরও দিন দিন অত্যাচার যার পর নাই বাড়িতেছে। একদিন সালসা গ্রামের অনেক গুলি প্রজা প্রবোধের নিকট গিয়া কাঁদিয়া জানাইল যে, মেকিন্টস তাহাদের ঘর জ্বালাইয়া দিয়াছে। শুনিয়া প্রবোধ সুরেন্দ্র-নাথের সহিত পরামর্শ করিয়া স্বয়ং হরদয়ালের নিকট গমন করিলেন। হরদয়াল তখন ইয়ারগণ লইয়া উন্মত্ত। প্রবোধ তাঁহাকে একটী কথা বলি-বেন কি, হরদয়াল তাঁহাকে সহস্র কড়া কথা শুনাইয়া দিল। ক্ষোভে রোষে ঘৃণায় প্রবোধ প্রত্যাগমন করিতেছিল, এমন সময়ে ভৃত্য রামদাস আসিয়া একবার অন্দরে যাইবার জন্য কাতরে অনুনয় করিল। প্রবোধ অতিকষ্টে অন্দরে গেলেন। গিয়া যাহা দেখিলেন,তাহা অবর্ণনীয়। অনেক বলিলেও সরমা যখন তাঁহার সহিত যাইতে চাহিল না, তখন দুই বিন্দু অশ্রু মোচন করিয়া প্রবোধ গৃহে ফিরিলেন। তারপর সরমা অনেক কাঁদিয়া অনেক ভাবিয়া এক উপায় ঠাহরাইল। সরমা মেরীকে একদিন ডাকিয়া পাঠাইল। মেরী আসিলে তাহার নিকট ভিক্ষা চাহিল—সে যেন তাহার স্বামীকে দিনান্তে একটীবারের জন্য তাহাকে দেখিতে দেয়। মেরী অঙ্গীকার করিল। মেরীর অনুনয়ে পরদিন হইতে সরমা দিনান্তে একবার করিয়া হরদয়ালের সাক্ষাৎ পাইতে লাগিল।

তা, যাহাই হউক, সাহেবের অত্যাচার ক্রমে বড়ই বাড়িতে লাগিল।

একদিন লাটিয়াল দিয়া বাহকদিগকে মারিয়া রূপপুরের মাঠ হইতে সাহেব একটি স্ত্রীলোক ধরিয়া লইয়া গেল। সে স্ত্রীলোক বিরাজমোহিনী। বিরাজ মাসির বাড়ী হইতে আসিতেছিল। এ সংবাদ প্রবোধ শুনিলেন। সুরেন্দ্রকে শুনাইলেন। উভয়ে মহাচিন্তিত হইলেন। সহসা পুলিসের লোক আসিয়া প্রবোধের বাড়ী ঘেরাও করিল। প্রবোধকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিসে চালান দিল। সুরেন্দ্র তাহা শুনিবামাত্র দ্রুতপদে থানায় গমন করিলেন। থানায় গিয়া অনেক কৌশলে দারোগা সাহেবের নিকট তিনি জানিলেন যে, আসামী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট চালান হইয়া গিয়াছে। কিন্তু গ্রেপ্তারি ওয়ারেণ্ট দেখিতে চাওয়ায় দারগা বলিল যে কোনরূপ ওয়ারেণ্ট তাহার নিকট আসে নাই, তবে ম্যাকিণ্টসের উপর খোদ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের লিখিত একখানি চিঠি প্রমাণে সব কাজ তামিল হইয়াছে। শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথ স্তম্ভিত হইলেন, সুকৌশলে সে পত্রখানি হস্তগত করিয়া তৎক্ষণাৎ খোদ ম্যাজিষ্ট্রেটের বাসায় গমন করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার প্রেরিত পত্রের কথা শুনিয়া ক্ষণেক হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। তৎক্ষণাৎ সুরেন্দ্রনাথের হস্তস্থিত পত্র কাড়িয়া লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু সে পত্র আসল নহে, নকল মাত্র। সাহেব তাহার যাথার্থ্য বুঝিয়া ভীত হইলেন। অতি অল্পক্ষণ পরে সুরেন্দ্রনাথ প্রবোধকে লইয়া বাটী ফিরিলেন। প্রবোধ ত নিষ্কৃতি পাইলেন, কিন্তু বিরাজের কি হইল? সহসা অন্ধ কারাগৃহে বিরাজ একদিন দেখিল, এক ভিখারিণী। ভিখারিণী অন্য কেহ নহে, কুসুম। কুসুম ভিখারিণী সাজিয়া সাহেবকে ভুলাইয়া বিরাজের উদ্ধারের জন্য এখানে আসিয়াছে। কুসুম বিরাজকে তাহার বেশে পলাইতে বলিল। বিরাজ তাহাকে রাখিয়া পলাইতে চাহিল না। অগত্যা কুসুম চলিয়া গিয়া সমস্ত সন্ধান প্রবোধকে জানাইল। সন্ধ্যার সময় দুর্দ্দান্ত নরপিশাচ মেকিণ্টস বিরাজের প্রতি বল প্রয়োগের উদ্যম করিতেছে, এমন সময়ে সুরেন্দ্রনাথ ও প্রবোধ পুলিস লইয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। বিরাজের উদ্ধার হইল। মেকিণ্টসের হাতে হাতকড়ি পরাইয়া পুলিসে লইয়া গেল। তার পর মোকদ্দমা উঠিল। মোকদ্দমার পূর্ব্বেই মেরী যাহা কিছু ছিল লইয়া পলায়ন করিল। মেকিণ্টস হরদয়ালকে আসামীর মধ্যে জড়াইতে চাহিলে কাজেই প্রাণভয়ে হরদয়াল মোকদ্দমার খরচ চালাইল শেষে আর কিছু নাই। খাজনা দেওয়া

হইল না। জমিদারী লাটে উঠিল। গোপনে সুরেন্দ্রনাথ তাহা কিনিয়া রাখিলেন। অল্প দিন পরে মেকিণ্টসের দ্বীপান্তর হুকুম হইল।

হরদয়ালের আর কিছু নাই, কিন্তু দেনা অনন্ত। পাওনাদারেরা চারি দিকে ওয়ারেণ্ট হস্তে ফিরিতে লাগিল। এক দিন ভয়ে আশঙ্কায় স্মৃতির বিষম দংশন জ্বালায় অধীর হইয়া—ততোধিক সুরার উন্মত্ততায় অস্থির হইয়া হরদয়াল ছাদের উপর উঠিল। কি ভাবিয়া আলিসায় দাঁড়াইল, তার পর একটা শব্দের সহিত ভূতলে পড়িয়া গেল। হরদয়াল মুমূর্ষু হইয়া পড়িল। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া একটীবারের জন্য আলস্য মাত্র ভুলিয়া গিয়া সেই সাধ্বী সতী সরমা স্বামীর শুশ্রূষা করিতে লাগিল। ক্রমে সাধ্বীর পুণ্যময় সেবায় হরদয়াল আরোগ্য হইয়া উঠিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ হরদয়ালের চক্ষুঃ দুটি একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। হরদয়ালের শিক্ষা হইল। বিধাতার শাস্তিপ্রসূত শিক্ষার গুণে হরদয়াল বুঝিল—মেরী কি আর সরমা কি, বুঝিল নরক কি আর স্বর্গ কি! হরদয়াল—অন্ধ হরদয়াল তখন সরমাময় হইয়া সরমার চক্ষে বিশ্বশোভা দর্শন করিতে লাগিল। সরমা আবার হাসিল, স্বামী সোহাগে সোহাগিনী হইয়া আবার পৃথিবী আনন্দময় দেখিতে লাগিল। সরমার এখন কেবল মর্ম্মান্তিক দুঃখ তাহার চক্ষুর সহিত তাহার প্রাণসর্ব্বস্বের চক্ষুর বিনিময় হইতে পারে না। সময় বুঝিয়া সুরেন্দ্রনাথ হরদয়ালের বিষয় হরদয়ালকে প্রত্যর্পণ করিলেন। কৃতজ্ঞতার অশ্রু মুছিতে মুছিতে প্রবোধ সুরেন্দ্রকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তার পর শুভদিন দেখিয়া বিরাজমোহিনীর সহিত প্রবোধের বিবাহ হইয়া গেল। সুরেন্দ্রনাথ তখন অবসর পাইয়া সংসার ত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। সকলেই অশ্রুপূর্ণলোচনে অনেক বাধা দিল, সুরেন্দ্র কিছুতে শুনিলেন না। সকলের কাছে বিদায় লইয়া বমা পাগলের সহিত অনির্দ্দিষ্ট প্রদেশে প্রস্থান করিলেন। এই নবীন শোক না নিভিতে নিভিতে সহসা একদিন কুসুমের কোন উদ্দেশ মিলিল না। অনেক স্থান অন্বেষণ করা হইল, কুসুম কোথাও নাই। কুসুম নাই, কিন্তু কুসুমের শয্যার উপর একখানি পত্র পড়িয়াছিল। কম্পিত হস্তে খুলিয়া প্রবোধ তাহা পাঠ করিলেন। প্রবোধ হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। কুসুম স্বহস্তে লিখিতেছে, "প্রবোধ তুমিই আমার প্রাণেশ্বর।" অতি কষ্টে প্রবোধ আরও অগ্রসর হইলেন। শেষ ছত্রে

দেখিলেন স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া লেখা রহিয়াছে, "আজ হইতে হতভাগিনী কুসুমের নাম পৃথিবী হইতে লোপ হইল। ইহাই আমার প্রণয় পরিণাম!"

এইখানেই গ্রন্থ শেষ। গল্প ভাগ যাহা বিবৃত করিলাম, তাহাতে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যোগেন্দ্র বাবু ইহাতে বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহার গল্পরচনাকৌশল দেখিয়া আমরা তাঁহাকে একাধিক বার প্রশংসা করিয়াছি। চোস্ত, পরিষ্কার, কোথাও গোলমাল নাই, কোথাও খট্‌কা ঠেকে না, শৃঙ্খলা বা ঘটনার সহিত ঘটনার সম্বন্ধ বুঝিবার জন্য কোথাও চুপ করিয়া একদণ্ডও ভাবিতে হয় না, অথচ মনোহর কৌতূহলোদ্দীপক এবং শিক্ষাময়। তবে, দুই একটা স্থানে আমাদের একটু বুঝিতে বাধ বাধ করিয়াছে। তা সে অতি সামান্য কথা। এখন অন্য কথা বলি।

(চরিত্র)

প্রণয় পরিণাম ক্ষুদ্র হইলেও তাহাতে অনেকগুলি চরিত্র আছে। তন্মধ্যে পুরুষ—সুরেন্দ্র প্রবোধ,হরদয়াল, মেকিণ্টস, রমা পাগ্‌লা, রামদাস গঙ্গারাম, ম্যাজিষ্ট্রেট ইত্যাদি; আর স্ত্রী—সরমা, কুসুম, বিরাজ ও মেরী প্রভৃতি। পুরুষ চরিত্রের মধ্যে আমাদের মতে সুরেন্দ্রনাথ প্রধান। সুরেন্দ্রের যেমন রূপ তেমনি গুণ যেমন শিক্ষা তেমনি সাহস, যেমন ধন তেমনি মন। গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থের প্রণয়পরিণাম নাম দিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় আপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সুরেন্দ্রের সেই অসামান্য নরদুর্ল্লভ মহোদার-চিত্ততা নিরাশ প্রণয়-জাত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু বলিতে কি, বাস্তবিক সুরেন্দ্রের ন্যায় লোককে কোন কারণের বশীভূত হইয়া কি কোন উপলক্ষ মাত্র আশ্রয় করিয়া এরূপ কার্য্য করিতে দেখিলে আমাদের কেমন কষ্ট হয়। বলিয়াছি, সুরেন্দ্র চরিত্র এ স্বার্থপর সংসারে অতি দুর্লভ, সুরেন্দ্রের কার্য্যকলাপ দেখিয়া আমরা উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে বার বার তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছি। কিন্তু সুরেন্দ্রকে আমরা জন্মিয়া পর্য্যন্ত সুরেন্দ্র দেখিতে পাইলেই যেন আরও আনন্দিত হইতাম। সেই দেবানুকরণীয় চরিত্র প্রণয়-মাত্রাত্মক না হইয়া সুরেন্দ্র-মাত্রাত্মক হইলে আমাদের সন্তোষের পরিসীমা থাকিত না।

তবে গ্রন্থকারের মুখ্য উদ্দেশ্য প্রণয়ের পরিণাম বর্ণনা করা, যে প্রণয়ের ক্ষুদ্র তটিনী আপন ঈপ্সিত আধারে মিশিবার জন্য ছুটিতেছিল, তাহা হঠাৎ প্রবল প্রতিবোধে কেমন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পার্শ্বস্থ সমস্ত ক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া আপন কার্য্য সমাধা করে, তাহারই একটী চিত্র অঙ্কিত করা—গ্রন্থকার যে উদ্দেশ্যে এই সুরেন্দ্র চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন তাহা সম্যক্ সিদ্ধ হইয়াছে। যে সুরেন্দ্র একদিন নিরাশার বিষম তাড়নায় অধীর হইয়া শ্মশানচারী হইতে গিয়াছিলেন, সেই সুরেন্দ্র আবার যখন নিঃস্বার্থভাবে প্রাণপাত করিয়া পরের কার্য্য সাধন করিয়া শেষে রিপুবিজয়ের জন্য সংসার ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন, তখনই আমরা গ্রন্থকারের কৃতকার্য্যতা বুঝিতে পারি। আর বুঝিতে পারি তখন যখন সহস্র কথায়ও সুরেন্দ্রকে অবিতথপ্রতিজ্ঞ দেখিয়া প্রবোধ বলিয়াছিলেন "কতদিন পরে তুমি পুনরায় গৃহে ফিরিবে ?" তাহাতে সুরেন্দ্রনাথ—বুঝিতে পারি না সুরেন্দ্র মানুষ কি দেবতা—সুরেন্দ্রনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "যে দিন ম্যাকিণ্টসকে আর তোমাকে এক চক্ষে দেখিতে পাইব।" সেই কথায় প্রবোধ বিস্মিত নেত্রে অনেকক্ষণ সুরেন্দ্রনাথের প্রতি চাহিয়াছিলেন; আমরাও ইহা পাঠ করিয়া বিস্ময় পরিপ্লুত হৃদয়ে বার বার সুরেন্দ্রকে দেবতা ভ্রমে নমস্কার না করিয়া থাকিতে পারি নাই। প্রণয় পরিণামে সুরেন্দ্রনাথ অতি অপূর্ব্ব চরিত্র।

সুরেন্দ্রের পর প্রবোধ। প্রবোধও শান্ত, শিক্ষিত, প্রশস্তচিত্ত এবং পরহিতৈষী। প্রবোধ শান্ত, কিন্তু প্রবোধ সুরেন্দ্রের ন্যায় কার্য্যকুশল নয়; প্রবোধ শিক্ষিত, কিন্তু প্রবোধ সুরেন্দ্রের ন্যায় সৎসাহসী নয়; প্রবোধ প্রশস্তচিত্ত, কিন্তু সুরেন্দ্রের ন্যায় প্রবোধের চিত্ত সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া পড়ে না; প্রবোধ পরহিতৈষী কিন্তু প্রবোধ পরের দুঃখে কাঁদিতে জানে, অর্থাদি দ্বারা উপকার করিতে জানে, সুরেন্দ্রের ন্যায় আত্মত্যাগ করিতে পারে না। সুরেন্দ্রে প্রবোধে প্রভেদ অনেকটা বুঝা যায়। সুরেন্দ্র স্বর্গের ভূষা; প্রবোধ পৃথিবীর আদর্শ! তার পর হরদয়াল। যক্ষস্বভাব ধনী কৃপণের দেহান্তে তাহার উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি যৌবনমত্ত সন্তানের যেরূপ দশা হওয়া সম্ভব তাহা হরদয়ালের সকলই হইয়াছিল। যে পাপিষ্ঠ সেই দেবীপ্রতিমা সরমা সুন্দরীকে তেমন করিয়া চরণে ঠেলিতে পারিয়াছিল, তাহার শাস্তি বুঝি

এ ব্রহ্মাণ্ডে নাই। হরদয়ালের শাস্তিও যথোচিত হইয়াছিল। কিন্তু, গ্রন্থকার সে চিত্রটী আরও একটু বর্দ্ধিত আকারে উজ্জ্বল অক্ষরে অঙ্কিত করিলে আমাদের মনের আপশোষ মিটিত। তাহার পাপের চিত্রগুলি যেমন দেখাইয়াছেন, তাহার প্রতিকারে চিত্র ঠিক তেমনি রঙে দেখান হয় নাই। হরদয়ালের নবজীবন অতি সুন্দর সামগ্রী, তাহা পড়িতে পড়িতে সতীর মহিমায় আমাদের চিত্ত ভরিয়া উঠে। হরদয়ালের পার্শ্বে আর একটা চিত্র গ্রন্থকার বড়ই নিপুণতার সহিত উজ্জ্বল করিয়া আঁকিয়াছেন। সে ম্যাকিণ্টস। ম্যাকিণ্টসের চিত্র এত সুন্দর, এত স্বাভাবিক ও এত পরিষ্কার যে আমরা যখনই তাহাকে দেখিয়াছি, তখনই গ্রন্থকারকে বাহবা না দিয়া থাকিতে পারি নাই। তার পর রমা পাগলের পাগলামি বা উচ্ছ্বাস, রামদাসের প্রভুভক্তি এবং গঙ্গারামের অসারত্ব ও মাজিষ্টেট সাহেবের সাহেবত্ব অতি সুন্দর করিয়া দেখান হইয়াছে। কিন্তু রমার চিত্রটি তত পরিস্ফুট হয় নাই। সকল সময়ে তাহার সকল কাজ গুলা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

এই পর্য্যন্ত পুরুষ চরিত্রের কথা, তার পর নারী চরিত্র। নারী চরিত্রের শীর্ষস্থানীয়া সরমা। সরমা এ পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবী হইতে অনেক উচ্চে। কত উচ্চে যাইলে সেরূপ চিত্র আমরা দেখিতে পাই তাহাও আমরা জানি না। স্বর্গেও বুঝি তেমন চরিত্র অতি বিরল। সাবিত্রী একদিন সতীত্ববলে যমের নিকট হইতে তাঁহার সত্যবানকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন, আর হরদয়াল—পাপের নিম্নতমকূপে নিমগ্ন পাষণ্ড হরদয়াল যে মরিতে মরিতেও বাঁচিয়া উঠিল—সে কি জন্য তাহা কি আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না? সে তো কেবল তোমারই জন্য, সরমা, কেবল তোমারই সতীত্ব-ফলে। শুভক্ষণে হরদয়াল তোমা হেন সতী রমণীর পতি হইয়াছিল, তাই সে দুষ্টদমন ভগবানের অমোঘ শাস্তি হইতে পরিত্রাণ পাইল।

সরমার কথা পড়িতে পড়িতে আমাদের ভ্রমরের কথা মনে আসে। উভয়েই বালিকা, উভয়েই স্বামীময় জীবিতা, উভয়েই রূপে গুণে ধনে উপযুক্ত স্বামীর স্ত্রী, উভয়েই প্রথম অবস্থায় পতির আদরে আদরিণী। তার পর অদৃষ্টের দোষে গোবিন্দ লাল ভ্রমরকে ভুলিয়া ভ্রমরের প্রাণময় ভালবাসা ভুলিয়া, রোহিণীর রূপে মজিয়া অধঃপতনে পতিত হইল; অদৃষ্টের দোষে হরদয়াল তেমনি সরমাকে ভুলিয়া, সরমার

অনন্ত প্রেম পায়ে ঠেলিয়া মেবীর রূপে মুগ্ধ হইয়া অধঃতপতনের নিম্ন কূপে নিমগ্ন হইল। এই পর্য্যন্ত উভয়েরই একই রকম অদৃষ্ট-ফল দেখিতে পাই। তার পর উভয়ে মর্ম্মে মর্ম্মে পুড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাতরে সজলনেত্রে যুক্ত-করে ভগবানের নিকট পতির সুমতির জন্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু যে মজিবে তাহাকে তখন রাখিবে কে? গোবিন্দলাল ও হরদয়াল শোধরাইল না। তখন হইতে ভ্রমর ও সরলার পার্থক্য আমরা বুঝিতে পারি। ভ্রমর রাগে দুঃখে রোহিণীকে সহস্র গালি দিল, নিকটে পাইলে ঝাঁটা পেটা করিতেও ক্রটী করিত না। কিন্তু সরলা ধীর ও শান্ত ভাবে সব কষ্ট সহিয়া মেরিকে ডাকাইয়া পাঠাইয়া একদিন কাতরে তাহার নিকট দিনান্তে বারেক স্বামীসন্দর্শন ভিক্ষা চাহিল। ভ্রমর চির অভিমানিনী, ভ্রমর গোবিন্দলালের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া অভিমানভরে পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। কিন্তু স্নেহময় ভ্রাতা প্রবোধ চন্দ্র চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে বার বার অনুরোধ করিলেও সরলা স্বামী ছাড়িয়া যাইতে চাহিল না। আমরা বলিতে চাহি না এই দুই জনের মধ্যে কে অধিক মহত্ব দেখাইতে পারিয়াছে—সে সমালোচনার স্থান এক্ষণে আমাদের নাই। তবে তাঁহাদের পরিণামের কথা—তাহা অবশ্য বলিব। সেই শিরীষকোমলহৃদয়া অফুটন্তকলিকা ভ্রমর—সেই যে, যে দিন বহু দিনের পর প্রত্যাগত স্বামীর পদযুগল মধ্যে মাথা লুটাইয়া নিঃশব্দে প্রাণ পরিত্যাগ করিল, আর তার পর গোবিন্দলাল—হতভাগ্য গোবিন্দলাল হাহাকার করিতে করিতে বারুণীর জলে ডুবিয়া হৃদয়ের দুর্দ্দান্ত জ্বালার চিরশান্তি করিল, সেই সব দৃশ্য ভুলিব না—ভুলিতে পারিব না। আর সরলা? সরলার কি হইল? হরদয়ালের পাপের পূর্ণমাত্রা যখন পূরিয়া আসিয়াছিল, তখন তাহার সেই যে দৈব প্রতিফল ফলিল, তাহা আমরা দেখিলাম, তার পর পতিসর্ব্বস্বা সরলা কেমন করিয়া সেই স্বামীর শুশ্রূষা করিল, তাহাও দেখিলাম, আর যাহা আমরা দেখিতে চাহিলাম তাহা হইল। সতীত্বের পুণ্যময় গুণে হরদয়ালের অন্ধ অবস্থায় নবজীবন লাভ ঘটিল। স্বর্গে সতীত্বের জয়দুন্দভি ঘোষিত হইল। এখন আমরা স্পষ্ট বলিতে পারি যদি ভ্রমর-লেখকের ভ্রমর চরিত্র অঙ্কিত করিবার উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সরলা লেখকেরও সরলাচিত্র অঙ্কিত করিবার উদ্দেশ্য অবশ্য সাধিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য উভয়েরই প্রায় এক। এক জন দেখাইলেন—সতী

নারীর অবমাননার প্রতিফল, আর একজন দেখাইলেন সতীত্বের অনন্ত জয়। তাই এক রকমে আরম্ভ করিযাও দুই ভিন্ন উদ্দেশ্যের জন্য দুই জনে মাঝখান হইতে দুই ভিন্ন পথবর্ত্তী হইয়াছিলেন্। যোগেন্দ্র বাবু যদি বঙ্কিম বাবুর ন্যায় সমদরের লেখক হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আজ ভ্রমরের ন্যায় সরমার নাম সকলের মুখে মুখে শুনিতে পাইতাম।

সরমার পর কুসুম। কুসুম উন্নত হৃদয়া, কুসুম সাহসিনী, কুসুম প্রেমময়ী। কুসুমের এত গুণ ও সেই অসামান্য রূপ থাকিলেও বিধাতা তাহার অদৃষ্টে সুখ লেখেন নাই। কিন্তু সুখ না লিখিলেও বিধাতা তাহাকে দুঃখ সহনের ক্ষমতা অনেক দিয়াছিলেন। রমণী সহিষ্ণুতার জন্য চির বিখ্যাত বিধাতার সৃষ্টির এ রহস্য চিরপ্রচলিত। কিন্তু তাহা হইলেও সহিষ্ণুতার সীমা আছে। কুসুম সেই সহিষ্ণুতার গুণে রমণীর যাহা অসাধ্য তাহা করিয়াছিল, আপনার হৃদয়ের সমস্ত আগুন চাপিয়া রাখিয়া পরের সুখের জন্য আপনার জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছিল। সেই বালিকা জাগ্রতে নিদ্রায় স্বপনে অহর্নিশি এত করিয়া যাহার জন্য প্রেমের মালা গাঁথিল, সে অতি অনাদরেও একটীবারের জন্য তাহার প্রতি ফিরিয়া চাহিল না। হায় হায়, সে এত বুঝিয়াও একটা মোটা কথা বুঝিতে পারিল না— অভাগিনী দিনে দিনে নিশ্বাসে নিশ্বাসে কেন এত শুকাইয়া যাইতেছে। ভালবাসার—সেই সেই-মাত্র-সার ভালবাসার এ বিড়ম্বনা কি নারীহৃদয়ে সহিতে পারে? সহিতে না পারিলেও কুসুম তাহা শান্ত ভাবে সহিয়াছিল। আপনার প্রেম, আপনার সুখ, আপনার জীবন সমস্ত জন্মশোধ বিসর্জ্জন দিয়া সেই বালিকা তাহার প্রাণকান্তের সুখের জন্য যত্নবতী হইল। কিন্তু সে সুখের এক মাত্র আকর বিরাজ। বিরাজ ভিন্ন প্রবোধের সুখ নাই। বালিকা তাহা বুঝিয়া এক হস্তে হৃদ্‌পিণ্ড উপাড়িত করিয়া আর এক হস্তে উৎসারণোন্মুখ অশ্রুর প্রবল প্রস্রবণ নিবারিত করিতে করিতে প্রতিযোগিনীর মঙ্গল কামনায় ব্রতী হইল। সেই ব্রত সাধনে কুসুম কতদূর হৃদয়ের বল, রমণী দুর্লভ অসীম সাহস, সুকৌশল ও কৃতকার্য্যতা দেখাইতে পারিয়াছিল, তাহা আমরা বিবৃত করিয়াছি। ম্যাকিণ্টস যে নরপিশাচ কুসুম তাহা জানিত, সেই নরপিশাচের হাতে অসহায়া বালিকার কত বিপদের আশঙ্কা কুসুম তাহাও বুঝে, আর সেই পাপের সহায় গঙ্গারামের ভাবভঙ্গি ও অভিপ্রায় কি ভয়ঙ্কর তাহাও

কুসুমের কিছুই বুঝিতে বাকি ছিল না, কিন্তু তবু সে বালিকা ক্ষণমাত্র জন্য আপনার সংকল্প হইতে বিচলিত হইল না। পরের জন্য—সে পর কে?—প্রতিযোগিনীর উদ্ধারের জন্য কুসুম সমস্ত বিপদ তুচ্ছ করিয়া ফিরিঙ্গির কারাগারে প্রবেশ করিল। তার পর বিরাজকে উদ্ধার করিয়া যথাসময়ে বিরাজের হাতে তাহার সেই ইহজীবনের সার সর্ব্বস্ব প্রবোধচন্দ্রকে সমর্পণ করিয়া নিঃশব্দে চিরজীবনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিল। সেই অনাথিনীর নাম এ ধরাধাম হইতে লুপ্ত হইয়া গেল। শেষ দৃশ্য দেখিয়া কেহ কুসুমের দোষ দিও না। রমণীর সহিষ্ণুতা চির-অক্ষুণ্ণ হইলেও সহিষ্ণুতার সীমা আছে। তবে বলিবে সুরেন্দ্রও তো নিরাশ প্রণয়ী। কিন্তু সুরেন্দ্র পুরুষ, আর কুসুম রমণী। পুরুষের যেমন অনন্ত প্রণয় আছে, তেমনি পুরুষের অনন্ত কাজও আছে; কিন্তু রমণীর জীবন যেমন প্রণয় মাত্রাত্মক, তেমন সে জীবনের কাজ নাই—কাজের ক্ষেত্র নাই। তাই গ্রন্থকার দেখাইলেন, সুরেন্দ্রনাথ অর্থাৎ পুরুষ একমাত্র আধারীভূত প্রণয়ে বাধা পাইলে বিশ্বপ্রেমিক হইয়া জগতের কল্যাণতরে কার্য্যমগ্ন হইতে পারেন; আর কুসুম অর্থাৎ রমণী প্রেমে নিরাশ হইয়া যাহা পুরুষেরও অসাধ্য তাহা সহিতে ও করিতে পারে, কিন্তু শেষে প্রেমের প্রেতপুত্তলীর সহিত সহমৃতা না হইয়া থাকিতে পারে না। গ্রন্থকার এই দুটী সুন্দর কথা দুটী চিত্রে সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন।

তার পর বিরাজ। বিরাজ পাতা ঢাকা যুঁই। কুসুম ফুটন্ত মল্লিকা, তাহার গন্ধে চারিদিক্ যেমন আমোদিত হয়, তেমনি দূরস্থ দর্শকেরও নয়নপথ-বর্ত্তিনী হইয়া মুগ্ধ করিয়া ফেলে। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র যুঁই আপনার ক্ষুদ্র দেহ পাতায় ঢাকিয়া আপনার গন্ধে আপনি বিভোর হইয়া বাগানের একধার আলো করিয়া থাকে। পথিক নিকটবর্ত্তী না হইলে তাহা সহসা লক্ষীভূত হয় না, কিন্তু যে একবার নিকটে গিয়া তাহাকে দেখিতে পায়, সেই তাহার কোমল লজ্জাবনত ভাব ও মিষ্ট গন্ধে প্রমুগ্ধ হইয়া উঠে। যুঁই বড় বড় ফুলের ন্যায় বাহার দিতে জানে না, তাহার নাম ডাকও তত নাই, কিন্তু তাহার গন্ধ অতি মিষ্ট, অতি প্রাণমনবিমোহনকারী। সেই ক্ষুদ্র পুষ্প আপনার জীবনের ক্ষুদ্র কাজ করিতে জানে, তা ছাড়া বড় কাজ তাহার স্বভাবানুগত নহে। বড় কাজ তাহার কাছে প্রত্যাশা করাও বুঝি ভুল। এই রকম আর একটি ফুল দেখিয়াছি, আমরা তিলোত্তমাতে, তিলোত্তমা

নায়িকা। তিলোত্তমাই, দুর্গেশনন্দিনী। কিন্তু তিলোত্তমার কাজ আমরা দুই একটা ব্যতীত বেশি দেখি না। কাজ নাই, কিন্তু সেই অস্পষ্টসুন্দর ছবি আমরা ভুলিতে পারি না। বিবাজ সম্বন্ধেও আমরা কতকটা সেই কথাই বলিতে পারি। বিবাজকে আমরা সর্ব্বদা দেখিতে না পাইলেও বিবাজের কথা আমাদের মনে থাকে। তবে যে রঙে গ্রন্থকার বিবাজচিত্র আঁকিয়াছেন, তাহার আর একটু পোঁছ দিলে ভাল হইত। রঙটা একটু বেশি ফিকে ফিকে বলিয়া বোধ হয়।

প্রণয়-পরিণামে আরও একটী রমণী চিত্র আছে, তাহা মেরী। মেরী ইংরাজরমণী। ইংরাজরমণীর কত ফন্দি, কত ছলা, কত উন্নতি-পরায়ণতা তাহা তুমি আমি নির্ব্বোধ অসভ্য বাঙ্গালি কি বুঝিয়া উঠিব? হরদয়াল দোষী স্বীকার করি, কিন্তু হরদয়াল দুদিন মাত্র কলিকাতায় গিয়া, দুদিন মাত্র ব্যবহার করিয়া সে ধাতু কেমন করিয়া বুঝিবে? সেই নির্ব্বুদ্ধিতার পরিণাম যাহা হইতে হয় তাহা হরদয়ালের হইয়াছিল। গ্রন্থকার মেরীর চিত্র যাহা আঁকিয়াছেন, তাহা অতি উচ্চদরের। তাহা নিখুঁত ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়াছে। গ্রন্থকার নবীন লেখক হইলেও তাহার মেকিণ্টস ও মেরীতে তিনি ওস্তাদী হাত দেখাইতে পারিয়াছেন।

দেখাইলাম, গ্রন্থকার গল্প রচনায় যেমন কৃতকার্য্য হইয়াছেন, চরিত্র অঙ্কণেও তদপেক্ষা কম ক্ষমতা দেখান নাই। এক্ষণে আর এক বিষয়, ভাষা ও ভঙ্গী—তাহা বলিতেছি।

(ভাষা)

ভাষা সাধারণতঃ উপন্যাসের উপযোগী বটে কিন্তু ভাষায় গ্রন্থকারের যথোপযুক্ত দখল দেখা যায় না। ভাষার যে এক আকর্ষণী শক্তি প্রণয় পরিণামে নাই। গল্প রচনার গুণে চরিত্র আঁকিবার কৌশলে আমরা ভয় বিস্ময় করুণায় অনেকস্থলে অভিভূত হইয়াছি বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাষার তেমনি গাঁথনি থাকিলে যেমন সে ঘটনাগুলা আরও কার্য্য কথিত, তাহা হয় নাই। প্রকৃতি বর্ণনা অতি অল্পই আছে, যাহা আছে তাহাতেও নূতনত্ব বড় একটা দেখা যায় না। ইহা লেখকের দোষ। অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি দুইজনে এক সঙ্গে কাজ করিলে যতটা

ধন হয়, একের কার্য্যে কখনই ততটা হইতে পারে না। যিনি কখন ভাল লেখক বলিয়া সমাদৃত হইয়াছেন, তাঁহার এই একটী প্রধানতম গুণ যে তিনি অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি বেশ মিস্ খাওয়াইতে পারেন এবং পাঠকের মনে তাহাদের যুগপৎ কার্য্য করাইতে কৃতকার্য্য হন। এ বিষয়টি কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যোগেন্দ্র বাবু একটু চেষ্টা করিলেই সহজে আয়ত্ত করিতে পারিবেন। তাঁহার ভঙ্গী বেশ আছে। উপন্যাস লিখিতে হইলে যে ভঙ্গীতে লেখা আবশ্যক তাহা তিনি বেশ জানেন। গল্প, চরিত্র, ভঙ্গী আর আর সব বিষয়েই যোগেন্দ্র বাবুর ক্ষমতা বিলক্ষণ আছে, তাঁহার কেবল খুঁত ভাষা। উপন্যাসে ভাষার জম্ জমাট বড়ই দরকার। এই বিষয়ে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় কৃতকার্য্য হইতে পারিলে যোগেন্দ্র বাবুকে আজ আমরা নিশ্চয়ই প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসলেখক বলিতে পারিতাম। প্রণয়পরিণাম বাঙ্গালার একখানি অতি উৎকৃষ্ট উপন্যাস। এরূপ উপন্যাসের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে দেখিলে আমার বাস্তবিক্ আর বাঙ্গালা উপন্যাসের প্রতি হতশ্রদ্ধ না হইয়া তাহার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করিতে থাকিব। প্রার্থনা করি, যোগেন্দ্র বাবু দীর্ঘজীবী হউন, এবং এরূপ উৎকৃষ্ট উপন্যাস রচনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব বর্দ্ধন করুন। প্রণয়-পরিণামের লেখকের নিকট আমরা উপন্যাস সম্বন্ধে অনেক আশা করি।

আয়ুর্ব্বেদ।

আয়ুর্ব্বেদ কাহাকে বলে, কিছু কাল পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় লোকে, এমন কি আয়ুর্ব্বেদব্যবসায়ী অনেক কবিরাজেও তাহা জানিতেন না। মাধব করের 'নিদান" পুস্তকের নামই যে আয়ুর্ব্বেদ ইহাই অনেকের সংস্কার ছিল। অনেক কবিরাজের মুখেও শুনা গিয়াছে যে তিনি নিদান মতে চিকিৎসা করেন। কিন্তু ফলতঃ নিদান রোগ-নির্ণয়ের সংগ্রহ গ্রন্থ, উহাতে চিকিৎসার নাম প্রসঙ্গও নাই। অথচ অধিকাংশ লোকে নিদান শব্দে আয়ুর্ব্বেদ বুঝিয়া থাকে, ইহার তাৎপর্য্য কি? বিবিধ কারণে দীর্ঘকাল ধরিয়া এতদ্দেশে আয়ুর্ব্বেদ

সংক্রান্ত প্রধান প্রধান পুস্তক সকলের এবং আয়ুর্ব্বেদ চর্চ্চার অভাবই ঐরূপ সংস্কারের কারণ বলিয়া বোধ হয়।

প্রকৃত পক্ষে আয়ুর্ব্বেদ অতি প্রামাণিক বেদ শাস্ত্র। উহা অথর্ব্ব বেদের অঙ্গ বিশেষ, এক লক্ষ শ্লোকে এবং এক সহস্র অধ্যায়ে রচিত।

যেমন প্রধানতঃ ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদকে অবলম্বন করিয়া মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা প্রভৃতি প্রধান প্রধান ২০টী ধর্ম্মসংহিতা বা স্মৃতিশাস্ত্র † রচিত হইয়াছে, সেইরূপ আয়ুর্ব্বেদকে অবলম্বন করিয়া সুশ্রুত সংহিতা চরক সংহিতা প্রভৃতি ১৮টী ‡ আয়ুর্ব্বেদ সংহিতা রচিত হইয়াছে। সময় বিশেষে ধর্ম্ম সংহিতা সকল অবলম্বন পূর্ব্বক যেমন শূলপাণি সংগ্রহ, রঘুনন্দন সংগ্রহ প্রভৃতি বহুতর স্মৃতিসংগ্রহ প্রস্তুত হয়, সেইরূপ আয়ুর্ব্বেদীয় সুশ্রুত সংহিতা প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া বাভট সংগ্রহ শার্ঙ্গধর সংগ্রহ, সিদ্ধযোগ, আয়ুর্ব্বেদসার প্রভৃতি বহুতর বৈদ্যক সংগ্রহ প্রস্তুত হয়। ক্রমশঃ আরও সংক্ষেপ করিবার নিমিত্ত আয়ুর্ব্বেদীয় সংগ্রহ গ্রন্থ সকলও দুই একটী সংহিতা অবলম্বন করিয়া ক্ষুদ্রতর সংগ্রহ প্রস্তুত হইয়াছে। যথা—মাধবীয় নিদান, চক্রদত্ত সংগ্রহ, সারকৌমুদী, দ্রব্যগুণ, পরিভাষা ইত্যাদি।

পরমজ্ঞানী মহর্ষিগণ আয়ুর্ব্বেদীয় সংহিতা সকলে রোগের ও আরোগ্যের স্বরূপ, চিকিৎসা ও ঔষধের লক্ষণ এবং প্রকার ভেদ, তাহাদিগের শ্রেণী-বিভাগ ও সংখ্যা, রোগনির্ণয় এবং চিকিৎসার সূত্র ও বিবৃতি, সাধ্যতা ও অসাধ্যতার চিহ্ন, মনুষ্য শরীরের অস্থি, মাংস, শিরা, স্নায়ু প্রভৃতির সংখ্যা ও উপযোগিতা, রক্ত সঞ্চালনের বিবরণ, আহারীয় দ্রব্যের পরিপাক ও পরিণতির নিয়ম, শবদেহবিচ্ছেদ করিয়া তাহাতে আমাশয় যন্ত্র, পক্বাশয় যন্ত্র, হৃদয় ও ফুস্ ফুস্ প্রভৃতি দেখাইবার ব্যবস্থা ইত্যাদি সহস্র সহস্র বিষয়

---

* ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদো নাম যদুপাঙ্গমথর্ব্ববেদস্য * * * শ্লোক শত সহস্রম্ অধ্যায় সহস্রঞ্চ কৃতবান্ স্বয়ম্ভূঃ। (সুশ্রুতসংহিতা)

† মন্বত্রিবিষ্ণুহারিতা যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ। যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়ন-বৃহস্পতী॥ পরাশর ব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষ গোতমৌ। শতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজকাঃ॥

‡ ঔপধেশ্ব, বৈতরণ, ঔরভ্র, পৌষ্কলাবত, করবীর্য্য গোপুর, রাক্ষিত, সুশ্রুত অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, হারীত, ক্ষারপাণি, নিমি, কাঙ্কায়ণ, গার্গ্য ও গালব এই ১৮ জন ঋষির প্রণীত ১৮টী সংহিতা গ্রন্থ। (সুশ্রুত, সূত্র, ১ম অ)

অতি সংক্ষিপ্তাকারে এমন পূর্ণভাবে কহিয়াছেন যে, চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও তাহাকে মনুষ্যের কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না।

ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিগণ সাধারণ মনুষ্য নামে পরিগণিত হইবার নহেন। আধুনিক মনোমোহন বিজ্ঞানশাস্ত্র লক্ষাধিক বর্ষ পরিচালিত হইলেও আয়ুর্ব্বেদের ন্যায় প্রাণিশরীরের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল অভ্রান্তরূপে নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবে কি না সন্দেহস্থল। হিমালয়ের উন্নত শিখরস্থিত সোমলতার রস, মহাসাগর কুক্ষিগত মুক্তার গুণ, মনুষ্য কপালাস্থির চূর্ণ, হীরকভস্মের উপযোগিতা, এবং বিকট কালকূটের রোগঘ্ন ক্ষমতা এ সমস্তের কিছুই আয়ুর্ব্বেদের নিকট গুরুতর নহে।

আধুনিক কিমিয় বিদ্যার (কেমিষ্ট্রী) গৌরবস্থল, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি অপেক্ষা সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম্ এবং মনুষ্য জঠরস্থিত পাচকাগ্নির স্বরূপ নির্ণয় আয়ুর্ব্বেদের পক্ষে অতি সহজ কথা।

পরম কল্যাণকর আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র পৃথিবীস্থ যাবতীয় মনুষ্যের নিমিত্ত রচিত হইলেও ইহা যে ভারতবর্ষীয় ব্যক্তিদিগের জীবনরক্ষার অদ্বিতীয় উপায়, তাহা পণ্ডিত মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, ভূগোল শাস্ত্র ও ইতিহাস শাস্ত্রের আমূল অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, ভারতবর্ষই পৃথিবীর আদিম ভূভাগ, ভারতবর্ষীয় মনুষ্যদিগেরই বংশ পরম্পরা কালক্রমে সমস্ত পৃথিবীতে উপনিবেশ করিয়াছে। সুতরাং অনির্দ্দেশ্য পূর্ব্বকালজাত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মুখ্যকল্পে ভারতবর্ষীয় ব্যক্তিগণের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াই যে ভারতবর্ষীয় দ্রব্য সকলের গুণাগুণ ও উপযোগিতা নির্ণীত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ হইতে পারে না। অতএব, প্রতিপন্ন হইতেছে যে ভারতবর্ষীয় ব্যক্তিদিগের সুস্থতা রক্ষা এবং রোগের শান্তি বিষয়ে আয়ুর্ব্বেদ যেমন উপকারী পৃথিবীর আর কোনও চিকিৎসাশাস্ত্রই সেরূপ হইতে পারে না।

কালচক্রের পরিবর্ত্তনক্রমে এতাদৃশ মহান্ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রও দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে। ইতিহাসবেত্তারা অনুমান করেন যে, প্রায় সাত শত *

---

* ১২০৩ খৃঃ অব্দে, "বক্তিয়ার খিলিজি" বঙ্গ প্রদেশ অধিকার পূর্ব্বক এখানে নবাবী করিতে আরম্ভ করে। তদবধি এতদঞ্চলে মুসলমানদিগের জাতীয় হেকিমী চিকিৎসার প্রাদুর্ভাব হয়। তৎকালেই আর্য্যজাতির বিজ্ঞান-প্রধান আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সকল ভস্মীকৃত ও বিলোপিত হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব।

বৎসর হইল, হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী যবন জাতির অত্যাচারে বঙ্গ প্রদেশে আয়ুর্ব্বেদীয় সুশ্রুতসংহিতা ও চরক সংহিতা প্রভৃতি মূলগ্রন্থ সকল বিলুপ্ত হয়, তার পর পুস্তকের অভাবে আয়ুর্ব্বেদের প্রধান প্রধান সংহিতা ও সংগ্রহ পুস্তক সকলের অধ্যয়ন অধ্যাপনাও কাজেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। ক্রমে মাধব কর ও চক্রপাণি দত্ত প্রভৃতির সংগৃহীত "নিদান" প্রভৃতি ক্ষুদ্রতর সংগ্রহ গুলিই এতদ্দেশে বৈদ্যদিগের আয়ুর্ব্বেদ বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকে। আয়ুর্ব্বেদ যে অতি বৃহৎ ও শারীরতত্ত্ব বিজ্ঞান শাস্ত্র, জন সাধারণের অধিকাংশই তাহা জানিতে পারেন নাই। সমাজের প্রকৃতি ও রুচি অনুসারেই দেশে বিদ্যাবিশেষের প্রাদুর্ভাব বা তিরোভাব হইয়া থাকে। যখন সমাজের অধিকাংশ লোকের এরূপ সংস্কার হইয়া গেল যে, আয়ুর্ব্বেদ গুরুতর শাস্ত্র নহে, তখন সেই শাস্ত্রপাঠ ও তদ্ব্যবসায়ী ব্যক্তিদিগের সম্মান ও অর্থোপার্জ্জনের হীনতা হইতে লাগিল। এদিকে দেবভাষা বলিয়া সংস্কৃত ভাষার আদর বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। বিশেষতঃ ব্যাকরণ, সাহিত্য ও ন্যায় শাস্ত্রের সমাদর হিন্দু সমাজে দীর্ঘকাল ধরিয়া সমভাবেই আছে। ইহা দেখিয়া অপেক্ষাকৃত সুবোধ কবিরাজেরা আয়ুর্ব্বেদের মধ্যে কেবল "মাধব নিদানের" কিয়দংশ মূল এবং নৈয়ায়িক বিজয়রক্ষিতের রচিত "ব্যাখ্যা মধুকোষ" টীকার পঞ্চ নিদানের অংশ কণ্ঠস্থ ও ন্যায়শাস্ত্রের ২। ৪ পাতা ও নৈষধ প্রভৃতি কাব্যের কিয়ৎ কিয়ৎ অংশ অধ্যয়ন করিয়া সমাজে মহোপাধ্যায় কবিরাজ বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিলেন। প্রকৃত আয়ুর্ব্বেদের সুগভীর তত্ত্ব সকল মূল পুস্তকের সহিত লুক্কায়িত হইয়া গেল।

প্রায় একশতবৎসর হইল * এতদ্দেশে ইয়ুরোপীয় এলোপ্যাথী (ডাক্তারি) চিকিৎসার প্রচার হয়। এতদ্দেশে দীর্ঘকাল আয়ুর্ব্বেদীয় অস্ত্র চিকিৎসা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, এবং বিষঘটিত অতি তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধ সকলের ব্যবস্থাও বিবিধ কারণে স্থগিত ছিল। সুতরাং বিদ্যমান সময়ে প্রভাবতী ইয়ুরোপীয়

---

* ১৬৫০ খৃ, ডাক্তার বৌটন্ দিল্লীপতি সাহাজান বাদসার কন্যার চিকিৎসা করেন। তদবধি ডাক্তারি চিকিৎসা প্রচলিত নহে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে, বিদ্যমান মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়, ইহার কিছু পূর্ব্বাবধিই ডাক্তারি চিকিৎসার প্রচলন গণ্য করা উচিত।

শাস্ত্রচিকিৎসা এবং কুইনাইন প্রভৃতি দ্বারা আশুফলদায়িনী জ্বরচিকিৎসা এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগকে বিমোহিত করিয়া তুলিল। তখন এতদ্দেশের জঘন্যাবস্থাপন্ন হাতুড়িয়া কবিরাজদিগের চিকিৎসা একেবারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা প্রণালীর চরম দুরবস্থা উপস্থিত করে। কেবল মধ্যে মধ্যে দুই একটি অপেক্ষাকৃত যোগ্য বৈদ্যচিকিৎসক জনসাধারণের অজ্ঞানতা ও অনাস্থারূপ ঘোরতর অন্ধকারের মধ্যেও হীরক সদৃশ আয়ুর্ব্বেদের স্বতঃসিদ্ধ প্রভাব দুই একটী শিখা প্রদর্শন করিতে থাকেন।

যে পদার্থে যে শক্তি তাহা সেই পদার্থেই বিদ্যমান থাকিবে। দেশ, কাল, পাত্র ও দ্রব্যগত পরিমাণাদি ভেদে সেই পদার্থ দ্বারা যে কার্য্য সাধিত হওয়া সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রেত তাহা সেইরূপই হইবে। এ নিয়মের ব্যত্যয় হইবার নহে। মানবগণ জ্ঞানচর্চ্চার দ্বারা সেই বিষয় অবগত হউন অথবা না হউন, ঐশ্বরিক ঘটনার অন্যথাচরণ হইবে না। অজ্ঞান শিশু অগ্নির দাহিকাশক্তি অবগত নহে বলিয়া অগ্নি তাহার হস্ত দাহ করিতে ক্ষান্ত হয় না। অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষীয় জ্যোতির্ব্বেত্তারা এবং নব্যকালে যুরোপীয় পণ্ডিত নিউটন্ আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়াই যে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষিণী শক্তি বৃক্ষ হইতে বিশ্লিষ্ট ফলকে পৃথিবী পৃষ্ঠে পাতিত করিতেছে এরূপ নহে। প্রত্যক্ষ, অনুমান, যুক্তি ও শাস্ত্র দ্বারা যখন প্রতিপাদিত হইতেছে যে, শীতপ্রধান দেশে উৎপন্ন ঔষধ দ্রব্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সর্ব্বদা হিতকর হইতে পারে না, এবং এই নিমিত্তই ত্রিকালদর্শী জগদীশ্বর ভিন্ন ভিন্ন দেশস্থ প্রাণীর শরীর রক্ষার্থ রোগনাশক দ্রব্য সমূহ তত্তৎ দেশেই উৎপন্ন হইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তখন দক্ষিণ আমেরিকায় উৎপন্ন কুইনাইন বঙ্গদেশীয় লোকের শরীরে প্রযুক্ত হইয়া সর্ব্বদা হিতকর হইবার সম্ভাবনা কি? ঐশ্বরিক নিয়মের অভ্রান্ততা দেখাইবার নিমিত্ত, ক্রমশঃ এতদ্দেশে বিদেশীয় চিকিৎসার বিষময় পরিণাম স্বরূপ যখন লোকের নানাবিধ রোগের উৎপত্তি এবং একবিধ রোগের পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব প্রত্যক্ষীভূত হইতে লাগিল, তখন দেশীয় লোকদিগের চৈতন্য জন্মিল। কাজেই চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ, তখন পুনরায় এতদ্দেশীয় ব্যক্তি সমূহের পরম হিতকারক এবং হিতসাধনোপযোগী আয়ুর্ব্বেদীয় দিকে কটাক্ষপাত করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপেই ঘটনাপ্রযুক্ত ১৪।১৫ বৎসরের অধিক কাল এতদঞ্চলে মৃতপ্রায় মুমূর্ষু

আয়ুর্ব্বেদের পুনশ্চর্চ্চারম্ভ এবং ক্রমে ক্রমে উন্নতি সাধনের লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে।

১। আয়ুর্ব্বেদসংক্রান্ত সুশ্রুত ও চরক এই দুইটি মূলসংহিতা, অষ্টাঙ্গহৃদয় নামক অতি প্রামাণিক আদিম সংগ্রহ এবং ভাবপ্রকাশ, চক্রদত্ত সংগ্রহ, শার্ঙ্গধর, মাধবনিদান, ভৈষজ্যরত্নাবলী, প্রভৃতি কতকগুলি পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে ও হইতেছে।

২। সাধারণের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত বঙ্গভাষায় কয়েক ব্যক্তি অতি দুরূহ সংস্কৃত ভাষা হইতে আয়ুর্ব্বেদের অনুবাদ করিয়া প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন।

৩। কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আয়ুর্ব্বেদের অবনতির সময়ে প্রায়ই নিরুপায় ও নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণ ঐ শাস্ত্রের কিঞ্চিন্মাত্র শিক্ষা ও ব্যবসায় করিতেন, এক্ষণে অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাবান্ ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এমন কি দুই একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান ও বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞ এবং স্কুল কলেজের সুশিক্ষিত ব্যক্তিও আয়ুর্ব্বেদের যথারীতি অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদি করিতেছেন।

৪। সুযোগ্য ব্যক্তিদিগের যত্ন, চেষ্টা ও ব্যয়ে এক্ষণে অনেক স্থলে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ সকল যথারীতি প্রস্তুত ও অনেক অব্যবহৃত ঔষধের গুণবত্তার আবিষ্কার হইতেছে।

৫। এক্ষণে অনেক স্থলে, ডাক্তার, হোমিওপ্যাথি ও হেকিমদিগের চিকিৎসায় যে রোগের শান্তি হয় নাই, সুযোগ্য বৈদ্যের চিকিৎসায় তাহার সম্পূর্ণ শান্তি হওয়া দৃষ্ট হইতেছে।

৬। সুযোগ্য ব্যক্তিগণ আয়ুর্ব্বেদ অবলম্বন করায় তাঁহাদিগের মহামূল্য চিন্তার ফলে এক্ষণে দেশ কাল, পাত্রের উপযোগী করিয়া সংস্কৃত ভাষায় নূতন সংগ্রহ গ্রন্থ ও নূতন রচিত সংস্কৃত টীকা প্রস্তুত হইতেছে।

কিন্তু পৃথিবীতে চিরকালই সুখের সঙ্গে দুঃখ, মঙ্গলের সহিত অমঙ্গল, সুবিধার পশ্চাৎ অসুবিধা ধাবমান হইতেছে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র ও তৎসংক্রান্ত চিকিৎসার উন্নতির লক্ষণ দেখিবামাত্র সত্বরেই উন্নতির বাধাজনক অমঙ্গল ও অসুবিধার ছায়া দেখা দিয়াছে। যথা—

১। বিদ্যমান সময়ে এতদ্দেশীয় বহুতর ব্যক্তি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের মূলসংহিতা ও সংগ্রহ পুস্তক সকলের বিবরণ জানিতে কৌতূহলী হইয়াছেন,

এই সুযোগ দেখিয়া কতকগুলি অল্প শিক্ষিত ব্যক্তি দশ টাকা উপার্জ্জন করিবার কল্পনায় প্রকৃত আয়ুর্ব্বেদের ভাববিরুদ্ধ, তাৎপর্য্য বিরুদ্ধ এবং অতি অশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় ও ভাষান্তরে ইহার অনুবাদ প্রচার করিয়া সাধারণের ইষ্টাপেক্ষা অনিষ্টের ভাগ অধিক করিতেছেন, এবং অধিকাংশ অনুবাদের প্রতি সুযোগ্য লোকদিগের অশ্রদ্ধা উপস্থিত হওয়াতে প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তিদের চিন্তাসম্ভূত সুন্দর অনুবাদেরও গুণ বিচার হইতেছে না।

২। রাজধানী কলিকাতা আড়ম্বরপ্রিয় স্থান; এই ভাবিয়া অশিক্ষিত ইতর লোকেরাও কিছু মূলধনের জোরে বৃহৎ অট্টালিকা ভাড়া লইয়া, গাড়ী জুড়ী, প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড এবং সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের ঘটা দেখাইয়া কবিরাজ হইয়া বসিতেছে। সুতরাং শিক্ষিত অশিক্ষিত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক বাছিয়া লওয়া ভার হইতেছে।

৩। ইংরেজী প্যাটেণ্ট মেডিসিনের অনুকরণ করিতে গিয়া কতকগুলি সামান্য লোকে আয়ুর্ব্বেদীয় যে সকল ঔষধ অধিককাল স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা নাই (যথা অনন্তমূল প্রভৃতির কাথ) তাহাতে স্পিরিট প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া ডাক্তারি আরকের ন্যায় বোতল বিক্রয় পূর্ব্বক প্রকৃত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার কলঙ্ক করিতেছে।

আমাদিগের পরম হিতকর ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসার এই অন্তরায় নিবারণের উপায় কি, ইহা এক্ষণে সর্ব্ব সাধারণের বিবেচ্য হইয়াছে। নানা লোকে নানা উপায়ের কথা বলিবেন বা বলিতেছেন, কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় সাধারণের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদীয় পুস্তক, ঔষধ ও চিকিৎসকের গুণ দোষের বিচার ও পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ বা পরিত্যাগ করেন। ইহাতেই কতকটা গুণের পুরস্কার ও দোষের তিরস্কার হইতে পারে বলিয়া বোধ হয়; নচেৎ, আর যা উপায়, তাহাতে বিশেষ কাজের বড় একটা সম্ভাবনা দেখি না।

শ্রীঈশানচন্দ্র বিশারদ।

সুখ।

এমন চঞ্চল কেন সুখ,
নদী-বুকে যেন ক্ষুদ্র ঢেউ,
ব্যাকুল লুকাতে সদা মুখ,
ধরার সে নহে যেন কেউ।

২

কখন সে ল'য়ে আপনারে
পারে না নিমেষ হ'তে স্থির,
কীট মত চাহে লুকাবারে
শত দুখ করিয়া বাহির।

একা কি সে নাহি পায় সুখ,
তাই পর-মুখী পর-মনা ?
তাই কেঁদে ডাকে শত দুখ—
বাস যথা বিলাতে আপনা ?

৪

কিশোরি, তোমারে তাই হেরে,
সুখ বুঝি এত সুখ পায়—
অত সুখ সহিতে না পেরে
আত্ম-ঘাতী হ'য়ে ম'রে যায়।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

পঞ্চবটী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

একদিন পঞ্চবটীতে বড় একটা নূতন কাণ্ড উপস্থিত হইল। হারাধন শুনিলেন গাঁয়ে একজন সাহেব আসিয়াছেন, সাহেব তাঁহারই নিকটে আসিতেছেন। হারাধন শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন। চণ্ডীমণ্ডপের সপগুলা ঝাড়িয়া পাতিতে বলিয়া আড়ার উপর যে একটা মোড়া তোলা ছিল, নিজে তাহা পাড়িয়া ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া সাহেবের বসিবার জন্য রাখিয়া দিলেন। গ্রামের ঝি বৌ অনেকেই সাহেব কখন দেখে নাই, অনেকে আজ সাহেব দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিবার জন্য সর্দ্দারের চণ্ডীমণ্ডপের কানাচে ওৎ করিয়া রহিল। ক্রমে ক্ষেতে লাঙ্গল ফেলিয়া অনেকেই আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে হারাধনের বাড়ীতে রথদোলের লোক জমিয়া গেল। কতক্ষণপরে দিব্যমূর্ত্তি গৌরকান্তি সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উঠানে আসিয়াই বলিলেন, "সর্দার বারি এহি হ্যায় ?"

হারাধন বিনীতভাবে করজোড়ে বলিলেন "আজ্ঞা হাঁ, এই আমার সদর বাড়ী।"

সাহেব বলিলেন "হবা ডোন্ কিস্‌কা নাম?"

হারাধন তদ্রূপ সবিনয়ে বলিলেন "আজ্ঞে, হবাডোম এ গাঁয়ে কেহ নাই।" সাহেব একটু বিস্মিত হইলেন। বিস্মিত হইয়া বলিলেন "নেহি হ্যায়, হবাডোন সর্ডার নেহি হ্যায়?"

হারাধন তথাপি বুঝিতে পারিলেন না, একবার দুই একজনের মুখের দিকে চাহিলেন। ভগবান কানে কানে বলিল, "দাদা, বোধ হয় সাহেব তোমার কথাই বলিতেছে।"

হারাধন কি জবাব দিবেন ভাবিয়া না পাইয়া এক গা ঘামিয়া ফেলিয়াছিলেন। ভ্রাতার কথায় বলিলেন "আজ্ঞে, বুঝিতে পারি নাই, আমারই নাম হারাধন সর্দার।"

সাহেব কি এত অমায়িক হয় গা? এতো তাহাদের মধ্যে কেহ কখন শুনে নাই। সাহেব একেবারে—যেন কত কালের আলাপ—হারাধনের হাত ধরিয়া বলিলেন 'ও বাবু, তোমার নাম হরাডোন ও আমি বড়া খুসি হলো, তোমার সাৎ হামার বহুৎ কঠা হ্যায়।" এই সময়ে সাহেবের সঙ্গী এক বাবু আসিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন। বাবুর নাম গদাধর। সাহেব তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "আ, গডা, টোমি আসিয়াছে উট্টম করিয়াছে, টোমি হরাডোন বাবুকে হামার সব কঠা বোলো।"

তখন, উঠানে বড় রোদ দেখিয়া সাহেব ঘরে বসিবার জন্য দক্ষিণ দিকের প্রকাণ্ড ঘরখানির ভিতর ঢুকিতেছিলেন। হারাধন বলিলেন ' আজ্ঞে, ও গোয়াল, ওখানে গোরু থাকে, এইখানে আসুন।" এই বলিয়া চণ্ডীমণ্ডপে লইয়া বসাইলেন।

তখন, বাবু সুদীর্ঘ ভূমিকা ফাঁদিয়া প্রকাণ্ড বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইলেন যে, সাহেব অতি চমৎকার প্রকৃতির লোক, ভদ্রের চূড়ামণি, দয়ার সাক্ষাত অবতার। সাহেব বিলাতে বসিয়া বিগত সেন্সস রিপোর্ট পড়িয়া বুঝিয়াছেন যে, বাঙ্গালার পঞ্চবটী অতি বৃহৎ গ্রাম, বিস্তর লোকের বসতি, সবাই চাসবাস করিয়া দুবেলা দু মুঠা খাইতে পায়, অথচ কেহ কখন পুত্র পৌত্রের লেখা পড়ার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে না, লেখা পড়া অভাবে এতবড় গ্রাম অজ্ঞতা ও অসভ্যতার আবর হইয়া হতশ্রী হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাই

এই করুণানিলয় সাহেব সাত সমুদ্র তেব নদী পার হইয়া এই গ্রামের উদ্ধারের জন্য—ইহার অধিবাসীদিগকে ঘুট্ ঘুটে অন্ধকাব হইতে ফুট ফুটে আলোয় আনিবার নিমিত্ত এইখানে আগমন করিয়াছেন। তবে, সবাই অবগত আছে, সকল কাজেই এক একজন সহায় বা পৃষ্ঠ-পোষক চাই; ত্রেতায় রামচন্দ্র সীতা উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাঁহার সহায় হইয়াছিল বীব হনুমান, এ কালে এ সাহেবেব সহায় তেমনি আমি শ্রীগদাধর শর্ম্মা; অতএব এ গ্রামেব উদ্ধার যে অচিরাৎ সাধন হইবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে একটা কাজ করিতে হইতেছে; গ্রামেব মাঝামাঝি একটু জায়গা আমাদিগকে দিতে হইতেছে। আমবা সেইখানে একটী স্কুল স্থাপনা করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। আমাদিগের প্রার্থনা, আপনারা আপনাদের পুত্র পৌত্রদিগকে অতঃপর রাখালি না শিখাইয়া সেই স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া আমাদিগকে বাধিত করেন। তাহা হইলে দেখিবেন দুই দিনেব মধ্যেই আমরা আপনাদের ছেলেদিগকে কেমন লায়েক করিয়া দিতে পারিব। সাহেবেব বিস্তব হোমের সঙ্গে আলাপ, দুই বৎসর না যাইতেই তিনি অনেকের ছেলের হৌসে কর্ম্ম করিয়া দিবেন। তখন, আপনারা পুত্রের রোজগারে একটাব স্থানে দশটা মাইন্দার রাখিয়া চাস আবাদ চালাইতে পারিবেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

গদাধর শর্ম্মা আরও অনেক বক্তৃতা কবিলেন, বক্তৃতার শেষে একবার নিস্তব্ধভাবে থমকিয়া দাঁড়াইয়া চক্ষু বুজাইয়া 'হে ঈশ্বর' বলিয়া কি খানিক বিড় বিড় করিলেন। অনেকেই তাহার একটীও বর্ণ বুঝিল না, বুঝিবার চেষ্টাও বড় একটা করিল না, কেবল অবাক্ হইয়া বাবুর সেই মুখভঙ্গিমা সেই হস্তসঞ্চালনপটুতা, রহিয়া রহিয়া সেই লম্ফঝম্পশীলতা দেখিতেছিল। অনেক কথার পর গদাধর শর্ম্মা যখন বলিলেন, সাহেবের নাম, C.A Goodwin কেবল একবার যুগপৎ সকলেরই মুখে একটু হাসির রেখা দেখা গেল। সকলে বুঝিল, সাহেবের নাম "ছিঃ এ গুড্ডিম।' আর বাবু? সাহেবের প্রথম সম্ভাষণেই অনেকে যারপর নাই আশ্চর্য্য হইয়াছিল; এখনও ভাবিতেছিল মানুষের নাম কি কখন 'গাধা' হয় গা? আবার মনে করিতেছিল, এই বিড়াল বনে গেলেই যখন বন-বিড়াল হয়, তখন এই মানুষই সাহেবের বাবু হইলেই বুঝি তাহাকে গাধা বলিতেই হয়। যাহা হউক খট্‌কাটা সকলা অনেকের ঘুচিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

তিন মাস না যাইতেই মাঝের পাড়ার চড়কডাঙ্গায় এক প্রকাণ্ড বাংলা তৈয়ারি হইল। কি সুন্দর উলুর ছাউনি। অনেক দূর হইতে ঘরামি আনাইয়া সে চাল ছাওয়ান হইয়াছিল। তাহারই একধারে একটি অনতি-ক্ষুদ্র পুষ্করিণী কাটিয়া মাটি তুলিয়া চারিধারে বাগান প্রস্তুত হইল। গাড়ী গাড়ী বোঝাই দিয়া ক্রমে হরেক রকম ফলগাছ আসিয়া পড়িল। তিনটা উড়ে মালী রাত্রি দিন পরিশ্রম করিয়া তাহা কেয়ারি করিয়া বসাইল। তিন মাস পূর্ব্বে যেখানে রাংচিতা, পাথরকুচি ও আসসেওড়ার বন ছিল, তাহা যুঁই, মল্লিকা, গোলাপ, বিগোনিয়া, ঝুম্‌কালতায় হাসিয়া উঠিল। বাঁগানে ঢুকিতেই একটী সুন্দর গেট, গেটের দুইধারে দুটী ঝাউ; গেট হইতে বাংলার দরজা পর্য্যন্ত সোজা সরল রাস্তা, তার দুই পাশে সারিবন্দী ফুলগাছ। পঞ্চবটীর ছেলে বুড়োর মধ্যে তাক্ লাগিয়া গেল। কেহ বলিল 'করেছে কি, যেন দেবালা।' কেহ বলিল, 'তাইত, যেন ইন্দ্রের ভুবন।' যাহারা অপেক্ষাকৃত প্রবীণ তাহারা বলিল "তা, হ্যাগা, এ নৈলে কি এত বড় বাজিটা চালাতে পারে?" বলা বাহুল্য সাহেব এখানে বড় একটা থাকি-তেন না, তবে কখন সপ্তাহে একবার কখন পনর দিন অন্তর একবার আসিয়া কার্য্যাদি পরিদর্শন করিতেন। গদাধর শর্ম্মাই সর্ব্বেসর্ব্বা তিনিই এখানে থাকিতেন। তাঁহার অবস্থিতির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জন্য বাংলার উত্তরে আর দুইখানি ছোট ছোট ঘর তৈয়ারি হইয়াছিল। গদাধর গোপনে থাকিয়া কে কি বলে সব শুনিতেন, বুকখানা সাত হাত ফুলিয়া উঠিত, সাহেব আসিলে যাহা শুনিতেন, তাহা অপেক্ষা আরও কত বাড়াইয়া বলি-তেন। যাহাই হউক, দেখিতে দেখিতে পঞ্চবটীতে গুড্‌উইন সাহেবের মিসনস্কুল দৃঢ় ভিত্তি লাভ করিল। গদাধর বাবু সাহেবকে খরচের হিসাব দিলেন ৩৪২৬, সাহেব বিলাতে মিসন ফণ্ডে লিখিলেন ১০৬৫৩ মাত্র। বিলাত হইতে হুণ্ডি আসিল, সাহেব আপনার ভাগ কাটিয়া গদাধরকে তাহার হিসাবমত দিলেন, গদাধর আবার নিজের অংশ রাখিয়া কণ্ট্রাকটারকে চুকাইয়া দিলেন। কণ্ট্রাকটার দেখিল এ বড় লাভজনক কাজ, বিলে একটীও কাটা কুটি নাই, সে যে ১৩১৭৮/১০ টাকার বিল করিয়াছিল, তাহার পাইটী পর্য্যন্ত বুঝিয়া পাইল।

ক্রমে চেয়ার, বেঞ্চ, টেবিল, বোর্ডে সে প্রকাণ্ড গৃহ সুসজ্জিত হইল। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঠং ঠং শব্দে ঘড়ি বাজিতে লাগিল। একা পঞ্চবটী নয়, আশ পাশ গ্রামের মধ্যেও একটা খুব হৈ চৈ পড়িয়া গেল। তখন দলে দলে ছেলে আসিয়া ভর্ত্তি হইতে লাগিল। তাহারা দেখিল, সে ছেঁড়া মাদুর পাতিয়া বসিতে হয় না, পাততাড়ি বহিতে হয় না, গুরুমহাশয়ের তামাক সাজিতে হয় না, আর দেখিল, সপের উপর সেই লাঞ্ছিত বেত্রে ভীষণ মূর্ত্তির ভীতি এখানে নাই। বলা বাহুল্য একদণ্ডের মধ্যে বর্দ্ধমানে গুরুমহাশয়ের পাঠশালা ভাঙ্গিয়া গেল। গুরুমহাশয় মাথায় হাত দিয়া পড়িলেন। তখন হারাধন তাহার জন্য গদাধর বাবুকে বলিয়া সেই স্কুলেই একটী কর্ম্ম করাইয়া দিলেন। গুরুমহাশয়ের মহা আনন্দ, সে সাহেবের চাকুরি পাইল। মনে মনে খুব আশা, অবশ্য উপরি বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন আছেই আছে।

সাহেব এখন সপ্তাহে আসিয়া স্কুল তদারক করেন, বালকদিগকে কখন ছবি, কখন খেলানা কখন মিষ্টান্ন প্রভৃতি উপহার দেন। মাঝে মাঝে নানা রকম বহি বিতরণ করেন, তাহার কোনখানি 'মথলিখিত সুসমাচার,' কোনখানি 'নূতন রকমের কলা খাওয়া' ইত্যাদি। বালকদের মহা আনন্দ, পড়া যত হউক না হউক, তাহারা বেশ দপ্তর সাজান হইতে লাগিল। অভিভাবকেরা সে সব বহি দেখিয়া সুসমাচার কি কুসমাচার বড় একটা বুঝিতে পারিল না, তবে নূতন রকমের কদলী ভক্ষণ যে কিরূপ তাহা অল্পদিনের মধ্যে কতকটা বুঝিতে পারিল বটে।

দিন কতক পরেই সেই নূতন আনন্দময়তার মধ্যে একটা নিরানন্দের ভাব উপস্থিত হইল। সবাই দেখিল, আর রাখাল মেলে না, গোরু বাছুর রাখা ও চাস আবাদ করা বড়ই কষ্টকর হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রথম প্রথম যাহারা আপনাদের ছেলে স্কুলে দিয়াছিল, তাহারা ভাবিয়াছিল অপরের ছেলে দ্বারা তাহাদের কাজ করাইয়া লইতে পারিবে, বিশেষ অদূরবর্ত্তী গ্রামে অনেক ইতর লোকের বাস তাহাদের মধ্যেও অনেক লোক পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু হায়, বৃথায় আশা! দিন কয়েকের মধ্যে দেখিল হাড়ী বাগ্দীর ঘরেও একটীও ছেলে আর রাখালি করে না, সবাই মোটা মোটা দপ্তর ঘাড়ে করিয়া স্কুলে যায়। দেখিয়া অনেকে বড়ই ভাবিত হইল।

গোরু ঘরের বাহির করা ভার হইল, চাস আবাদ একরকম বন্ধ হইবার যো হইয়া উঠিল।

গদাধর শর্ম্মা মধ্যে মধ্যে বালকদিগকে নীতি শিক্ষা দিতেন, মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। সে শিক্ষা ও উপদেশের মূলমর্ম্ম, তাহাদিগের পিতৃ পিতামহের রীতি নীতি অতি কদর্য্য ও বর্ব্বরতাদূষিত, সুসভ্য সাহেবদিগের রীতি নীতিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সুতরাং সর্ব্বথা পরিপালনীয়। আর তাহাদের ধর্ম্ম—ছিঃ বড়ই লজ্জাজনক ও হাস্যকর! পুতুল পূজা। মাটীর পুতুলে রং মাখাইয়া রাংতা পরাইয়া পূজা করিলে সে নাকি কথা কহিতে পারে। গদাধর বলেন আর হাসিয়া হাসিয়া আকুল হইয়া পড়েন। কখনও বালকেরাও হাসে, কিন্তু বালকেরা তাঁহার কথা শুনিয়া হাসে কি তাঁহার রঙ্গ ভঙ্গ দেখিয়া হাসে তাহা বুঝা যায় না। গদাধর শর্ম্মা শেষ হাসি ছাড়িয়া নিবাত নিষ্পন্দবৎ গম্ভীর ভাবে বলেন, পরম পবিত্র খৃষ্টধর্ম্মই সার ধর্ম্ম, তাহার ন্যায় সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই। বালকেরা ভাবে, সে আবার কি? তাহারা কৃষ্ণযাত্রাই তো শুনিয়াছে সেই ননীচোরা ব্রজবিহারী শ্যামচাঁদকেই তাহারা একমাত্র কৃষ্ণ বলিয়া জানে, তবে যীশুকেষ্ট আবার কে? বালকেরা বুঝিতে পারে না, কেবল অবাক্ হইয়া শুনে। গদাধর শর্ম্মা শ্রোতৃবর্গের সেই তন্ময়ত্ব দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন।

একদিন একটী বালক বাড়ীতে আসিয়া তাহার পিসিমাকে যীশুকেষ্টর কথা জিজ্ঞাসা করিল। পিসিমা বুঝিতে পারিলেন না, ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ভ্রাতা তত পণ্ডিত না হইলেও, যীশুকেষ্ট নামটা জানা ছিল, ভাবিলেন 'তাইত। এ যে শেষটা খৃষ্টানি মতলব!' সন্ধ্যার সময় হারাধন সর্দ্দারের চণ্ডীমণ্ডপে অনেক লোক বসিয়াছিল সেইখানে আসিয়া কথাটা পাড়িলেন। তখন অনেকেই সায় দিল যে, হাঁ, তাহাদের ছেলেরাও ঐরূপ একটা নাম উচ্চারণ করে বটে। শুনিয়া হারাধন বলিলেন, "সত্যই ভাবিবার কারণ বটে। তা, সাধ্য কি! কি করিবে? ছেলেগুলাকে একটু চোখে চোখে রাখিলেই হইবে।"

আর আর সকলে অগত্যা তাহাই মত করিল। কিন্তু ছেলেগুলার জন্য সেইদিন হইতে সবারই অন্তঃকরণে কেমন একটা অচিন্তিতপূর্ব্ব ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হইল।

এক পক্ষে প্রথমতঃ—কাজ কর্ম্ম ও চাস আবাদের অনিষ্ট, তার পর বালক-দিগের জন্য অশুভ আশঙ্কা ; অন্য পক্ষে গদাধর শর্ম্মার আনন্দ, সাহেবের তদধিক আনন্দ,—পঞ্চবটীর সেই বড় আহ্লাদের স্কুলটী দেখিতে দেখিতে এইরূপে একের খেলা ও অন্যের মৃত্যুর কারণ হইয়া উঠিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

একদিন সাহেব আসিয়া গদাধরকে ডাকিলেন "গডাঢব।' সাহেব এখন অনেকটা বাঙ্গালা শিখিয়াছেন. তিনি গদাধরকে কেবল 'গডা' না বলিয়া 'গডাঢব' বলিতে পারিতেন।

গদাধর বলিলেন "আজ্ঞে।"

সাহেব বলিলেন "ডেখো এ ষ্টান হামার বড় পছণ্ড হয়েছে। এখান হইটে হামাদের বিলাটে নামটো হইবেই, হামি নামকা সাট কামবি কুছু কবিটে চাহে।"

গদাধর করযোড়ে বলিলেন, "কি কাম হুজুর।"

সাহেব। যেস্তারে রূপেয়া হোয়, আমি ইচ্ছা করিয়াছি একটা ভাঁটি খুলিবে। টোমার অভিপ্রায় কি ?"

গদাধর আকাশ হইতে পড়িলেন। বলিলেন 'হুজুর আমরা মিশনারি বলিয়া পরিচয় দিই, ভাঁটি খুলিলে লোকে কি বলিবে।"

সাহেব রাগিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "বোকা বাঙ্গালি বুঝিটে পারে না, লোক রাখিয়া বনাম করিয়া খুলিলে কে সণ্ডেহ করিটে পারিবে।"

গদাধরকে 'বাঙ্গালি' বলিলেই তাঁহার বড় অপমান বোধ হইত, তায় সাহেব বলিয়াছেন 'বোকা বাঙ্গালি।' তাহার মুখ চোখ লাল হইল। বলিল "তা—তা, তা হ'লে চল্‌তে পারে বটে।"

পরদিন সবাই দেখিল, গ্রাম পার হইয়া যেখানে মাঠে পড়িতে হয়, ঠিক সেই পথের মোড়ে কয়েকটা লোক বাঁশ বাখারি কাটিয়া গাদা করিতেছে। লোকে ভাবিল, সাহেবই বুঝি কি করিতেছে বিশেষ জায়গাটী জমিদারের, সুতরাং কেহ বড় একটা কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। অল্পদিনের মধ্যেই সেখানে একখানি মাঝারি গোছের ঘর তৈয়ারি হইল। অনেকগুলা বড়

বড় জালা আসিয়া পড়িল, হাঁড়া হাঁড়া গুড়ের আমদানি হইতে লাগিল। সকলে জানিল ঘটোৎকচ সাহা নামে কলিকাতার একজন ধনী শুঁড়ি এই মদের ভাঁটি করিতেছে।

মদের ভাঁটি! যে পঞ্চবটীতে কেহ কখন তালের রস পর্য্যন্ত খায় নাই সেইখানে মদের ভাঁটি! প্রথমে যেই শুনিল, সেই শিহরিয়া উঠিল। হারাধন সর্দ্দারের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া উহা লইয়া একটা মহা আন্দোলন হইয়া গেল। সকলেই ভাবিল উপায় কি? যাহার যেমন বুদ্ধি জোগাইল, সে তেমনি বলিতে লাগিল। শেষ স্থির হইল, সাহেবকে জানাইয়া এ বিষয়ে যাহা সৎযুক্তি হয় তাহা করিতে হইবে। কিন্তু সাহেব তখন কলিকাতায়। সুতরাং গদাধর শর্ম্মাকে এ কথা জানাইয়া সাহেবকে চিঠি লেখান হইল। দুই দিন পরে সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সাহেব সকলের কথা শুনিয়া বড়ই বিস্মিত হইয়া উঠিলেন। সে কি! পঞ্চবটীতে মদের ভাঁটী! কিন্তু তিনিও তো ইহার কোন উপায় বলিতে পারেন না। আইনে ইহার বিরুদ্ধে কোন উপায়ের ব্যবস্থা নাই। থাকিলে তিনি প্রাণপণ করিয়া তাহার প্রতিবিধান করিতেন। রাজার আইন তাঁহার সাধ্য কি অন্যরূপ করেন! সাহেব বড়ই আপশোষ করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া অনেকেই মূহ্যমান হইয়া পড়িল। অবশেষে, সাহেব বলিলেন, দেখ, ইহার এক উপায় আছে, বিলাতে মহারাণীর কাছে জানাইলে তিনি দয়া করিয়া ইহা এখান হইতে উঠাইয়া দিতে পারেন। কিন্তু বিলাতে দরখাস্ত করাতো সহজ কথা নয়। তবে, তাঁহাদিগের জন্য তিনি আরও এক কাজ করিতে পারেন, তাঁহার অণ্টির (auntie) হেড আয়া শীঘ্রই বিলাতে যাইবেন, তাঁহার দ্বারা একখানি দরখাস্ত পাঠাইয়া দিতে পারেন, এবং সে দরখাস্ত মহারাণীর হাতে পৌঁছিলেই যে তাহাদের অভীষ্ট অব্যর্থ সিদ্ধ হইবে ইহা তিনি শপথ করিয়া বলিতে প্রস্তুত আছেন।

সাহেবের কথা শুনিয়া তখন অনেকের মনে আশ্বাস হইল। কিন্তু দরখাস্ত লেখে কে? সকলে সাহেবকেই লিখিতে বলিলেন! সাহেব বড় পরহিতৈষী তিনি তাহাতেও অসম্মত নহেন। তখন সাহেব কি একটা ভাবিলেন। তাঁহার অধরপ্রান্তে হাসির ঈষৎ বিদ্যুৎ রেখা দিল। সে হাসি অন্যে বুঝিতে পারিল না; গদাধর কিন্তু তাহা লক্ষ্য করিল। গদাধর সে

হাসির মধ্যে কি একটা গূঢ় মতলব আছে বুঝিতে পারিল। একটু ভাবিয়া সাহেব বলিলেন "বিলাতে দরখাস্ত সে তো আর যে সে কাগজে হইবে না। তাহার জন্য ১৬ টাকা দামের কাগজ চাই।" তা তিনি এতই যদি করিতে পারেন, তাহাদের জন্য সাহেব নিজ হইতেই অর্দ্ধেক টাকা দিবেন স্বীকার করিলেন। তখন বাকি আট টাকা পাঁচ জনে মিলিয়া মাছোট করিয়া সাহেবের হাতে দিলেন। সাহেব তৎক্ষণাৎ গদাধরকে ১৬ টাকা দামের একখানি কাগজ আনিতে পাঠাইয়া দিলেন। কাগজ হারাধন সর্দ্দারদিগের তিন ভাইয়ের নামেই খরিদ করিতে বলিয়া দেওয়া হইল।

পরদিন কাগজ আসিলে সাহেব নিজেই উদ্যোগী হইয়া সকলকে ডাকাইয়া সেই কাগজ সহি করিতে বলিলেন। তখনও কাগজে কিছু লেখা হয় নাই। সাহেব বলিলেন, কলিকাতায় গিয়া ভাল উকীলের পরামর্শ লইয়া তাহার দ্বারা লিখাইয়া লইবেন। তখন সর্ব্বাগ্রে হারাধনের তিন ভাই সহি করিলেন তার পর অন্য স্তম্ভে গ্রামের অপরাপর সকলে স্বাক্ষর করিল। সাহেব নামগুলি একবার ভাল করিয়া দেখিয়া কাগজখানি অতি যত্নে পোর্টমাণ্টুর মধ্যে রাখিয়া দিলেন। আশ্বস্ত হইয়া সবাই গৃহে ফিরিয়া গেল।

পরদিন সাহেব কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। সপ্তাহ পরে ফিরিয়া আসিলে সকলে আসিয়া আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, দরখাস্ত গিয়াছে কি না। সাহেব একটু হাসিয়া বলিলেন, এতক্ষণ সে বঙ্গোপসাগরে পি ও কোম্পানির ষ্টিমারে চড়িয়া যাইতেছে। সন্ধ্যার সময় সবাই চলিয়া গেলে সাহেব ডাকিলেন "গড়া।" অনেক দিনের পর গদাধর সাহেবের মুখে আবার ঐ ডাক শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইয়া কাছে আসিলে সাহেব বলিলেন "ডেখো, ডাবখাস্টের নকল ডেখো কেমন হইয়াছে।" গদাধর কাগজখানি দেখিয়াই বলিলেন—"ইহা কি নকল। এ যে সেই ষ্টাম্প কাগজখানি আমি কিনিয়া আনিয়াছিলাম।"

সাহেব একটু মুচকিয়া হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা পড়িয়া ডেখো।"

গদাধর পাঠ করিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, কি যেন একটা বিদ্যুতের আঘাতে মাথাটা ঘুরিয়া গেল। সর্ব্বনাশ! গদাধর দেখিলেন, সেই ষ্টাম্প কাগজে হারাধন, ভগবান ও গোবর্দ্ধন তিন ভাইয়ে একত্রে সাহেবকে তাহাদের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি খোস কবালায় বিক্রয় করিতেছে। সাক্ষী, গ্রামের অপরাপর সমস্ত বাসিন্দাগণ। অনেকক্ষণ গদাধরের মুখে কথা সরিল না। সেই দিন কার সাহেবের সেই ঈষৎ হাসির কথা মনে হইল। হতবুদ্ধি হইয়া সেই কাগজের পানে তাকাইয়া গদাধর দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বাঙ্গালায় উপন্যাস লেখক।

বঙ্কিম বাবু ক্রমান্বয়ে দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম, এই দশখানি উপন্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত রাধারাণী, ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয় ও রাজসিংহ এই চারিখানি ক্ষুদ্র উপন্যাসও আছে। আমরা এই ক্ষুদ্র উপন্যাস কয়খানির সম্বন্ধে কোন কথাই বলিব না। বঙ্কিম বাবু সম্বন্ধে আমাদের আলোচ্য বিষয় কেবল তাঁহার দশখানি উপন্যাস। তন্মধ্যে বিষবৃক্ষ, রজনী ও কৃষ্ণকান্তের উইল ব্যতীত সকল উপন্যাসেই ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত কিছু না কিছু সম্বন্ধ আছে। এই বিবিধ চরিত্র পরিপূর্ণ এবং বিবিধ ঘটনামূলক দশখানি উপন্যাস সমালোচনা করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে, তবে আমরা তাঁহার কোন্ উপন্যাস কিরূপভাবে দেখি, তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিব, এবং সঙ্গে সঙ্গে কেন যে আমরা বঙ্কিম বাবুকে বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস লেখক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তাহারও প্রমাণ দিব।

প্রথম—দুর্গেশনন্দিনী। বঙ্কিম বাবুর অন্যান্য অনেক পরবর্ত্তী উপন্যাসের সহিত তুলনায় ইহা অনেকাংশে নিকৃষ্ট হইলেও বাঙ্গালায় আর কোন উপন্যাসেরই এত আদর নাই। দুর্গেশনন্দিনীই বাঙ্গালার উপন্যাস রাজ্যের রাজা। ইহার এতদূর আদর হইবার অনেকগুলি কারণও আছে। ১ম—দুর্গেশনন্দিনী প্রথম প্রকাশ হইবার সময় এরূপ শ্রেণীর একখানিও উপন্যাস বাঙ্গালায় ছিল না। বাঙ্গালা উপন্যাসের তখন একপ্রকার সৃষ্টি হয় নাই—সুতরাং তখন অন্য কোন বাঙ্গালা উপন্যাসের সহিত আমরা দুর্গেশনন্দিনীর তুলনা করিতে পারি নাই। ২য়।—দুর্গেশনন্দিনীর ভাষা। বাঙ্গালায় তখন উপন্যাসের ভাষাও ছিল না, বঙ্কিম বাবুই এই নূতন ভাষার সৃষ্টি করেন। এই ভাষায় *wit* ও *humour* যথেষ্ট মিশাইয়াছেন এবং সাবেক ধরণের রূপ বর্ণনার ঘটায় বিদ্রূপও ইহাতে যথেষ্টরূপ স্থান পাইয়াছে। ৩য়।—দুর্গেশনন্দিনীর গল্প। গল্পটী বেশ, ঘটনার পর ঘটনা বিলক্ষণ নিপুণতার সহিত শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে। ৩য়।—দুর্গেশনন্দিনীর নাটকাংশ। ইহা নাটকাংশেও ভাল, অভিনয়ে বেশ জমাট বাঁধে। রঙ্গভূমির কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা শত শত বার অভিনয় করিয়া দুর্গেশনন্দিনী পসার বিলক্ষণ বাড়াইয়াছেন। ৪র্থ।—

দুর্গেশনন্দিনীতে বিবিধ চরিত্রের সমাবেশ। যদিও বঙ্কিম বাবুর প্রতিভানুরূপ চরিত্র সকল ইহাতে কিছুই নাই, তত্রাচ দুর্গেশনন্দিনীর পক্ষে ইহাতে যথেষ্ট আছে।

সকল উপন্যাসেরই একটা না একটা উদ্দেশ্য আছে, কিন্তু বাঙ্গালায় উপন্যাসের সৃষ্টি করা ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য আমরা দুর্গেশনন্দিনীতে দেখিতে পাই না। আমরা বঙ্কিম বাবুর কোন বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি প্রথমে ইংরাজীতে উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন, পরে সেই বন্ধুরই পরামর্শে ইংরাজী ছাড়িয়া বাঙ্গালায় উপন্যাস লিখিতে কলম ধরেন। এ কথাটা যে ঠিক, তাহা আমরা তাঁহার দুর্গেশনন্দিনী পাঠ করিয়া বেশ বুঝিতে পারি। দুর্গেশনন্দিনীর নায়ক নায়িকার প্রভৃতির নাম কয়েকটী ইংরাজী করিয়া দিলেই ইহা একখানি ইংরাজী উপন্যাস হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের মতে দুর্গেশনন্দিনী বাঙ্গালা-পরিচ্ছদে ইংরাজী উপন্যাস।

দুর্গেশনন্দিনী ঐতিহাসিক উপন্যাস। কিন্তু ঐতিহাসিক দুই একটি ঘটনা ব্যতীত ইহার ঐতিহাসিকত্ব আর কিছুই নাই। বঙ্কিম বাবু দুর্গেশনন্দিনীতে তৎসাময়িক আচার, ব্যবহার, রীতি নীতির প্রতি কিছুই লক্ষ্য রাখেন নাই। সকলি বঙ্কিম বাবু আপনার মনগড়া করিয়া লইয়াছেন। যখন বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গ হইতে বন্দীভাবে জগৎসিংহ কতলুখাঁর শিবিরে আনীত হইল, তখন কতলুখাঁর কন্যা আয়েসা কিরূপে আহত জগৎসিংহের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। সে সময় মুসলমানদিগের মধ্যে কি অবরোধপ্রথা প্রচলিত ছিল না? নবাবের এত লোকজন থাকিতে আপনার কন্যাকেই বা একজন বন্দীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত করিবে কেন? নবাবপুত্রীকে শিবিরের সকল স্থানে গমনাগমনের অধিকার দেওয়াটি বঙ্কিম বাবুর কল্পনা-প্রসূত।

জগৎসিংহ ইহার নায়ক, এবং তিলোত্তমা ইহার নায়িকা। ওসমান ও আয়েষা ইহার উপনায়ক ও উপনায়িকা। ইহা ব্যতীত বীরেন্দ্রসিংহ ও বিমলা এই স্থলে উল্লেখযোগ্য। জগৎসিংহ একজন বীর ও প্রণয়ী, ইহা ব্যতীত জগৎসিংহে আর কিছুই বিশেষত্ব আমরা দেখিতে পাই না। নায়িকা তিলোত্তমা ও প্রণয়ী ও বীরকন্যা বটে, কিন্তু বীরনারী নহে, সুতরাং জগৎসিংহের ন্যায় বীরের উপযুক্ত নায়িকা কি না তাহা বিবেচনাস্থল। কাহার মতে হরগৌরী মিলন এবং কাহার মতে অস্বাভাবিক। আর ঘটনাচক্রে একদিন দেবমন্দির মধ্যে অল্পক্ষণ মাত্র সাক্ষাতে এই নায়ক নায়িকার মধ্যে প্রণয় যে কিরূপে এত গাঢ় হইল, তাহাও বিবেচনাস্থল। যাহা হউক নায়ক নায়িকার প্রণয়টা গাঢ় না হইলে উপন্যাসের জমাট হয় না, সুতরাং ইহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। তাহার পর উপনায়ক ওসমান। পুরুষ চরিত্রের মধ্যে ওসমানের চরিত্র বড়ই উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে।

আমরা | ...কি যেখানে দেখিয়াছি সেইখানেই এই পাঠান বীরের হৃদয়ের কোমলত্ব | প্রেমিকতার সঙ্গে সঙ্গে তেজস্বিতা, সাহসিকতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা এবং কৃ... | ...র পরিচয়ও পাইয়াছি। বাস্তবিক ওসমান যে পাঠান বীর ও প্রেমিক ...ম বাবু তা'হা উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত করিয়াছেন। এখন উপনায়িকা আয়েষার সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিবার আবশ্যকতা আছে।

দুর্গেশনন্দিনীর আয়েষাতে যে Scott এর Ivanhoeর Rebeccaর ছায়া পড়িয়াছে একথা সর্ব্ববাদীসম্মত। Ivanhoeর সঙ্গেও জগৎসিংহের বেশ সাদৃশ্য আছে, উভয়েই বীর এবং প্রণয়ী। Ivanhoeর ন্যায় জগৎসিংহেরও অশ্বপৃষ্ঠই প্রধান শয্যা। Ivanhoe যেমন Rowenaর প্রণয়ে আবদ্ধ, জগৎসিংহও সেইরূপ ... কুমারীর প্রণয়ে আবদ্ধ। Ivanhoe যেমন ঘটনাচক্রে ...লাভ করে, আহত হইয়া Torquilstone দুর্গে Rebeccaর শুশ্রূষায় আরোগ্য লা... জগৎসিংহও সেইরূপ ঘটনাচক্রে আহত হইয়া কতলুখাঁর দুর্গে আয়েষার শুশ্রূষায় আরোগ্য লাভ করে। তবে জগৎসিংহ কতলুখাঁর দুর্গে যেরূপ বন্দীভাবে আনীত হয়, Ivanhoe সেরূপ Isaacএর গৃহে বন্দীভাবে আনীত হয় নাই। Rebecca Ivanhoeর নিকট পূর্ব্বে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ ছিল, তাহার পর এই উপকারী বন্ধু আহত শরীরে মৃতপ্রায়, সুতরাং তাহার শুশ্রূষা করিতে করিতে Rebecca যে Ivanhoeকে আত্ম বিক্রয় করিবে, ইহা বিচিত্র নহে। আয়েষা কিন্তু আহত শত্রুর প্রতি সহানুভূতি করিতে গিয়া আপন চিত্ত হারাইয়া ফেলিল। উভয়েরই মিলনে সমাজ সমান প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইল। Ivanhoe জাতিতে Saxon আর Rebecca জাতিতে Jew, তেমনি জগৎসিংহও জাতিতে হিন্দু আর আয়েষা জাতিতে যবন। Bois Guilbert যেমন Rebeccaর প্রত্যাখ্যানে নিরাশ প্রণয়ে জর্জ্জরিত, ওসমানও সেইরূপ আয়েষার প্রত্যাখ্যানে নিরাস প্রণয়ে জর্জ্জরিত। Bois Guilbert এর সহিত Ivanhoeর অসিযুদ্ধের ন্যায় ওসমান ও জগৎসিংহের অসিযুদ্ধ পর্য্যন্ত আমরা দুর্গেশনন্দিনীতে দেখিতে পাই। Rebecca যেমন আপনার হৃদয়ের বেগ যতদূর সাধ্য দমন করিয়া Ivanhoeর বিবাহের সময় অযাচিতভাবে আসিয়া Rowenaকে আপনার বহুমূল্য অলঙ্কারাদি দিয়া অশ্রু মুছিতে মুছিতে জন্মের মতন বিদায় লইয়া চলিয়া গেল, আয়েষাও ঠিক সেইরূপ জগৎসিংহের বিবাহের সময় অযাচিতভাবে আসিয়া আপনার বহুমূল্য অলঙ্কারাদি দিয়া

[illegible]র ও গ্রহণ
অশ্রু মুছিতে মুছিতে তিলোত্তমার নিকট হইতে জন্মের মত[illegible] করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, সুতরাং পরিণাম উভয়েই উভয়েই সমান [illegible]র জন্য আত্মবিসর্জ্জনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জগৎকে দেখাইল। আমরাও উ[illegible] সমানই দুঃখিত হইলাম।

[illegible]নীতে
এই আয়েষা Rebeccaর নামান্তর হইলেও আমরা দুর্গেশনন্দিনীর আয়েষাকে দেখিয়া সুখী হইয়াছি। গ্রন্থকার যেরূপ কৌশলে এই আয়ে[illegible] চরিত্রের রং ফলাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিলক্ষণ গুণপনা আছে। অ[illegible] আয়েষাকে ছাড়িয়া দিলে দুর্গেশনন্দিনীরই বা থাকে কি? স্পষ্ট কথা বলিতে কি আয়েষাচরিত্রই দুর্গেশনন্দিনীর মেরুদণ্ডস্বরূপ। আয়েষাকে বাদ দিলে দুর্গেশনন্দিনীকে [illegible] ঘটনা[illegible] একটি সামান্য গল্প হইয়া দাঁড়ায়।

তাহার পর বীরেন্দ্রসিংহের কথা। বীরেন্দ্রসিংহ একজন যথার্থ বীর পুরুষ। (প্রণয়ীও বটে কিন্তু সে প্রণয় আমাদের এখানকার আলোচ্য হইতে পারে না।) বীরেন্দ্র যে কেবল বীরপুরুষ তাহা নহে, শারীরিক বলের সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয়ের বলের পরিচয়ও আমরা পাইয়াছি কতলুখাঁর বিচার সভায় এবং বধ্যভূমিতে আমরা তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। বীরেন্দ্রসিংহের পর বিমলা। বিমলার রং টুকু বেশ ফুটিয়াছে, তাহার ন্যায় সৎসাহসী বুদ্ধিমতী, চতুরা এবং পতিপরায়ণা রমণী আমরা অল্পই দেখিয়াছি, তবে বিমলা যে বিলাতি ছাঁচে ঢালা এ কথা আমরা অবশ্যই স্বীকার করিব। এই ত গেল চরিত্র চিত্রণের কথা।

কোন কোন সমালোচক এই দুর্গেশনন্দিনীর দুই এক স্থলের বর্ণনায় বঙ্কিম বাবুর রুচির দোষ দিয়া থাকেন, কিন্তু এই দুর্গেশনন্দিনী যে সময়ে রচিত হয়, সে সময়ের রুচির অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে বঙ্কিম বাবুকে দোষী করিতে পারি না। সে সময়ের এই বাঙ্গালা সাহিত্যে মালিনী মাসীর পর্য্যন্ত বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। আর একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, বঙ্কিম বাবুই স্বর্গীয় প্রণয়ের সুন্দর সুন্দর ছবি আমাদের সম্মুখে আনিয়া রুচির পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, আর আমরা ততদূর রুচিরোগগ্রস্তও নই, সুতরাং আমরা সে বিষয় উল্লেখযোগ্য বিবেচনা করি না।

(ক্রমশঃ)

বংশাবলি।

তৃতীয় প্রস্তাব।

যে পাঁচ দ্বিজ, গৌড়ে পদার্পণ করেন, তাঁহারা কান্যকুব্জের যে যে স্থানে বাস করিতেন, তদ্বিষয়ে দ্বিবিধ মত প্রচলিত আছে। পশ্চাৎ বারেন্দ্র-কুল-গ্রন্থের দুই অভিপ্রায় প্রদত্ত হইল।

গৌড়াগত ব্রাহ্মণগণের গোত্রের নাম	গৌড়াগত ব্রাহ্মণদিগের নাম	যে স্থান হইতে আগত, তাহার নাম
শাণ্ডিল্য গোত্রীয়	ভট্টনারায়ণ	জুপুরটট্টর গ্রাম।
ঐ	নারায়ণভট্ট	ডিল্লিচট্টর।
বাৎস্য গোত্রীয়	ধরাধর	তাড়িত।
ঐ	ছান্দড়	তাড়ি।
কাশ্যপ গোত্রীয়	সুষেণ	কোলাঞ্চ।
ঐ	দক্ষ	ঐ।
ভরদ্বাজ গোত্রীয়	গৌতম	উডম্বর।
ঐ	শ্রীহর্ষ	ঐ।
সাবর্ণ গোত্রীয়	পরাশর	মত্র।
ঐ	বেদগর্ভ	ঐ।

কাহারও কাহারও মতানুসারে পঞ্চকোটী, কামকোটী, হরিকোটী, কঙ্কগ্রাম ও বটগ্রাম কান্যকুব্জান্তর্গত প্রদেশ এবং ঐগুলি, ক্রমান্বয়ে ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, ছান্দড়, শ্রীহর্ষ ও বেদগর্ভের বাসভূমি। অন্য কেহ কেহ কহেন, ঐ পাঁচখানি গ্রাম, বঙ্গদেশান্তর্গত ও রাজা আদিশূর প্রদত্ত। শেষোক্ত বর্ণনাই প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয়।

যখন ভট্টনারায়ণ বঙ্গে শুভাগমন করেন, তখন তাঁহার ও তাঁহার সহচর ব্রাহ্মণগণের যেরূপ বয়ঃক্রম হইয়াছিল, তাহার তালিকা (১১) লিখিত হইল।

(১১) "আর্য্যবংশাবলি" পুস্তকের ৬৩ পৃষ্ঠা দেখ।

১।	শ্রীহর্ষের	বয়স	৯০ বৎসর।
২।	ভট্টনারায়ণের	,,	৭০ ,, ।
৩।	দক্ষের	,,	৬০ ,, ।
৪।	বেদগর্ভের	,,	৫০ ,, ।
৫।	ছান্দড়ের	,,	৩০ ,, ।

মহারাজ, ভট্টনারায়ণের অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধিতে ও প্রগাঢ় ধর্ম্মজ্ঞানে পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে কয়েকখানি গ্রাম সমর্পণ করিতে উদ্যত হন, কিন্তু ভট্টনারায়ণ, তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। শেষে ভূপতির নির্ব্বন্ধাতিশয় অতিক্রম করিতে না পারিয়া, কতিপয় গ্রাম অল্পমূল্যে ক্রয় করিয়া,লন (১২)।

ভট্টনারায়ণ, রাজাকে স্বপ্রণীতনাটক উপহার দেন। এস্থলে তাহার পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। ভট্টনারায়ণ, কান্যকুব্জে অবস্থান-সময়েই বেদাদি নানা ধর্ম্ম-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন। তিনি ভাষ্যবৃত্তি সহিত 'আশ্বলায়ন সূত্র' অধ্যয়ন পুরঃসর ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তৎ-প্রণীত বেণীসংহার নাটক কোন্ সময়ে রচিত হয়, তাহার স্থিরতা নাই। সম্ভবতঃ বঙ্গদেশে আগমনের পূর্ব্বেই উহা রচিত হইয়াছিল। পণ্ডিত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ লিখিয়াছেন, এরূপ কিং বদন্তী যে, 'মহাকবি ভট্টনারায়ণ' এই নাটক রচনা করিয়া, আদি-শূর নরপতিকে উপহার দেন। তখন নৃপতি রামপাল নগরের প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাজা, নূতন দৃশ্যকাব্য উপঢৌকন পাইয়া পরম সমাদরে গ্রহণ করেন এবং গৌড় দেশের পূর্ব্বাংশে বিস্তর ভূসম্পত্তি সম্প্রদান করেন।' এই মত সমূলক নয়। কারণ, কবি ভট্টনারায়ণ, নাটকের এক স্থানে বলেন,—

'কাব্যালাপ-সুভাষিত-ব্যসনিনস্তে রাজহংসা গতাঃ,
তা গোষ্ঠ্যঃ ক্ষয়মাগতা গুণলবশ্লাঘ্যা ন বাচঃ সতাম্।
সালঙ্কার-রস-প্রসন্ন-মধুরাকারাঃ কবীনাং গিরঃ,
প্রাপ্তা নাশময়ং তু ভূমিবলয়ে জীয়াৎ প্রবন্ধো মহান্॥'

শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে,—

কাব্যালাপ-সুভাষণে সদা প্রমত্ত রাজকুল, অধুনা নির্ম্মূল হইয়াছে। ?ধুর কণিকামাত্র গুণোপেত শ্লাঘাজনক বাক্যও আর নাই। কবিগণের

(১২) "কুল-সার-সংগ্রহের" ১ম খণ্ডের ৪ পৃষ্ঠা।

অলঙ্কার-রস-পূর্ণ বর্ণনাত্মক মধুর বাণীও অন্তর্হিত; উত্তমোত্তম রাজসভাও আর বিদ্যমান নাই। এই মহৎ প্রবন্ধ, ভূমণ্ডলে জয়-যুক্ত হউক।

বেণীসংহার-সম্বন্ধে নিম্নে কিছু উদ্ধৃত হইল,—

"The drama which is prefaced by these observations was the production of Bhattana'ra'yan (ভট্টনারায়ণ) the first mentioned of the five Brahmans and is said to have been presented by him to Raja Adisur on his reception by that monarch at his palace in Rampal. The work was graciously received and the author rewarded with a grant of rent-free land in place reported to be in Eastern Bengal, but the situation of which has not been preserved by tradition."—[Muktaram qidyabagis' Preface of বেণীসংহার।]

"The poem is fathered on Bhattanara'yan. * * * * Bhattanarayan, it should be borne in mind, was the progenitor of the Bandyopadhyayas in Bengal, and it is not possible that whilst there is no dispute about his being the author of the Venisanhara, there should exist no trace of a tradition to connect his name with the Bhattikabya—a work decidedly popular in Bengal than the other." * *

* * 'Now it is unlikely that Bhattana'ra'yan who was at first a resident of Kanykubja, and then settled in Bengal, should have lived at Ballabhi in Gukrat, and written there one of the epics in sanscrit"—[Preface to the new edition of ভট্টি by Babu Nilmani Nyayalankar.]

বেণীসংহারের দোষ-গুণ বিষয়ে যে যে মত পাওয়া যায়, তাহাই অগ্রে প্রদর্শন করা উচিত বোধে তৎসমুদয় উদ্ধৃত হইল। পাঠক মহাশয়, বুদ্ধিযোগে বিচার করিয়া যাহা সঙ্গত জ্ঞান করিবেন, গ্রহণ করুন।

'The style though spirited is harsh. There is enough of passion, but little of fancy The peculiar excellence of the

piece is the nice distinction of characters, Those of দুর্য্যোধন, অর্জ্জুন, কর্ণ, and অশ্বত্থামা, and above all, that of ভীমসেন are faithfully delniated and minutely distinguished."—(Preface of Ka'vyadipika.)

"এই নাটক, নাটকের প্রায় সমুদায় লক্ষণে অলঙ্কৃত। সাহিত্যদর্পণের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে নাটক-সংক্রান্ত বিষয়ের উদাহরণ-প্রদর্শনের নিমিত্ত বেণী সংহার হইতে যত উদ্ধৃত হইয়াছে, অন্য কোন নাটক হইতে তত নহে। কিন্তু ভট্টনারায়ণের রচনা, প্রাচীন কবিদের রচনার ন্যায় মনোহারিণী নহে। রচনার ন্যূনতা প্রযুক্তই বেণীসংহার, নাটকের সমুদয় লক্ষণে আক্রান্ত হইয়াও কাব্য অংশে শকুন্তলা, রত্নাবলী, উত্তরচরিত, মৃচ্ছকটিক, মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি অপেক্ষা অনেক ন্যূন। বেণীসংহার বীর-রসাশ্রিত নাটক, ইহাতে কুরুপাণ্ডব-যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে বীর ও করুণ-রস-সংক্রান্ত উত্তম উত্তম রচনা ও উত্তম উত্তম বর্ণনা আছে।"—[সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব, ৮০ পৃষ্ঠা।]

বেণীসংহার-রচয়িতা ভট্টনারায়ণ, কাশীধামে জীবনের শেষাংশ অতিবাহন করেন, এরূপ প্রবাদ আছে। তিনি তখনও শ্রমকাতর ছিলেন না। অশেষ আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিতেন; অধিক কি, ঐ সকল ছাত্রের অনুরোধে "প্রয়োগরত্ন" নামে এক ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এখনও পর্য্যন্ত তাহা ধর্ম্মবিষয়ে একখানি প্রচলিত মান্য গ্রন্থ। প্রয়োগরত্নের একটি শ্লোকে গ্রন্থকর্ত্তা, পিতৃনাম-উল্লেখ-সময়ে আপনাকে ভট্টরামেশ্বর-সুত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। বঙ্গাগত ভট্টনারায়ণের পিতা ক্ষিতীশ। সুতরাং প্রয়োগরত্নরচয়িতা ভট্টনারায়ণ ও বেণীসংহার প্রণেতা ভট্টনারায়ণ, দুই পৃথক্ ব্যক্তি [১৩]। ইহার প্রমাণ—

"ভট্টরামেশ্বর-সুতো, ভট্টনারায়ণঃ সুধীঃ।
প্রয়োগরত্নং কুরুতে কাশ্যাং শিষ্টে চতুষ্টয়ে॥"

এই বার ভট্টনারায়ণ-প্রণীত বীররস-স্থল বেণীসংহারের আলোচনায় মনোনিবেশ করা যাইতেছে। এই নাটকে মহারাজ যুধিষ্ঠির নায়ক। ভীমসেন

[১৩] পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়, বোধ হয়, অনবধানতা-বশতঃ গৌড়াগত ভট্টনারায়ণকে "ভট্টরামেশ্বর-সুত" বলিয়াছিলেন।

অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব প্রভৃতি সমর-সভায় পাত্র। দ্রুপদ নন্দিনী কৃষ্ণা নায়িকা। দাম্ভিক, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী দুর্য্যোধন প্রতিনায়ক। কর্ণ, অশ্বত্থামা, দুঃশাসনাদি প্রতিনায়ক সুযোধনের সংগ্রামে সাহায্য-কারক বীর পুরুষ। দুর্য্যোধনের অনুজ্ঞাক্রমে ধৃতরাষ্ট্রের সভায় দুঃশাসন কর্ত্তৃক যাজ্ঞসেনীর কেশাকর্ষণ সময়েই দ্রৌপদী প্রতিজ্ঞা করেন, দুর্য্যোধন ও তদীয় অনুজগণ জীবিত থাকিতে, আমি কেশপাশ-সংস্কারাদি করিব না।" এই প্রতিজ্ঞার পরেই পাণ্ডবগণকে বনবাস ও মৎস্যরাজ-সদনে অজ্ঞাত বাস জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধোদ্যোগ হইতে বেণীবন্ধন পর্য্যন্ত মহাভারতীয় বৃত্তান্ত এই নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়। কবি, এই বীররস-প্রচুর দৃশ্যকাব্যে পাণ্ডিত্য, কবিত্ব, বীরত্ব বর্ণন পাত্রবর্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। তদুপলক্ষে গ্রন্থাভ্যন্তরে কবির নিজের বিলক্ষণ সহৃদয়তা অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। বীরগণের নির্ভীক ভাব, অদম্য সাহস, অটল অধ্যবসায়, প্রবল উৎসাহ, অশেষ শৌর্য্য দেখিয়া পাঠককে প্রতিপদে পুলকিত, বিস্মিত এবং স্থল-বিশেষে স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইতে হয়। ব্রাহ্মণ কবির যদি এই রূপ মনের গতি, তবে তখনকার ক্ষত্রিয় কুলের না জানি, আরও কত শত গুণ ঐ সকল শক্তি প্রবল ছিল। বেণীসংহার রচিত হইয়াছে বলিয়াই সংস্কৃত সাহিত্য, ওজোময় বর্ণনায় সমর্থ, ইয়ুরোপীয়দের নিকট ইহা প্রমাণিত হয়। ধন্য বেণীসংহার! ধন্য তৎপ্রণেতা ভট্টনারায়ণ! তোমাকে শত শত ধন্যবাদ।

এই পুস্তকের ষষ্ঠাঙ্কে যুধিষ্ঠিরকে কিন্তু, একজন স্বাধীন ভূপতি বলিয়া মনে না হইয়া সামান্য এক ভূম্যধিকারি-মাত্র বোধ হয়। রাজার প্রাণত্যাগের চেষ্টা ও তৎকালে তথায় লোকাভাব হওয়া—অনৈসর্গিক বর্ণনা, সুতরাং দুষ্য। অপরিচিত ব্যক্তিকে গুপ্তচর নিযুক্ত করাও রাজনীতিবিরুদ্ধ। গ্রন্থের উপসংহার-ভাগে পাত্রগণের প্রকৃতি যথাযথ লিখিত হয় নাই। অলঙ্কার-ব্যাকরণ দোষও স্থলে স্থলে কিছু কিছু অবলোকিত হয়। ফলতঃ পূর্ব্ববর্ণিত গুণাবলিও এই কয়েকটি দোষ স্মরণ করিয়া বিচার করিলে বলিতে হয়, ইহা অভিজ্ঞান শকুন্তল, বা উত্তরচরিতের তুল্যমূল্য নয় বটে, কিন্তু মুদ্রা-রাক্ষসাদি হইতে উৎকৃষ্ট [১৪]।

[১৪] এই মতামত-বিষয়ে জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের সহিত আমাদের অভিপ্রায়ের অনৈক্য নাই।

এই দৃশ্য-কাব্যে মহাবীর ভীমসেনের অসমসাহিকতা, ও অসীম বিক্রম—ধর্ম্মবীর যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মভীরুতা অখ্যাতি-ভয়, উদারতা ও বিমৃষ্য-কারিতা—বীরকুল-চূড়ামণি, ধীর অথচ গম্ভীর অর্জ্জুনের এবং শান্ত অথচ সদ্বিবেচক, কর্ত্তব্যপরায়ণ সহদেবের অপরিসীম বীর্য্য ক্ষত্রিয় কুমারী, বীরভগ্নী বীর-প্রণয়িণী দেবী পাঞ্চালীর ক্ষত্রিয়-কুলজাতানারী-সুলভ তেজস্বিতা, প্রতিবিধিৎসা—দুর্য্যোধনের দম্ভ, দর্প, অভিমান, অবিবেচনা—মহাবীর কর্ণের প্রভুপরায়ণতা, অটল শৌর্য্য, ও দুর্য্যোধন সদৃশ অন্যান্য গুণ—বীরবর অশ্বত্থামার অলৌকিক পরাক্রম, পিতৃভক্তি, সমরাসক্তি প্রতিহিংসা, সংগ্রাম-কৌশল—ইত্যাদি বৃত্তান্ত কবিবর সুনিপুণ চিত্রকরবৎ চিত্রিত করিয়াছেন। বীররসাত্মক কাব্য-রচনে ভারতীয় কোন কবিই তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন—শ্রেষ্ঠ হওয়া দূরে থাকুক, সমকক্ষও নন—বরং হীন। দশরূপক, সাহিত্য-দর্পণাদি অলঙ্কার-গ্রন্থে নাটকের উদাহরণ-প্রকরণে "বেণী সংহার" হইতেই অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। অলঙ্কার-শাস্ত্রের মতে ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নাটক। কবি, শৃঙ্গাররস-বর্ণনের প্রয়াস না পাওয়ায়, এই গ্রন্থ, সর্ব্বসাধারণের পাঠোপযোগী, হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব" পুস্তকের ও ইংরেজী উদ্ধৃতাংশের মতে যে দোষ উল্লিখিত আছে, পাঠকেরা ইতিপূর্ব্বে তাহা দেখিয়াছেন, এখন গুণাগুণ বিচার করুন। [এই পুস্তক অনেক বার মুদ্রিত হইয়াছে—

(১) ১৯০৩ সংবতে পুনানগরে লিথোগ্রাফ মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ।

(২) ১৯১২ সংবতে পণ্ডিত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়া বেঙ্গল সুপিরিয়র যন্ত্রে মুদ্রিত হয়।

(৩) ১৯২৪ সংবতের ১ চৈত্রে পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার-সঙ্কলিত।

(৪) ভুবনমোহন বসাক
(৫) জীবানন্দ ভট্টাচার্য্য
(৬) বরদাপ্রসাদ মজুমদার } ইহাঁরা তিন জনও প্রকাশক।

অম্বষ্ঠ নৃপতিগণের ঐতিহাসিক বিবরণ লেখক ও 'কায়স্থ পুরাণ' রচয়িতার মতে ভট্টনারায়ণের নাটক, কালিদাসের শকুন্তলাপেক্ষা প্রাচীন। এরূপ ঘটনা হইলে, ভট্টনারায়ণ কালিদাস হইতে, ও আদিশূর, বিক্রমাদিত্য হইতে প্রাচীন হইয়া উঠেন। ইহা কোন প্রকারেই বিশ্বাস্য নয়।

এই বার রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের উৎপত্তি-কথা গ্রহণীয় বিচার করিতে ভট্টনারায়ণ হইতে উভয়ের উৎপত্তি স্থিরীকৃত হইয়াছে, অতএব ভট্টনারায়ণের প্রকরণ নিঃশেষ করিবার পূর্ব্বেই উহার নিষ্পত্তি হওয়া বিধেয়।

"সম্বন্ধ-নির্ণয়-প্রণেতা বলেন,"—

"সেই মহাপুরুষ দ্বিজপঞ্চক, রাজদত্ত গ্রাম পাইয়া পরস্পর পৃথক্‌ভাবে পরমানন্দে বাস করিতে লাগিলেন, কালক্রমে তাঁহাদের ষটপঞ্চাশৎ (৫৬) সন্তান জন্মিল [১৪]। সেই সন্তানগণের অধস্তন সন্ততি-মধ্যে যখন অন্তর্বিচ্ছেদ ঘটিল, তদবধি কতকগুলি বরেন্দ্রভূমে বসতি করিতে লাগিলেন। যাঁহারা অজয়পার ও রাঢ়দেশে বাস করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের সেই বাস নিবন্ধন তাঁহাদিগকে রাঢ়ী ও যাঁহারা বরেন্দ্রভূমে অর্থাৎ পদ্মানদীর নিকটবর্ত্তী দেশে বসতি গ্রহণ করিলেন, তাঁহাদিগকে বারেন্দ্র শব্দে নির্দ্দেশ করা যায় [১৬]।"

"এতৎ-সম্বন্ধে গৌড়ে ব্রাহ্মণ' রচয়িতার মত এই,—

আদিশূর বিবেচনা করিলেন, বঙ্গদেশবাসী, ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ সগুণ
যদি তাহাদিগকে কন্যা সমর্পণ করেন, তাহা হইলে ইহাঁ
যাইতে ইচ্ছুক হইবেন না। ইহাঁদের ঔরসে সগুণশালী ক
পত্তি হইলে, আমা কর্ত্তৃক কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণবংশ
জন্য আমার অক্ষয় কীর্ত্তি চিরস্থায়ী হইবে।
লেরা, ভট্টনারায়ণ প্রভৃতিকে নৃপাজ্ঞাবশতঃ ক
ভট্টনারায়ণ-প্রমুখ ব্রাহ্মণেরা স্বজন কর্ত্তৃক স
কটে ধান্যশালী রাঢ়দেশে বসতি করিলেন।
দীপ, এতদুভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে না,
কন্যাতে জন্মণ প্রভেদ শূন্য, আত্মসদৃশ পুত্র কন্যা উৎ
ক্রমে ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির অভাব হইলে, কান্যকুব্জদেশবাসী
জ্যেষ্ঠ পুত্রেরা তাঁহাদের মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া শ্রাদ্ধ করিলেন, কিন্তু গ্রামবাসী ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের দান গ্রহণ কি, অন্নভোজন না করাতে তথাবিধ অবমানিত ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির সন্তানেরা, অনন্যোপায় হইয়া, স্ত্রী-পুত্র-সহিত গৌড়ে

[১৪] অন্য প্রমাণে ৫৯ উনষাট্ সন্তান।
[১৬] সম্বন্ধ নির্ণয়, ২০ পৃষ্ঠা।

আসিলেন। আদিশূর নৃপতি, আগত বিপ্রবৃন্দকে রাঢদেশে বসতি করার উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু বিপ্রগণ বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের সহিত রাঢদেশে বসতি করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন; তাহাতে গৌড়াধিপতি কহিলেন, রাজধানীর নিকটবর্ত্তী বরেন্দ্রাখ্য দেশে আপনারা বসতি করুন, তথায় শস্য-পূর্ণ মনোহর গ্রাম প্রদান করিব; তাহাতেই ব্রাহ্মণেরা বরেন্দ্র দেশে বসতি করিলেন। রাঢদেশীয় তাঁহাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণ, মাতুলাশ্রয়ে বাস এবং মাতুল কর্ত্তৃক পরিপালিত হইয়া তাঁহাদের দ্বারা উপনীত হন। তাহাতেই সকলে সামবেদী হইলেন এবং সকলেই নীতিপরায়ণ ও বিদ্বান্ বলিয়া গৌড়াধিপের আদরণীয় হন। যেমন ব্রহ্মার সন্তানেরা এক পিতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদিরূপে বিভক্ত হন, সেইরূপ ইঁহারাও, বিভক্ত
শাপত্ন্য-বিদ্বেষ হেতু পরস্পর একত্র বাস এবং ভক্ষ্যভোজ্য ত্যাগ করি-
(১৭)
ব্রাহ্মণ" পুস্তকের উক্ত অভিপ্রায় যুক্তি-সঙ্গত নয়। যদি ভট্ট-
দশে অবমানিত হইয়াছিলেন, তবে তাঁহারা কি কারণে প্রথম
ক ও পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া গৌড়ে আসিয়াছিলেন?
হাতে সম্মত হইবে? তৎপ্রদেশস্থ ব্রাহ্মণের অত্যা-
হাদের তথায় অবস্থান করা দুর্ঘট হইত। লেখক
প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই। রাঢীয়েরা সামবেদী
মাণিক। অন্য স্থলে তিনি বলেন, "সামবেদী
গৃহ্যকর্ম্ম তথা সন্ধ্যা-বন্দনাদি সামবেদীয় গৃহ্য-
বৃহৎ ও কঠিন। হইতেই বোধ হয়, রাঢীয়
অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া সামবেদী হইয়া থাকিবেন।"(১৮)
বেদ অপেক্ষা সামবেদ অধ্যয়ন দুরূহ। তদ্ভিন্ন ঋগ্বেদ
সংহিতাদিতে যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা সামবেদেরও অন্তর্গত। ঋগ্-বিশেষে নূতনও একও সামগানে ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব ঐ মত সমীচীন নয়, ইহা অনায়াসে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়।

(১৭) গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ৭৩,৭৪ পৃষ্ঠা। (১৮) [গৌড়ে ব্রাহ্মণ ৬৬ পৃষ্ঠা]

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

সংসারের মানুষ।

সংসারের মানুষ। তুমি কি আমার হৃদয়ের জ্বালা বুঝিতে পারিবে? না, তোমায় আর আমায় প্রভেদ অনেক, তুমি আমার হৃদয়ের সে জ্বালা বুঝিতে পারিবে না। যদি বুঝিতে পারিবে—তবে সেই যে সেদিন দিনে, দুই প্রহরে, বিনা মেঘে, বিনা ঝঞ্জাবায়ুতে আমার হৃদয়ে অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইয়া গেল, তোমার সেই সুদিনে—কিন্তু আমার সেই দুর্দ্দিনে তুমি কোথায় ছিলে বাপু? এ জীবনে আত্মীয় পর শত শত রোগীর মৃত্যু শয্যায় বসিয়া শুশ্রূষা করিয়াছি, কিন্তু সেই দিনে—আমার জীবনসর্ব্বস্বের সেই চিরবিদায় দিনে—আমি কি জানি কেন, সেই শয্যার দিকেও যাইতে পারিতেছিলাম না, কই বাপু সে দিন তুমি কি একবার আমার গৃহে উঁকি মারিয়াছিলে? আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি সে দিন অমুক রাজার একটা পোষা বিড়ালের মৃত্যুতে তোমরা সাতগোষ্ঠি সেখানে গিয়া পড়িয়া সাতদিন ধরিয়া কাঁদিয়া আসিয়াছ, আর যখন আমার সেই দুর্দ্দিনে আমি স্বহস্তে আপনার হৃদপিণ্ড ছিঁড়িয়া গৃহের বাহিরে লইয়া যাইতেছিলাম, আর একজন উন্মাদিনী স্ত্রীলোক উন্মত্তবেশে "ওগো আমার সোণার চাঁদকে কোথায় লইয়া যাও" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে আমার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, তখন তোমার চক্ষে কি একবিন্দুও অশ্রু ছিল না হে বাপু? তাই বলিতেছিলাম, তোমায় আমায় প্রভেদ অনেক, তুমি আমার হৃদয়ের জ্বালা বুঝিতে পারিবে না।

*　　*　　*　　+

পালাও সংসারের মানুষ, পালাও—পালাও—পালাও। আমি হরিবোল দিতে দিতে রাস্তা দিয়া শব লইয়া চলিয়াছি, আর সেই হরিবোলের শব্দ তোমার কানে প্রবেশ করিতে না করিতেই তুমি উৰ্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পালাইতেছ—বেশ করিতেছ, পালাও, এইরূপে পালাইলে যম আর তোমায় কোনকালেই ধরিতে পারিবে না। আচ্ছা, সংসারের মানুষ, একটা কথার যথার্থ উত্তর দাও দেখি—মরণে তোমার এত ভয় কেন? তুমি হয়ত ঈশ্বর মান না,

আত্মার অবিনশ্বরতা মান না, দেবদেবীত মৃত্তিকা আর প্রস্তরনির্ম্মিত, তাহার কথা দূরে থাকুক—তুমি ইহকাল পরকাল পর্য্যন্ত মান না, কিন্তু মান এই মরণবেটাকে। কই আর কথা নাই যে? তোমাদের মধ্যে কেহ কি সাহস করিয়া বলিতে পার যে, "আমি মরণকে ভয় করি না।" না, তাহা তুমি পারিবে না, মরণে ভয় যদি না থাকিবে, তবে মরণের কাছে যাইতে তোমার এত ভয় কেন, রাস্তায় একটা শব দেখিলে, তুমি ঊর্দ্ধশ্বাসে পালাইয়া যাও কেন? আচ্ছা—তুমি ত বেদ, পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ কিছুই মান না তবে তোমার এই মরণকে এত ভয় কেন আমায় বলিতে পার?

* * * *

আমি কোথায়?—আমি শ্মশানে। ঘোর অমানিশা চারিদিক ঘেরিয়া ফেলিয়াছে, স্তরে স্তরে অন্ধকার ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের আলোকে সেই ভীষণ শ্মশানকে আরো ভীষণতর দেখাইতেছে। সেই ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে ভীষণ শ্মশানে আমি পথ পাইতেছিলাম না, প্রতিপদে আবার মৃতদেহ পদস্পর্শ করিতেছিল। আঁধার। আঁধার! চারিদিক আঁধার। এ আঁধার অনন্ত, এ আঁধার চিরস্থায়ী। দিনের পর রাত্রি হয় সত্য, কিন্তু এ শ্মশানে দিন হইতে কেহ দেখিয়াছে কি? বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যত আঁধার ছিল, যেন তাহাদিগকে টানিয়া আনিয়া এই শ্মশানের মধ্যে পুরিয়া রাখা হইয়াছে। অকস্মাৎ এ আরাব কি? এ ভীষণ রব কিসের? অন্ধকারে যে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না! কেবল মনে হইতেছে যেন, শত সহস্র গৃধ্র, শকুনি ও শৃগাল কুকুর একত্রে বিকটস্বরে চীৎকার করিতেছে। হঠাৎ মুখ হইতে বাহির হইল—"এ শ্মশান কি? এ বিকট চীৎকার কাহার?' তখনি সেই অন্ধকারের মধ্যে কোথা হইতে উত্তর আসিল—"এই শ্মশানই সংসার, আর চিৎকার করিতেছে সংসারের মানুষ।"

* * * * *

বলি ভায়া হে! অত চটিও না, সাঁজ নাই, সকাল নাই মাণিকজীর চীৎকার তোমার ভাল লাগিবে না জানি, সেই জন্য একটা শুভ সংবাদ দিতেছি। এই দেখ, শোক মানুষের কিছু চিরকাল সমানভাবে থাকে না; বিশেষতঃ এই আমাদের মত গরীব লোকের। তুমি বড় মানুষ, তোমার শোক চিরকাল থাকিবে, কারণ তোমায় 'আহা' করিতে অনেকে আছে, আর তোমায় পেটের

ভাবনা ভাবিতে হয় না। কিন্তু গরিবের একদিন বসিয়া থাকিয়া শোক করিবার যো নাই। কারণ শোকানলের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার জঠরানল অমনি জলিয়া উঠিবে। তবে যে বলিতেছ—মাগিটা মধ্যে মধ্যে কাঁদে, সেটা দুদিন যাইতে যেতেই শুধরিয়া যাইবে।

* * * *

শুধরিয়া যাইবে কি? হৃদয়ের সে ফাঁকটুকু একবারে পূরিবে কি?—না। যে দিন তুমি উৎসবে ও আনন্দে নৃত্য করিবে, তোমার সেই উৎসবের দিনে আমার এই জীবনের অভাব আমি বুঝিতে পারিব। আর কখন যদি এ জীবনে ভাঁটার পরিবর্ত্তে জোয়ার আইসে, তবে আমার সেই উৎসবের দিনেও আমার শোকসপ্তসিন্ধু উথলিয়া উঠিবে। তাই বলিতেছি, সংসারের মানুষ, তোমার আমার প্রভেদ অনেক, তুমি আমার হৃদয়ের জ্বালা বুঝিবে পারিবে না।

বাঙ্গালায় উপন্যাস লেখক।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দুর্গেশনন্দিনীর পর কপালকুণ্ডলা বঙ্কিম বাবুর দ্বিতীয় উপন্যাস। প্রতিভা যে অধিককাল চাপা থাকিতে পারে না, এই কপালকুণ্ডলাই তাহার সাক্ষী। দুর্গেশনন্দিনীতে আমরা যে প্রতিভার স্ফূর্ত্তি না দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলাম, কপালকুণ্ডলাতে আমরা সেই প্রতিভার একটিমাত্র স্ফুলিঙ্গ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। বাস্তবিক, এই কপালকুণ্ডলাতে বঙ্কিমবাবু এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার গল্পাংশ যদিও কিছুই নহে, দুই চারি কথায় শেষ করা যায়, কিন্তু ধন্য বঙ্কিম বাবুর প্রতিভা! ধন্য তাঁহার চরিত্র-চিত্রন ক্ষমতা এবং ধন্য তাঁহার রমণীহৃদয় অভিজ্ঞতা। তিনি যে মোহিনীশক্তিবলে এই মোহিনীচিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা দেখিয়া কে না মুগ্ধ হইবে? কে না তাঁহাকে একজন প্রতিভাশালী লেখক বলিয়া পূজা করিবে?

এই কপালকুণ্ডলার, দুইটি চিত্র বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। ১ম—কপালকুণ্ডলা; ২য়—লুৎফ-উন্নিসা বা মতিবিবি। কপালকুণ্ডলা কবির নিজের সৃষ্টি, ইহা সাংসারিক চিত্র হইতে ভিন্নরূপ। সংসারে কপাল-কুণ্ডলাকে কে কবে দেখিয়াছে? এ রত্ন পৃথিবীর সমস্ত সংসার খুঁজিয়া বেড়াইলেও পাওয়া যায় না। ইহা কবির কল্পনাপ্রসূত বা Ideal character. সংস্কৃত ভাষায় যেমন কালিদাসের শকুন্তলা, ইংরাজী ভাষায় যেমন Shakespereএর Miranda, আমরা বলি, বাঙ্গালাভাষায়ও সেইরূপ বঙ্কিম বাবুর কপালকুণ্ডলা। তিনজনই প্রতিভাশালী কবি, সেই জন্য তিনজনই তিনটি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। শকুন্তলা, Miranda এবং কপালকুণ্ডলা তিনজনে এক প্রকৃতির হইলেও তাহারা অবস্থাবিশেষে সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপে চিত্রিত হইয়াছে। আমরা যখন আয়েষার সহিত Rebeccaর সাদৃশ্যতা দেখাইয়াছি, তখন এই কপালকুণ্ডলার সহিত শকুন্তলার এবং Mirandaর পার্থক্যতাও দেখাইতে চেষ্টা করিব।

কপালকুণ্ডলা ভয়ঙ্কর নারকী কাপালিকের প্রেতভূমিতে তৎকর্ত্তৃক আশৈশব প্রতিপালিতা, শকুন্তলা ও Miranda কিন্তু আশৈশব পুণ্যাত্মা কণ্বের এবং Prosperoর আশ্রমে তাহাদেরই কর্ত্তৃক প্রতিপালিতা। কপালকুণ্ডলা বন-বাসিনী এবং সম্পূর্ণ সংসারানভিজ্ঞ, কিন্তু Miranda ও শকুন্তলা বনবাসিনী বটে, কিন্তু কপালকুণ্ডলার ন্যায় সম্পূর্ণ সংসারানভিজ্ঞ নহে। কপালকুণ্ডলা সেই অরণ্যমধ্যে নবকুমারের প্রথম দর্শনে প্রণয়মুগ্ধ হয় নাই, কিন্তু শকুন্তলা এবং Miranda উভয়েই দুষ্মন্ত ও Ferdinandকে দেখিয়াই প্রণয় মুগ্ধ হইয়া-ছিল। কপালকুণ্ডলা সামান্য গৃহস্থের স্ত্রী হইবারও উপযুক্ত নহে, কিন্তু শকুন্তলা ও Miranda রাজমহিষী হইবারও উপযুক্ত রমণী। কপালকুণ্ডলা সেই বন্যঅবস্থায় সংসারের মধ্যে আসিবামাত্র সংসারের সহিত তাহার পার্থক্যতা আমরা যেমন সহজে বুঝিয়া লইতে পারি, শকুন্তলা ও Mirandaকে সংসারে আনিয়া তাহাদের সহিত সংসারের পার্থক্যটুকু কিন্তু তত সহজে আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তিনটি বনলতাই উদ্যানলতাকে সমানভাবে পরাভূত করিয়াছে, অথচ তিনটি এক প্রকৃতি হইলেও সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাবাপন্ন। শকুন্তলা ও Mirandaর মধ্যে যে পার্থক্যতা আছে, তাহা আর এস্থলে দেখাইবার আবশ্যক নাই।

আমরা তিনজনেরই প্রকৃতি একরূপ বলিয়াছি, এখন দেখা যাউক সে প্রকৃতি কি। তিনজনেই অতি শৈশব হইতে সংসারের অনেকদূরে অবস্থিতা। কাহারই মন সংসারের হিংসা, দ্বেষ লোভ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি দ্বারা কলুষিত হয় নাই; কিন্তু স্বভাবজাত স্নেহ, দয়া, ধর্ম্ম প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তি সকল সমানভাবে তিনজনেরই হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। আমরা প্রথমে যখন শকুন্তলাকে দেখি, তখন শকুন্তলা স্বহস্তে বৃক্ষ, লতাদিতে জলসিঞ্চন করিতেছে, নব-মালিকার সহিত সহকার তরুর বিবাহ দিতেছে, মাধবীলতাকে ভগিনী সম্বোধন করিতেছে। কেমন কোমল হৃদয়। কেমন মধুর প্রকৃতি! আর Mirandaর সহিত প্রথম দর্শনে আমরা তাহার কিরূপ পরিচয় পাইলাম? Miranda উত্তালতরঙ্গমালায় আন্দোলিত জলধীবক্ষে একখানি মগ্নপ্রায় অর্ণবপোত দেখিয়া বলিতেছে—

—"Oh, I have suffered
With those that I saw suffer '—a brave vessel,
Who had, no doubt, some noble creatures in her,
Dash'd all to pieces. Oh, the cry did knock
Against my very heart! Poor souls! they perish'd
Had I been any god of power, I would
Have sunk the sea within the earth, or e'er
It should the good ship so have swallow'd, and
The freighting souls within her."

Mirandaর মুখে এই প্রথম কথা শুনিয়াই আমরা তাহার প্রকৃতি বুঝিতে পারিলাম। সে হৃদয়েও স্নেহ, দয়া, ধর্ম্ম, প্রভৃতি কোমল ও মধুর প্রকৃতি সকল বর্ত্তমান। তাহার পর কপালকুণ্ডলাকেও যখন আমরা প্রথম দেখিলাম, তাহার প্রথম কার্য্য তখন আমরা কি দেখিতে পাই? ঘোর নারকী কাপালিক নবকুমারকে বধার্থ সঙ্গে লইয়া চলিয়াছে দেখিয়া কপালকুণ্ডলার প্রাণ নবকুমারের জীবন রক্ষার জন্য আকুল! দুইবার নিষেধ সত্ত্বেও যখন নবকুমার পালাইতে অক্ষম হইল, তখন সেই কোমলহৃদয়া স্বর্গীয়া বালা অন্য কোন উপায় না দেখিয়া নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়া কাপালিকের খড়্গ চুরি করিল। ইহাতেই নবকুমারের জীবন রক্ষা হইল।

কপালকুণ্ডলার এই প্রথম কার্য্য দেখিয়া তাঁহার প্রকৃতি কি আর বুঝিতে আমাদিগের বাকি থাকে ?]

এখন এই এক প্রকৃতির তিনটি রমণী এক অবস্থাপন্ন হইলেও তাহাদের মধ্যে কেবল শকুন্তলা এবং Miranda দুষ্মন্তকে এবং Ferdinandকে দেখিবামাত্র তাহাদের প্রণয়ে মুগ্ধ হইল, কিন্তু কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে দেখিয়া তাহার প্রণয়ে আবদ্ধ হইল না কেন ? বিবাহ পর্য্যন্ত হইয়া গেল, কপালকুণ্ডলা অরণ্য ত্যাগ করিয়া সংসারে আসিল, তথাচ নবকুমারের প্রতি তাঁহার প্রণয় গাঢ় হইল না কেন ? আমাদের বিবেচনায় কপালকুণ্ডলার বন্যস্বভাব একবারে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল, আর আশৈশব সংসারানভিজ্ঞতাই ইহার অন্যতর কারণ। শকুন্তলা যে সংসারানভিজ্ঞ ছিল না লজ্জাই তাহার প্রমাণ, স্ত্রী ও স্বামীর যে কিরূপ সম্পর্ক স্বচক্ষে না দেখিলেও শকুন্তলার তাহা জানা ছিল। Miranda সম্বন্ধেও আমরা এরূপ কথা বলিতে পারি। Miranda ও সংসারানভিজ্ঞ নহে। Prospero যখন আপনার সহোদরের নিষ্ঠুর ব্যবহারের পরিচয় Mirandaর নিকট দিতেছে, তখন Miranda কি বলিতেছে দেখ—

"I should sin
To think but nobly of my grandmother :
Good wombs have borne bad sons."

কিন্তু অধিকারীর মুখে বিবাহের কথা শুনিয়া কপালকুণ্ডলা বলিল—"বিবাহের নাম ত তোমাদের মুখে শুনিয়া থাকি, কিন্তু কাহাকে বলে সবিশেষ জানি না। কি করিতে হইবে ?' তাহার পরক্ষণেই কপালকুণ্ডলা কোনরূপ লজ্জারভাব প্রকাশ না করিয়াই বলিল— 'বিবাহ হউক।" ইহাতেই বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, কপালকুণ্ডলা সাংসারিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সেই কারণেই নবকুমার তাহাকে প্রণয়াবদ্ধ করিতে পারে নাই। আর যে রমণীহৃদয়ে প্রণয়বীজ অঙ্কুরিত হইল না, সে রমণী কখন যে সংসারী হইতে পারে না, ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এই কথাই কপালকুণ্ডলাচরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি।

এই কপালকুণ্ডলা চরিত্র Romantic ধরণের। তাহার বন্যপ্রকৃতি এবং সেই বন্যপ্রকৃতির জন্য স্বভাবজাত স্বাধীনভাব আমাদের চক্ষে

বিলক্ষণ Romantic বলিয়া বোধ হয়। আর এই চরিত্র বেশ উপন্যাস-যোগ্য চরিত্রও বটে। কপালকুণ্ডলার দুরদৃষ্ট তাহার প্রতি আমাদের বিলক্ষণ সহানুভূতি জন্মাইয়া দেয়। পরিশেষে তাহার সেই শোকাবহ পরিণাম স্বচক্ষে দেখিয়া আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে আহত হই।

আবার এই বন্যস্বভাববিশিষ্টা, সংসারানভিজ্ঞা, সরলহৃদয়া কপালকুণ্ডলার পার্শ্বে সুসভ্যা, সংসারকীট, চতুরা লুৎফ-উন্নিসাকে আনিয়া বঙ্কিম বাবু কেমন উভয়ের বিপরীতভাব দেখাইয়াছেন। লেখকের এই কৌশল কেমন ফলদায়ক হইয়াছে! তাহার পর আবার যখন এই কুপথগামিনী ও ঘোর-বিষয়িণীর হৃদয়ের আশ্চর্য্য ঘাতপ্রতিঘাত আমরা দেখিতে পাই, তখন বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ি। শেষে যখন সেই ঘাতপ্রতিঘাতের ফল দেখি—তখন সেই কুপথগামিনী রমণীর জন্যও আবার আমাদের প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। যিনি ঘোর কুপথগামিনীকেও পবিত্রা করিতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই একজন প্রতিভাশালী।

এই কপালকুণ্ডলাতে উপন্যাসের যে art তাহা বঙ্কিম বাবু বিলক্ষণ দেখাইয়াছেন। কোথায় কোন্ চিত্র কিরূপভাবে পাঠকের সম্মুখের আনিতে হয়, কোন্ ঘটনার পর কোন্ ঘটনা সংঘটিত করিলে পর কোন্ চিত্র উজ্জ্বল হয়, তাহা বঙ্কিম বাবু এই উপন্যাসে স্পষ্ট স্পষ্ট দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি প্রথমে মতিবিবির রূপ বর্ণনা করিলেন, মতিবিবি যে একজন অসাধারণ সুন্দরী সে চিত্র বেশ নিপুণতার সহিত আঁকিলেন। তাহাকে আবার নানা অলঙ্কারে বিভূষিত করিলেন, তাহার পর তাহাকে কপালকুণ্ডলার কাছে লইয়া গেলেন, সেখানে এই রূপগৌরবে গর্ব্বিতা রমণী নিরালঙ্কারা আর্দ্র মৃত্তিকায় উপবিষ্টা কপালকুণ্ডলাকে দেখিয়া মুগ্ধা হইল, নিজেই আপনার রূপের পরাজয় স্বীকার করিল। এখন কপালকুণ্ডলার আর রূপের পরিচয় দিবার আবশ্যক আছে কি? লেখকের উপন্যাসের art কেমন দেখিলেন?

কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধে আরো অনেক কথা বলিবার আছে, কিন্তু সে সকল কথায় কোন নূতনত্ব নাই বলিয়া আমরা এই স্থলে আর উল্লেখ করিলাম না।

ক্রমশঃ।

দুর্ব্বহ-জীবন।

১

কি দুর্ব্বহ আমার জীবন।
কোথায় আসিতে যেন, কোথায় এসেছি কেন!
কিছুতে বাঁধিতে নারি মন।
আসিতে আপন দেশে, প'ড়েছি-বিদেশে এসে;
মরু-ভূমে বৃষ্টির মতন!
বৃন্তচ্যুত ফুল-প্রায় ভূমে প'ড়ে আছি, হায়,
কত-ক্ষণে আসিবে মরণ!
কি দুর্ব্বহ আমার জীবন।

২

কিছুতে বাঁধিতে নারি মন,
দিন রাত আসে যায়, আসে বায় পায় পায়,
যায় যায় সাধের যৌবন!
কিছুতে উৎসাহ নাই, কিছু না পাইতে চাই,
আশা যেন অলীক বচন।
যেন শূন্য-গর্ভ মেঘ, নাহি গতি, নাহি বেগ,
প'ড়ে আছি তন্দ্রার মতন।
কিছুতে বাঁধিতে নারি মন।

৩

কি দুর্ব্বহ আমার জীবন।
নাহি শোক, নাহি তাপ, নাহি পাপ-পরিতাপ,
নাহি দুখ, রোগের তাড়ন,
নাহিক স্মৃতির জ্বালা, সংসারের ঝালা-পালা,
দারিদ্রের বৃশ্চিক-দংশন।
সুখের অভাব নাই, তবু সুখ নাহি পাই!
সুখে একি অসুখ-দহন।
কি দুর্ব্বহ আমার জীবন।

৪

সুখে একি অসুখ-দহন।

জননীর স্নেহ রাশি, প্রেয়সীর প্রেম-হাসি,

সুহৃদের রস-আলাপন,

জনকের আশীর্ব্বাদ কোলে শিশু মায়া-ফাঁদ,

সোদরের ভক্তি-সম্ভাষণ—

তবুও সুখের ধারে কাঁদি আমি হাহাকারে;

কার্ শাপে মোহ অচেতন!

সুখে একি অসুখ্-দহন।

৫

কার শাপে মোহ অচেতন!

নয়নে নাহিক দীপ্তি, শ্রবণে নাহিক তৃপ্তি,

কুয়াশায় ঘেরা প্রাণ-মন।

কামনার নাহি স্ফূর্ত্তি, দুখের নাহিক মূর্ত্তি,

মর্ম্মে মর্ম্মে তবু জ্বালাতন!

প'ড়ি দুখ নিজ-হাতে যুঝি যেন তার সাথে,

নিজ মৃত্যু করিতে সাধন।

কি দুর্ব্বহ আমার জীবন।

৬

নিজ মৃত্যু কবিতে সাধন,

বদ্ধ তড়াগের মত প'ড়ে আব রব কত।

নাহি স্রোত, কেবল কম্পন।

ধরা ঘুরে ঘুরে হায়, হ'য়েছে কি শ্রান্ত-প্রায়,

নারে দ্রুত ঘুরিতে এখন?

চঞ্চল সময় কিরে চলে এত ধীরে ধীরে?

এত দূরে থাকে কি মরণ?

কি দুর্ব্বহ আমার জীবন!

৭

যায় যায় সাধের যৌবন।
হাসি কাঁদি গাই বটে, দাগ নাই হৃদিপটে!
প্রাণে নাই প্রাণের বন্ধন!
যৌবনেতে জীর্ণ-জরা, জীবন্তে হয়েছি মরা,
ধরা যেন কারার মতন।
কি বিষাদে—অবসাদে প'ড়েছি দারুণ ফাঁদে,
ভেঙে দেয় কে এ দুস্বপন!
যায় যায় সাধের যৌবন।

৮

কোথা তুমি জীবন-জীবন!
আমি বিনা, সর্ব্বজন কহে, ধরা—কাম্যবন,
স্বপনের সজীব-গঠন।
পর্ব্বতে বা নদী-জলে, আকাশে বা ফুল-দলে
গড়ে কত আশার ভুবন।
শীতে গ্রীষ্মে বর্ষাবাতে সুখ দুখ পায় তাতে,
ভরি বিষে আহরে চন্দন।
কোথা তুমি জীবন-জীবন!

৯

ভরি বিষে, আহরে চন্দন।
কামনা-বাসনা-ভরে বজ্র-নাদে নৃত্য করে,
ঝটিকায় করিয়া গর্জ্জন।
সুখে বা আনন্দে হর্ষে যেন মলয়ার স্পর্শে
ঢলে পড়ে জোছনা মতন।
আমি ধূম-কেতু প্রায়, কি বিরক্ত আপনায়,
হারায়ে প্রাণের আকর্ষণ!
কি দুর্ব্বহ আমার জীবন।

১০

ভেঙে দেয় কে এ দু-স্বপন ?
একি রোগ, কোথা মূল— একি আজন্মের ভুল !
এ রোগের নাহি প্রশমন ?
নাহি কি এমন বায় এ ভস্ম উড়িয়া যায়,
ফেটে পুনঃ সে নন্দন-বন !
নাহি কি এমন বিধি— এই বিসর্পিত হৃদি,
জমে পুন হয় সে তপন ।
কোথা তুমি জীবন-জীবন !

১১

কিছু হেথা নহে অকারণ ।
তোমার উদ্দেশ্য নহে মানুষ যে প'ড়ে রহে
রস-শূন্য মরুর মতন ।
লোষ্ট্র—শিশু করগত, বাত-কুক্কুটের মত
এ জীবন নহে বিড়ম্বন ।
অতি ক্ষুদ্র পরমাণু, অত্যুচ্চ পর্ব্বত-সানু
বহে যেথা তোমার শাসন,
এ জীবন নহে বিড়ম্বন !

১২

সবি তব শক্তির স্ফুরণ ।
চেতন বা অচেতন, কিছু নহে অকারণ,
সকলেরি আছে প্রয়োজন ।
সুর নর যক্ষ রক্ষ সকলেরি আছে লক্ষ্য,
আছে কার্য্য করিতে সাধন ।
আমি হ'য়ে লক্ষ্য-হারা বুঝি ক্ষিপ্ত গ্রহ পারা
নিরুদ্দেশে করি পর্য্যটন ।
কোথা তুমি জীবন-জীবন !

১৩

কোথা তুমি কোমললোচন!

আত্ম-দ্রোহী আত্ম-ঘাতী, ভূমে আজ জানু পাতি,

কব তারে কৃপা বিতরণ!

বল তারে বল এসে, কোন্ পথে চলিবে সে,

কি উদ্দেশ্য করিবে বহন।

অকারণ দেহ-ভার বহিতে পারে না আর,

সহিতে এ অবস্থা-পীড়ন।

কোথা তুমি কোমল-লোচন!

১৪

এ জীবন কর হে নূতন।

অকূল সংসার-পরি ভাসাইয়া দেই তরি,

সহি দুখ-সুখ-আবর্ত্তন।

দাও দেব কর্ম্মে শক্তি, দাও দেব লক্ষ্যে ভক্তি,

সহিতে এ নিদ্রা জাগরণ।

সাধি হে তোমার কর্ম্ম, পালি হে তোমার ধর্ম্ম;

তব ইচ্ছা করি হে পূরণ,

সহি দুখ-সুখ-আবর্ত্তন।

১৫

তব ইচ্ছা করি হে পূরণ।

দাও জয় পরাজয়, যা তোমার ইচ্ছা হয়,

আমি শুধু নিমিত্ত কারণ।

থাকে সৃষ্টি থাক্ থাক্, যায় সৃষ্টি যাক্ যাক্,

সম মোর উত্থান পতন।

এই কর আশীর্ব্বাদ, অবসাদে পেয়ে সাধ,

তব সাধ করি সমাপন।

হে চিত্ত-বিহারী নারায়ণ!

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

পঞ্চবটী।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মস্ত পুকুর। গ্রামে ইহা 'বড় পুকুর' বলিয়া খ্যাত। এক সময় পুকুরটীর অবস্থা বড় মন্দ ছিল না, কিন্তু এখন আর তাহার কিছুই নাই। প্রায় মজিয়া গিয়াছে। চরের উপর কোথাও পাটের ক্ষেত, কোথাও আখের চাস আরম্ভ হইয়াছে। এক ধারে শরবন হইয়া অনেকটা জায়গা জুড়িয়া রহিয়াছে। তাহার পাশে খানিকটা স্থানে কেয়া গাছ। কল্‌মি ও শুষুনির দামে ধারের জল প্রায় দেখা যায় না। মাঝখানে বড় বড় হেলাফুলের ঝাড়। কোন দিকের পাড় সমান নাই, সব ধসিয়া ধসিয়া হতশ্রী হইয়া গিয়াছে। পাড়ের উপর একটা খেজুর গাছ হেলিয়া জলের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, আবার কি ভাবিয়া খানিকটা জলে ডুবাইয়া বাঁকিয়া মাথা তুলিয়া সরল হইয়া উপরে উঠিয়াছে। প্রত্যহ সকালবেলা এই পুকুরপাড়ে বড়ই শোভা হইত। অন্য দিনের ন্যায় আজও সকালবেলা ইহার শোভা হইয়াছে। ছেলের দল পাড়ের উপর খেজুর গাছে খেজুর পাড়িতেছে, কোন বুড়ী দুটী ছাগল আনিয়া যেখানে কচি কচি ঘাসগুলি শিশিরে রৌদ্রে জড়াজড়ি করিয়া অতি সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছে, সেইখানে তাহাদের বাঁধিয়া দিতেছে। ঘাটের ধারে একটা মাদার গাছের মস্ত মস্ত লাল ফুলগুলার ছায়া জলে পড়িয়া বড়ই লাল দেখাইতেছে। জোড়ে জোড়ে অনেকগুলি হাঁস মাঝপুকুরে সাঁতার দিতেছে। দেখিতে দেখিতে বেলা হইল, তাহা দেখিয়া ক্রমে অনেকগুলি মেয়ে আসিয়া ঘাটে জমিয়াছে। কেহ বাসন মাজিতেছে, কেহ আপনি স্নান করিতেছে, কেহ অন্যকে স্নান করাইতেছে, কেহ জল লইতেছে, কেহ দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছে। অদূরে দুইটী স্ত্রীলোক চুপড়ি হস্তে শাক তুলিতেছে। পুরুষেরা প্রাতেই যে যাহার কাজে বাহির হইয়া গিয়াছিল।

অনেক স্ত্রীলোক, অনেক রকম কথা হওয়াই সম্ভব; কিন্তু তাহা না হইয়া সকলে একই বিষয়ের আন্দোলনে মগ্ন ছিল। কি জানি সে কিসের কথা, কিন্তু সেই সরল কৃষক-বালাদিগের সরল হাসি আজ আর লক্ষিত

হইতেছিল না। সবাই কেমন দুঃখপীড়িতা—কেমন সন্তাপে জর্জ্জরিত-দেহা। দেখিলেই বোধ হয়, যেন এক একজন এক একটি শোকের জীবন্ত মূর্ত্তি। সে দেহের জ্যোতি নিবিয়া গিয়াছে, সে হসিত চক্ষু মলিন হইয়া বসিয়া গিয়াছে, সে প্রফুল্ল মুখমণ্ডলে কালিমা পড়িয়াছে, কোন রোগ নাই, অথচ উত্তপ্ত নিশ্বাসে দিনে দিনে দেহ শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু, কেন এমন হইল? পাকা ধানে কে আসিয়া মৈ দিল? সেই আনন্দের হাটে কে এই শোকের বোঝা আসিয়া নামাইল? কি সে দারুণ বেদনা যাহা যুগপৎ সকলেরই মর্ম্মের পরতে পরতে জ্বলিয়া তাহা দগ্ধ করিতেছিল? কি সে বিষাদের ছায়া যাহা সবারই মুখে চোখে প্রতি অবয়বে বিরাজ করিতেছিল? সেই আনন্দধাম পঞ্চবটী গ্রামে ঘরে ঘরে কি এমন সার্ব্বজনিক নিরানন্দতা প্রবেশ করিল?

এই রমণীদিগের মনোবেদনা যদি বুঝিতে চাও, তবে একবার গ্রামের দিকে চাহিয়া দেখ। কি পরিবর্ত্তন। আজ দুই বৎসরও হয় নাই, গুড-উইন সাহেব পঞ্চবটীতে আসিয়াছেন, ইহার মধ্যে একবার দেখ কি ছিল আর কি হইয়াছে। সে হাসি নাই, সে আনন্দ নাই, সে লক্ষ্মীশ্রী নাই। চারিদিকে যেন অলক্ষ্মীর কি এক বিকট ছায়া ভীষণভাবে নৃত্য করিতেছে। দিবা দ্বিপ্রহরে ঘরের কানাচে শিবারব—কি অলক্ষণ। দিনের বেলায়ও গাঁয়ে ঢুকিতে সর্ব্বশরীর চমকিয়া উঠে। কাহারও চালের খড় উড়িয়া গিয়াছে, তাহার জীর্ণ বাখারিগুলা দেখা যাইতেছে, কাষ্ঠের অভাবে গৃহিণী তাহাই দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে উনান ধরাইতেছেন। কাহারও বৃহৎ গোলা শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাতে একটিও দানা নাই—পায়রা ও চড়াই তাহার ভিতর বাসা বাঁধিতেছে। কাহারও গোয়ালখানি উপুড় হইয়া পড়িয়া গিয়াছে, গোরু বাহিরে দাঁড়াইয়া পেটের জ্বালায় তাহারই চালের খড় টানিয়া চিবাইতেছে। বড় বড় লাঙ্গলগুলা অনেকের উঠানে পড়িয়া মরিচা ধরিয়া গড়াগড়ি যাইতেছে। উঠানে লাউয়ের গাছ শুকাইয়া মরিয়া গিয়াছে, রাংচিতা ও হাফরমালির গাছে বাড়ীর পাশের ছোট বাগানটি ভরিয়া গিয়াছে। কোন স্থানে বালক ক্ষুধায় কাঁদিতেছে ও নানা আব্‌দার করিতে করিতে মাতার কাপড় ধরিয়া টানিতেছে, মাতা বাছার হাতে কি দিবেন তাহা ভাবিয়া আকুল হইতেছেন, আর পূর্ব্বের কথা ভাবিয়া দুই

গণ্ড প্লাবিত করিয়া নয়নধারা বহিয়া যাইতেছে। কেহ আজ দুই দিন উপবাসী, ঘরে যাহা ছিল তাহা তাহার বাছাদের খাওয়াইয়াছে; আজ বুঝি তাহাদেরও জোটে না! স্বামী সপ্তাহকাল তত্ত্ব লয়েন না। হত-ভাগিনী কি করিবে? সে আপনার জন্য তত কাতর নয়—কি করিলে তাহার বাছারা দুটী খাইতে পায়—তাহার ভাবনায় আকুল হইয়া পড়িয়াছে। প্রায় সবারই তাহার ন্যায় অবস্থা। ভিক্ষা বা ধার মেলে না। কোন রমণী গৃহের কোণে বসিয়া অজস্র ধারে রোদন করিতেছে আর মনে মনে আত্ম-হত্যার উপায় ঠাহরিতেছে। যে স্বামী আগে তাহাকে প্রাণের অপেক্ষা ভাল বাসিয়াও তৃপ্তি পাইত না। সেই রাত্রিশেষে তাহার সকলের শেষ একমাত্র পৈঁছা গাছটী কাড়িয়া তাহাকে দারুণ প্রহার করিয়া চলিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধা যে পুত্রকে শেষকালে একমাত্র অন্ধের নড়ি ভাবিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছিল, সেই পুত্র আজ কয় দিন তাহার প্রাণ হইতেও প্রিয়তর বাক্সটি লইয়া কোথায় পলাইয়াছে—বুড়ী পুত্রশোকে তদধিক অর্থশোকে কয়দিনে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। কাহারও একপাল গোরু এখন সে নিজেই খাইতে পায় না, গোরুকে খাওয়াইবে কি, সে চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে গোরুগুলি দড়ি খুলিয়া ছাড়িয়া দিতেছে, তাহারা যে যে দিকে পারিতেছে পলাইতেছে। ভয়ানক অবস্থা! সে হাসি, সে আনন্দ, সে সরলতা আর কিছুই নাই। হাসি আর আনন্দ পলাইয়া গিয়া আশ্রয় লইয়াছে কেবল দূরে—দূরে গ্রামের বহির্ভাগে সেই ভাঁটিখানায়। সে হাসি, সে আনন্দের রোল কি বিকট! তাহা শুনিলে প্রাণ চমকিয়া উঠে, আতঙ্কে বুক কাঁপিতে থাকে, মনে হয়, হে ভগবন, তোমার সোণার রাজ্য কি পাপে এমন ছারেখারে দিতে বসিয়াছ?

প্রাতঃকালে সেই ঘাটে মিলিয়া সকলে আপন আপন দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিতেছিল, কেহ বলিতে বলিতে অশ্রুমোচন করিতেছিল, কেহ বা কাতরে ভগবানকে ডাকিতেছিল, কেহ বা উদ্দেশে বিধাতাকে বার বার গালি দিতে ছিল। যে গত রাত্রে স্বামীর নিকট এতই প্রহার খাইয়াছিল যে এখনও তাহার অঙ্গ বেদনা ঘুচে নাই সে একটী বারের জন্য বিধাতার দেখা পাইলে তাঁহাকে ভাল করিয়া শিক্ষা দিবে বলিয়া শাসাইতেছিল। উহারই মধ্যে বর্ষীয়সী একজন বলিল, "তা কি জান, ও সকলই অদৃষ্টের ভোগ, কত পাপ করেছি এ তারই ফল।"

পূর্ব্বোক্তা রমণীর তাহা সহ্য হইল না, সে বলিল—"পাপ কি গ্রাম যুড়িয়া সবাই করেছি?—ভাল তাই নয় হউক, কিন্তু সর্দ্দারেরা কি করেছিল—সে যে ধর্ম্মের সংসার তবে তাহা কেন অমন হইল?"

বর্ষীয়সী আর আপনার যুক্তি বজায় রাখিতে পারিল না। বলিল "সত্যি মা, এমন ঘর এমন হতেও কেহ কখন দেখে নাই।" বৃদ্ধার চক্ষু জল-ভারাক্রান্ত হইয়া আসিল।

এই সময়ে সেই স্থানে আর একজন বৃদ্ধা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় এক সময়ে—সেও বড় বেশি দিনের কথা নয়—এক সময়ে দেহের বড়ই লাবণ্য ছিল, বড়ই সুখে দিন কাটাইয়াছিলেন; কিন্তু এখন দুঃখের উষ্ণ নিশ্বাসে সে লাবণ্য কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গে কালি মাড়িয়া দিয়াছে, চক্ষু কোটরগত হইয়াছে, মাংস অসম্ভব লোল হইয়া পড়িয়াছে কোমর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, মুখে বিষাদের ঘন ছায়া অবিরত ক্রীড়া করিতেছে, পরিধান জীর্ণ মলিন বসন—আ মরি মরি! ঘাটে যে দেখিল সেই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। এই বৃদ্ধা হারাধনের মাতা। ইহাকে সেই তখন দেখিয়াছিলে আর আজ দেখ। কি পরিবর্ত্তন! হারাধনের মাতা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—রসিককে কাল সন্ধ্যার পর হইতে কেহ দেখিয়াছে কি না।

কেহই বলে না যে দেখিয়াছে। সবাই বলিল—"কৈ, না মা, তিনি তো এদিকে আসেন নাই, তা হলে কেউ না কেউ একবারের জন্যও দেখ্‌তে পেতেম।"

বৃদ্ধা বড়ই ভাবিতা হইলেন। দাঁড়াইয়া এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই স্বামীকর্ত্তৃক প্রহৃতা রমণী তাহার পার্শ্ব-বর্ত্তিনী ঠাকুরঝির নিকট চুপে চুপে বলিল "বোধ হয় রসিক ঠাকুরপো কাল ভাঁটিখানায় ছিল, আমি তার মুখে যেন এই কথা দুই একবার শুনিয়াছি। সেই দিকটা একবার দেখিতে বল না।"

ঠাকুরঝি বলিল 'দূর! রসিক কি তেমনি ছেলে!"

বৌ বলিল "তা তো সত্যি, কিন্তু তোমার ভাই ওকি আগে মন্দ ছিল?'

ঠাকুরঝি দেখিলেন কথাটা মিথ্যা নয়। তখন চুপি চুপি সে কথা লইয়া রমণীমণ্ডলে আন্দোলন পড়িয়া গেল। হারাধনের মাতা তখনও তেমনি

আনমনে দাঁড়াইয়া। কিন্তু এমন সর্বনেশে কথা কি কাহাকেও বলা যায়? সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

এই সময় দূরে একটা কিসের গোল উঠিল। সকলে চাহিয়া দেখিল, কতকগুলা লোক উন্মত্ত অবস্থায় সেই পুকুরের অপর পাড় দিয়া যাইতেছে। কি বীভৎস! পশুর হইতেও অধম অবস্থা! কেহ বকিতেছে, কেহ চীৎকার করিতেছে, কেহ লাফাইতেছে, কেহ গান ধরিয়াছে, কেহ অশ্লীল কথা সকল উচ্চারণ করিয়া অনর্থক গালাগালি করিতেছে। সবাই হাত নাড়িতেছে, মাথা নাড়িতেছে, পা টলিয়া টলিয়া পড়িতেছে। সেই ঘাটে ইহাদিগের অনেকেরই আত্মীয়া ছিলেন। তাঁহারা ঘৃণায় মুখ ফিরাইলেন। সে মুখ ফিরাইতেও চক্ষে ফোটা ফোটা করিয়া জল আসিল। দুই বৎসর পূর্ব্বে এমনি সময়ে ইহারা প্রসন্নমনে স্ফূর্ত্তির সহিত আপন আপন ক্ষেত হইতে শ্রমজ শস্যাদি লইয়া গৃহে ফিরিত। সেই এক দিন আর এক দিন! কিন্তু সে কথা ভাবিবার সময় ছিল না; অনেক দিন হইল সকলেরই তো কপাল পুড়িয়াছে তাহার জন্য দুঃখ করিবারও অবকাশ তখন ছিল না; সকলে বিস্ময়পূরিত চক্ষে দেখিল, এই দলের মধ্যে রসিক। রসিকের অবস্থা অতি ভয়ানক, তাহার দেহে বস্ত্র প্রায় ছিল না, যাহা ছিল তাহাও ছিঁড়িয়া গিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, তাহা দিয়া অনর্গল রক্তের ধারা বহিতেছে, সেই রক্তে ও ধুলায় মিশিয়া গায়ে মাথামাখি হইয়াছে, তখনও থাকিয়া থাকিয়া সে ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া উলটি পালটি খাইয়া পড়িয়া যাইতেছে।

আড়ষ্ট হইয়া সকলে ইহা দেখিল। হারাধনের মাতা ইহা দেখিলেন। থর থর করিয়া কাঁপিয়া বুড়ী সেইখানে পড়িয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ।

এখন, হারাধনের কথা কিছু বলিতেছি। সকলেরই অবস্থা আমরা এক প্রকার বিবৃত করিলাম, কিন্তু সেই বৃহৎ সর্দ্দার পরিবারের কোন কথা বিশেষ করিয়া এখনও বলা হয় নাই। কিন্তু তাহা আর বলিব কি?

তাহাদের সে অবস্থার কথা ভাবিতেও প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, হৃদয় দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়ে। কি ভয়ানক পতন। সেই প্রকাণ্ড পুরী যাহা সদাই লোকজনে জম্ জম্ করিত তাহা যেন খাঁ খাঁ করিতেছে, সেই চণ্ডীমণ্ডপ তাহা আজ চামচিকা ও পায়রার বিষ্ঠায় ভরিয়া রহিয়াছে, বহির্বাটীর উঠানে এক হাঁটু জঙ্গল, গোয়ালখানা শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে, সে এক পাল গোরুর একটীও নাই। বাহির বাড়ীতে আর দুই বৎসরে কোন লোকজন যে আসিয়াছিল তাহা বলিয়া বোধ হয় না। ভিতর বাটীতে সেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘরগুলা তেমনই মাথা উচ্চ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে বটে, কিন্তু তাহাদের আর সে শ্রী নাই, কত দিন যে তাহার দাবায় গোবর ঝাঁট পড়ে নাই তাহা বলা যায় না, ঘরের কোণে কোণে এক এক গাদা জঞ্জাল। উঠানে বড় বড় ঘাসের সঙ্গে কাঁটানটে ও কচুগাছ জন্মিয়াছে। সকল ঘরের দেয়ালেই লোণা লাগিয়া স্থানে স্থানে খসিয়া পড়িয়াছে। কোন কোন ঘরের চালের উপর জিওল গাছ জন্মিয়াছে। বাড়ীর চারিধার নানা আগাছায় ভরিয়া গিয়াছে। কোন কোন স্থানে এত জঙ্গল হইয়াছে যে সেইখানে দিনের বেলাও শিয়াল আসিয়া বাসা করিয়াছে। দুই বৎসরে কি ভীষণ পরিবর্ত্তন। যেখানে এক দণ্ড লোক ছাড়া ছিল না, দিনান্তে একবারের জন্যও যাইতে না পারিলে সকলে আকুল হইয়া পড়িত—সেই স্থান, সেই বাড়ী কিন্তু সেইখানে এখন দিনের বেলায়ও বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে যাইতে হইলে লোকে ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়ে। বিদেশীয় যে কেহ দুই বৎসর এই গ্রামে আসে নাই, সে ইহা দেখিয়া শিহরিয়া উঠে, ধীরে দুই বিন্দু অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া আর্দ্র হৃদয়ে সেইখান দিয়া চলিয়া যায়।

কিন্তু সে বৃহৎ পরিবারের কি হইল? একজন নয়, দুই জন নয়—মেয়ে পুরুষে একপাল পরিবার তাহারা কোথায় গেল? এমন সাধের বাড়ী ঘর ছাড়িয়া কোথায় গিয়া আবার নূতন বাসস্থান নির্ম্মাণ করিল? গ্রামের পশ্চিমধারে একটী আম্রবাগানের ভিতর আজ বৎসর দুই হইল এক ঘর গৃহস্থ উঠিয়া আসিয়া নূতন বাস করিয়াছে। দুইখানি মাত্র ঘর তাহাও অতি সামান্য, ছিটা বেড়ার দেয়াল, বিচালির ছাউনি—পাশে একখানি আরও সামান্য যে রন্ধনশালা ছিল তাহার চালে বিচালি পর্য্যন্ত জুটে নাই—তালপাতায় সেখানি ছাওয়া। দুইখানি শোবার ঘর—দুইখানিরই

দাওয়া ঘেরা। দেখিলে বোধ হয় অনেকগুলি পরিবার—ঘরে কুলান হয় না, তাই কেহ কেহ দাওয়ায় শয়ন করে। বিশ্বাস হয়?—এই সেই সর্দ্দারদিগের বাসস্থান। সেই পরিবার যাহাদের অত বড় বাড়ীতেও কুলাইত না, তাহারাই আজ এই দুইখানি কুঁড়ের ভিতর দিন কাটাইতেছে। সেই হারাধন যিনি প্রত্যহ কত লোককে অন্নদান করিতেন, দায়ে বিপদে কত লোককে কত রকমে সাহায্য করিতেন, সেই হারাধন আজ অন্নের জন্য লালায়িত। আর যে গোবর্দ্ধন ভগবান দুঃখ কাহাকে বলে কেহ জানিত না, দশ পনর জন কৃষাণ রাখিয়া চাস আবাদ চালাইত, আপনারা কখন স্বহস্তে কুটাটী নাড়িয়া খাইত না, আজ তাহারা দুই প্রহরের রৌদ্রে কাঠ ভাঙ্গিয়া বোঝা বাঁধিয়া দূর বাজারে বিক্রয় করিতে চলিয়াছে। যে পুরস্ত্রীগণ সুখে ও সচ্ছন্দতায় লালিত হইয়া আসিয়াছিল—যাহাদের সৌভাগ্য ও সোনা দানা দেখিয়া আর আর সকলে মনে মনে ঈর্ষা করিত, তাহারা আজ কদন্ন খাইয়া চিকুট মলিন বস্ত্রে অতি কষ্টে লজ্জা নিবারণ করিতেছে। কি দারুণ পরিবর্ত্তন। যাহা ভাবিতেও অপরের বুক ফাটিয়া যায়, না জানি, যে তাহা ভোগে তাহার কত কষ্ট।

কিন্তু কেন এমন হইল? কেন এমন হইল, তাহা আর বেশি বলিতে হইবে না। সেই গুড্‌উইন—সেই গদাধর—তাহারাই এই পরিবারের একমাত্র উৎপাতকেতু হইয়া এখানে আসিয়াছিল। সাহেবের সেই ভীষণ ফন্দির গুণে দুই মাস পরেই সর্দ্দারদিগের সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার হস্তগত হইল। প্রথম যখন কাণাঘুষায় হারাধন কথাটা শুনিলেন, তখন বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিলেন না। বিশ্বাস হয় না। হারাধন একদিন গদাধরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। গদাধর বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি তোমরা তিন ভ্রাতায় তো সব সম্পত্তি সাহেবকে লিখিয়া দিয়াছ—আজ আবার নূতন কথা কহ কেন?" হারাধন আকাশ হইতে পড়িলেন। ক্রমে আসল কথাটা বুঝিতে আর বাকি রহিল না। কপালে করাঘাত করিয়া হারাধন বাটী ফিরিলেন। সে দিন তাঁহাদের আর হাঁড়ি চড়িল না। গোবর্দ্ধন পাড়ার আরও জন কয়েক লোক লইয়া রাগে ফুলিতে ফুলিতে গদাধরকে মারিতে গেলেন। তখন সাহেব আসিয়াছিলেন, গদাধর সাহেবকে দেখাইলেন। সাহেব দেখিবামাত্র এক পিস্তল বাহির করিয়া দৌড়িইয়া আসি-

লেন। দুই একটা আওয়াজও করিলেন। ভয়ে যে যে দিকে পারিল পলাইয়া গেল। পলাইবার সময় গোবর্দ্ধন স্পষ্ট শুনিলেন, গদাধর শাসাই-তেছে, সে শীঘ্রই ইহার প্রতিফলের ব্যবস্থা করিবে। কয়েক দিনের মধ্যেই গোবর্দ্ধন বুঝিতে পারিল, গদাধর বৃথায় শাসায় নাই। একজন আদালতের পেয়াদা আসিয়া হারাধনের বাড়ী, বাগান, পুষ্করিণী ও সমস্ত রাইয়তি ও ধানি জমিতে গুডউইন সাহেবের খোস কোবালায় খরিদা বলিয়া দখল দেওয়াইয়া গেল। আড়ষ্ট হইয়া সবাই ইহা দেখিল। সকলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া হারাধন নালিশ করিল। হারাধন নিরীহ নির্ব্বিবাদী ধর্ম্ম-ভীরু লোক, গোলমাল বড় একটা বুঝিত না, আদালতেও কখন যাইত না। কত খাতকে কত টাকা মাটি করিয়াছে, গোবর্দ্ধন ও ভগবান কতই বলি-য়াছে, হয়ত নালিশের নাম শুনিলেই সে পড়া টাকা সব না হউক কতকটাও আদায় হইত, কিন্তু হারাধন কাহারও কথা শুনিতেন না, আদালতকে তিনি নরকের অপেক্ষাও অধিক ঘৃণা করিয়া তাহার অন্তরে থাকিতেন। গ্রামে অন্য পরস্পরেও বিবাদ বাঁধাইলে পাছে তাহারা আদালতে গিয়া জেরবার হইয়া যায় এই জন্য হারাধন নিজে গিয়া অর্থে সামর্থ্যে তাহা মিটাইয়া দিতেন। সেই হারাধন আজ উপায়ান্তর না দেখিয়া মোকদ্দমা করিলেন। দিনের পর দিন পড়িতে লাগিল। নগদ টাকা যাহা কিছু ছিল ক্রমে তাহা মোকদ্দমার খরচায় ধ্বংশ হইতে আরম্ভ হইল। শেষ গোলার ধানেও হাত পড়িল। ধান ফুরাইয়া আসিল। তখনও মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইল না। হারাধন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। উপায়? এখনও উকীল মোক্তারের পেট পুরে নাই, যত দিন পড়ে ততই তাদের আমোদ—তাহারা টাকা হাতে না লইয়া মোকদ্দমায় হাজির হয় না। হারাধন কাঁদিতে কাঁদিতে স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিতে গেলেন। কিন্তু সে গহনা রাখিয়া টাকা দিবে কে? গদাধর সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া অন্য লোক দিয়া গোপনে তাহা বন্ধক রাখিলেন। বলা বাহুল্য এক শত টাকার জিনিষে পঞ্চাশ টাকাও মিলিল না। কিন্তু সে মহাব্যাপারে সামান্য কয়খানি গহনায় কি করিবে? তাহাতে কুলাইল না দেখিয়া গোবর্দ্ধন তাহার স্ত্রীর গহনাগুলি আনিয়া দিল। হারাধন তাহা দেখিয়া ডুকরিয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। তিনি তাহা বন্ধক দিতে চাহিলেন না। ভাইয়েরা জিদ করিতে লাগিল। হারা-

ধন কিছুতেই স্বীকৃত হইল না। তদ্বির অভাবে মোকদ্দমায় হার হইল। তখন সর্ব্বস্বান্ত হইয়া হারাধন চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে গ্রামের এই প্রান্তভাগে নির্জ্জনে থাকিয়া একটি ছোটখাট বাড়ী করিবার ইচ্ছা করিলেন।

কিন্তু হায়, বিধাতা যখন যাহাকে মারেন তখন আর তাহাকে একটীবারের জন্যও মাথা তুলিতে দেন না। সাহেব আবার ফৌজদারি মোকদ্দমা জুড়িল। আসামী গোবর্দ্ধন, নালিশ—গোবর্দ্ধন লোকজন লইয়া সাহেবকে মারিতে গিয়াছিল। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রথমে বৌদিগের গহনা তার পর ঘটিবাটী ক্রমে যেখানে যাহা ছিল বাঁধা ছাঁদা দিয়া মোকদ্দমা চালাইল। গ্রামের সকলেই হারাধনের হইয়া সাক্ষ্য দিল। কিন্তু সাহেব একমাত্র বাইবেল চুম্বন করিয়া যাহা বলিলেন তাহার বিরুদ্ধে কোন সাক্ষ্যই গ্রাহ্য হইল না। তবে ডেপুটিবাবু নাকি বড় ন্যায়পরায়ণ তাই বেশি কিছু দণ্ড না করিয়া একশত টাকা অর্থদণ্ড করিলেন। এত কষ্টেও প্রসন্নর গহনা কয়খানি বন্ধক পড়ে নাই—আজ অনুপায় হইয়া সে কয়খানিও বাঁধা দিতে হইল। যাহা হউক গোবর্দ্ধন যে জেলে না গিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল, ইহাই তাঁহাদের পক্ষে পরম লাভ। হারাধনের আর কিছুই নাই—এতগুলা পরিবার খাইতে না পাইয়া বুঝি মারা যায়। তখন গোবর্দ্ধন ও ভগবান সামান্য মজুরি করিতে প্রবৃত্ত হইল। আর সেই অমরাবতীর ন্যায় ঘর বাড়ী ছাড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া এই আম্রবাগানে স্বহস্তে এই কুঁড়ে কয়খানি নির্ম্মাণ করিল। তাঁহাদের এই দুঃখের সময় গ্রামের বৃদ্ধ পক্ষ অনেকেই যথাসাধ্য সাহায্য করিতে চাহিল, কিন্তু হারাধন বড় অভিমানী, তিনি অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবেন সেও শ্রেয়, তথাপি কাহারও ভিক্ষোপজীবী হইতে পারিবেন না। তিনি কাহারও একটীও পয়সা গ্রহণ করিলেন না। পয়সা দিবার সঙ্গতি বড় একটা কাহারও ছিল না, তথাপি পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া অনেকে তাঁহার দুঃখে সহানুভূতি করিতে আসিল। তাঁহার ধান বা তাঁহার পয়সা খায় নাই এমন লোক সে গ্রামে কেহ তো ছিল না। তাহারা মাসে মাসে অনেকে মিলিয়া সর্দ্দারদিগকে গোপনে অন্য উপায়ে সাহায্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত; কিন্তু সময়ে সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিয়া উঠিতে পারিত না। কেমন শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে, তাহারা এত করিয়াও

কিছুতে আপনাদেরই পেট চালাইয়া উঠিতে পারিত না। আর চলিবেই বা কোথা হইতে? কাল সাহেব আসিয়া কাল স্কুল স্থাপন করিয়াছিল, আর তদধিক কাল সেই শুঁড়িটা অশুভক্ষণে আসিয়া মদের ভাঁটি খুলিয়াছিল! ছোঁড়াগুলার পরকাল গিয়াছে। তাহাদের আশা আর ছিল না। যাহারা যুবা বলশালী ও কর্ম্মিষ্ঠ তাহাদের মাথা মদে খাইয়াছে। বুড়ারা যে কয়জন আছে তাহারা করিবে কি? দেখিয়া শুনিয়া কেবল কপালে করাঘাত করে আর দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু বহিয়া যায়। হায়, যে পুত্রকে সে প্রাণপাত করিয়া মানুষ করিয়াছে সেই আজ মাতাল হইয়া লাঠি লইয়া তাড়াইয়া মারিতে যায়। হারাধন তাহাদের অবস্থা দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য নিজের কথা ভুলিয়া গিয়া তাহাদের জন্য ব্যথিত হইয়া পড়েন। অতি কষ্টে জীবন্মৃতের ন্যায় হারাধন দিন কাটাইতে লাগিলেন। এখন খাইতে, শুইতে, বসিতে তাঁহার প্রধান চিন্তা, বিধাতা এ দশা করিলেন তো মৃত্যু লিখিলেন না কেন?

আসামবাসীর পত্র।

ডিব্রুগড়ে গিয়াছিলাম। যাইবার পূর্ব্বে তোমার সঙ্গে কথা ছিল ভ্রমণ বৃত্তান্তটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়া তোমাকে পাঠাইব। ভ্রমণকারীর পত্র প্রতি মাসেই সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইতেছে। বর্ণনার মধ্যে বুদ্ধিরূপ চন্দ্রমার প্রকাশ না পাইলে রসের জোয়ার ভাষা-ফল্গুর অন্তরে অন্তরে কখনই প্রবাহিত হয় না। কিন্তু তেমন চন্দ্রমাশালিনী প্রতিভা কোথায়? কিন্তু "মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী" প্রভৃতি ছেঁদো কথায় অনুক্রমণিকা শেষ করিলে তুমি Trash মনে করিয়া পাছে আমাকে উপেক্ষা কর এই ভয়ে তাহা করিলাম না। তবে "উৎপৎস্যতেহস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা" লোকে এ কথাটা স্বীকার না করিলেও যাইয়া আসিবে না। ভ্রমণকাহিনী পুস্তকাকারে যেমন বাহির করিব—অমনি বিজ্ঞাপন ঝাড়িব। প্রতি পত্রে বিজ্ঞাপন দিব "বিরাট কাণ্ড

—বিরাট ব্যাপার—ইহাতে কি নাই? প্রণয়ীর প্রেমপুষ্প ফুটিবার ঔষধ আছে—বিরহিণীর ক্রন্দন আছে, তপস্বিনীর কমণ্ডলু আছে—বৈষ্ণবের শিখা আছে, চিনির মিষ্টত্ব আছে, উকিলের সামলা আছে—শুধু ইহা নহে ইহাতে কবি আছেন, কাব্য আছেন, বঙ্কিম আছেন—রবি আছেন, দামোদর যে দামোদর তিনি অবধি আছেন'—ইহাতে যে নামটা বিস্তারিত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালার গ্রন্থকারদিগের মস্তিষ্ক না থাকিলেও ক্ষতি নাই, কর্ণের দীর্ঘতা ধোপার বস্ত্রবাহকের ন্যায় হইলেই যথেষ্ট হইল।

১৭ই আষাঢ় বেলা দুই ঘটিকার সময় বাড়ী হইতে বাহির হইলাম। বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় মনের মধ্যে চঞ্চলতার উৎপত্তি স্বাভাবিক। কিন্তু তাৎকালীন হৃদয়সমুদ্র এমন নিবাত নিকম্পভাব ধারণ করিয়াছিল, যে, সে সমুদ্রে একটীও তরঙ্গ উঠে নাই। Feelings গুলা তখন কেন যে মৃতকল্প ভাব ধারণ করিয়াছিল বলিতে পারি না। যে সকল বন্ধু বিদায় জন্য গৃহদ্বারে উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের সঙ্গে mechanically কথা কহিয়াছিলাম মাত্র। নয়নের মধ্যে সময়ে সময়ে অশ্রুজলের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়—আমারও তাই হইয়াছিল। পরে ছক্কড়ে আরোহণ করিয়া যখন গ্রামের প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন সুখ দুঃখ হাসি কান্না আমার প্রাণের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। আমি বিদায়-চাওয়া নয়নে সেই সময় একবার জন্মভূমির শোভা স্বরূপ শ্যামল তরুরাজির প্রতি—আর একবার প্রসন্নসলিলা—পুলকবিধায়িনী করুণাময়ী জাহ্নবীর প্রতি চাহিলাম—দুই নয়নের মধ্যে বরবা সাত্য দিয়া উঠিল—দেখিতে দেখিতে কল্পনার বন্যায় বুক পূরিয়া গেল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, ফিরিয়া গিয়া নয়নের আনন্দ স্বরূপ, স্নেহের উৎস, কোমলতার নির্ঝর খোকার মুখখানি দেখিয়া আসি, সেই নীলীরাগমাখা হাসিটুকু সোহাগের চুম্বনে ফুটাইয়া, বুকের মধ্যে হাসি ধরিয়া আনি, সেই আধ আধ মুরলীস্বরজড়িত বুলিগুলি একবার কান পাতিয়া শুনিয়া আসি। বাসনা মনে মনে রহিয়া গেল। নয়ন মুদিয়া স্মৃতির প্রতি চাহিলাম, নবীনতার বর্ণে চিত্রগুলি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

বেলা ৪৷৷০ ঘটিকার সময় রাণাঘাটের station-এর সন্নিহিত জনৈক মিষ্টান্নের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতার দোকানে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। দোকানখানি পর্ণশালা—একখানি কাষ্ঠের চারিপায়ের উপর ক্ষুধা দৈত্যের হাহাকার-

নিবারণী দ্রব্যাদি লইয়া দোকানী বসিয়া রহিয়াছে, দোকানীর বসিতে দিবার অনুজ্ঞা না পাইয়াও, আত্মউদারতার গুণে আসন গ্রহণ করিলাম। ক্রমে তামাক আসিল। ক্ষুদিরাম ক্ষিপ্রহস্তে, কড়িবাঁধা, স্বরমুরবিহীন ডাবা হুকার মাথায় অনলহৃদয় মৃন্ময় ধুতুরা-সুন্দরীকে স্থাপন করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল, অনুরাগের হস্তে আমি সুন্দরীকে স্পর্শ করিলাম—কলিকার উপর ফুঁ দিতেছি এমন সময়ে Venus রূপিনী হুক্কা-সুন্দরী আমাকে Adonis মনে করিয়া বলিয়া উঠিল—

Thou-flint hearted boy,

'Tis but a kiss I beg, why art thou coy ?

আমি কায়মনোঃবাক্যে নিশ্বাস প্রশ্বাসে ধীরে ধীরে যত্নের সহিত অনুরোধ রক্ষা করিলাম। ধূমরাশি হতাশের আশার ন্যায় কামপরায়ণ জনের প্রণয়ের ন্যায়, সন্ধ্যার মনোমুগ্ধকরী শোভার ন্যায়, চতুষ্পার্শ্বে প্রকাশিত হইয়া শূন্যতার বুকে মিলিয়া গেল।

এটি উটি খুটিনাটি ভেবে, দুই একজন আগন্তুকের সহিত গল্প করে, দ্রব্যাদির উপর খরদৃষ্টি রেখে সময়টাকে kill কল্লেম মাত্র। রাত্রি ৯টার সময় Station platformএর উপর বেড়াইতে গেলাম। সেখানে বিদেশে গমনোন্মুখ অনেকগুলি লোক দেখিলাম, আর দেখিলাম একটা Bull-necked, long-faced জনবুল platform এর উপর পায়চারি করিতেছে। যতটুকু মনোযোগের সহিত আমি অন্যান্য লোকদিগের প্রতি চাহিয়াছিলাম, জনবুলটা ঠিক সেইরূপ ভাবের দৃষ্টি আমার প্রতি রাখিয়াছিল, অর্থাৎ সেই রাগরঞ্জিত দৃষ্টিচুম্বকে এ লৌহ প্রতিম আকৃষ্ট হয় নাই। সেও বেড়াইতেছিল, আমিও বেড়াইতেছিলাম—তাহার মুখনিঃসৃত রসের গন্ধকে যদি উপভোগ বল, তাহা হইলে সে রসে গোবিন্দদাস বঞ্চিত হয় নাই। সাহেবের সহিত আমি কোন তর্ক বিতর্ক করি নি,—আর্য্য জাতির মহত্ব জলদগম্ভীরে তাহার কর্ণে ঘোষণা করি নাই বলিয়া তুমি হয় তো আমার তেজঃহীনতার ব্যাখ্যা ডিমসথিনিসের ভাষায় বর্ণনা করিবে। রাম লক্ষ্মণ ভীম অর্জ্জুনের উপর বীরত্বের দাবি রাখিয়া আমরা মহাবীর—আমরা কোন অংশেই ছোট নহি—যেহেতু আমরা আর্য্য!

পরে যথা সময়ে গাড়িতে চাপা। অনন্তর নিদ্রা।—চক্ষু খুলিবামাত্র প্রভাতের আলো।

আসামযাত্রীর পত্র।

প্রভাতে পদ্মার ধারে আসিয়া বসিলাম। অনেক দিন হইতে পদ্ম দেখিবার ইচ্ছা ছিল। বর্ষার পদ্মা তরঙ্গিনী, বেগবতী, প্রফুল্লতায় পুষ্টকলে বরপূর্ণ—হর্ষের সহিত হাসির মিলনের ন্যায় বিকসিত যৌবনের সহিত অনন্তরূপ মিশিয়াছে। অনন্ত প্রেম অনন্ত সৌন্দর্য্যের সহিত মিলিয়াছে। লহরীবালাগুলি প্রভাত রবির মধুর কিরণ স্পর্শ করিয়া করুণাময়ী তটিনীর বিশাল বক্ষে খেলা করিতেছে। লহরীর সহিত লহরীর মিলন কি মনোহর—স্নেহের আলিঙ্গনে দুটি জড়াজড়ি করিয়া এক হইয়া যাইতেছে—আবার একটির সহিত মিলিতেছে—আবার মিশিতেছে—দেহের পরিবর্ত্তন নাই। এ লহরী রাজ্যে ঈর্ষা নাই—দ্বেষ নাই—বৈরিভাব নাই, এ প্রেমের প্রতিযোগী নাই—এ প্রেম আবদ্ধ নহে।

পৃথিবীর নিদাঘ তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া তরু লতার শ্যামলতা বাড়াইয়া মৃত্তিকাকে উর্ব্বরা করিয়া নদী ছুটিতেছে নদীর হৃদয় অনন্ত প্রেমেপূর্ণ, ইহাতে অন্যের উপর উপেক্ষা নাই। আমরা প্রেমভ্রমে স্বার্থকে বুকে ধারণ করিয়া উপভোগের নিমিত্ত অধীর হই—ক্ষুদ্রতাকে মহত্ব বলিয়া কল্পনা করিয়া লই—কিন্তু 'নাহি হেথা ক্ষুদ্র কথা—ক্ষুদ্র কানাকানি'—এখানে আসিলে নদীর সহিত এক হইয়া যাইতে ইচ্ছা করে। মানুষের ক্ষুদ্রতা বর্ষানদীর উদারতা দর্শনে আত্মঘাতিনী হয় না কেন? ভালবাসিতে শিক্ষা করিতে হইলে—এই নদী-সৈকতে বসিয়া শান্তিময়ী মহামেলার প্রতি চাহিতে হয়। এই কল কল তানের সহিত তান মিশাইয়া সমীরণ ছুটিতেছে—আগে ভাগে সিন্ধুকে তরঙ্গিনীর যৌবন বিকাশের সংবাদ দিবে বলিয়া,—সমীরণ চঞ্চল, নদীও চঞ্চল, কিন্তু এ চাঞ্চল্যে অধীরতা নাই—চাঞ্চল্যতা গাম্ভীর্য্যের মধ্যে আবদ্ধ।

৯ ঘটিকার সময় ষ্টিমারে উঠিলাম। এখানে ৪।৫ জন পরিচিত বন্ধুর সহিত দেখা হইল। ইহাঁরাও ডিব্রুগড়ে আসিতেছিলেন। সঙ্গ পাইয়া মনের মধ্যে বড়ই আনন্দ হইল। মঙ্গলবার প্রাতে ধুবড়ী পৌঁছিলাম। সঙ্গে যাহা মিষ্টান্ন লইয়াছিলাম—রবিবারেই তাহার যবনিকা পতিত হইয়াছিল—সোমবারে জলসংযোগে দধি দুগ্ধ বিহীন চিপিটক ভক্ষণ করিয়া দেহ রক্ষণ করিয়াছিলাম—যেহেতু আর্য্য লক্ষ্মণ ফল ভক্ষণে অসাধারণ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন—আর্য্য আমরা চিড়ার ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিলে কলঙ্ক রটিবে। দেখ ভাই! কেমন অনুপ্রাসের ছটা। ভাষাটা নবজীবনের

সম্পাদক অথবা "গুরু হৈতে বড়" সেই শিষ্যপ্রবর মালঞ্চ-সম্পাদকের ন্যায় হইয়াও হইল না।

পদ্মার সহিত ব্রহ্মপুত্রের মিলনের সন্ধিস্থল কোথায় তাহা বলিতে পারি না। ফলতঃ মঙ্গলবারে প্রাতে ধুবড়ীর ঘাটে স্নান করিলাম। ব্রহ্মপুত্রের জল বর্ষাকালে ভাগীরথীর ন্যায় আবিল বা পঙ্কিল নহে। এমন শীতল—এমন স্নিগ্ধ জল, কখন জীবনে স্পর্শ করি নাই। অবগাহনান্তে কি যে স্বর্গীয় স্বসংবেদ্য সুখে দেহ পূর্ণ হইল—তাহা ভাষায় প্রকাশ মানুষের অসাধ্য—দুঃখের ভাষা আছে—সুখের ভাষা কোথায়? এই স্থানের দৃশ্য অতি সুন্দর। হিমালয়ের দিগন্তবিস্তৃত শাখাশ্রেণী নবীন নীরদের মুকুট উত্তমাঙ্গের উপর স্থাপন করিয়া অবিচলভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—অতি উজ্জ্বল তরুণ অরুণ করদীপ্ত শুভ্র শুভ্র মেঘমালা শ্যামন্তক মণিরাজির ন্যায় গিরি হৃদয়ে ঝলিতেছে। ধুবড়ী হইতে আসামের আরম্ভ। আসাম প্রকৃতির রঙ্গভূমি। তরুলতা গুল্মের প্রতি অঙ্গ স্বাস্থ্যে পূর্ণ। এমন পাখির কূজন, মৃদু বায়ু স্পর্শে পাদপ রাজির বিকম্পন জীবনে কখন দেখি নাই। প্রকৃতি চিত্রপটে সৌন্দর্য্যের ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছেন। ইহার প্রত্যেক ছবি কবিতা। হাসির উষালোকে এ স্থান পূর্ণ। হেথায় হাসি আছে অধর নাই, কটাক্ষ আছে নয়ন নাই, প্রসন্নতা আছে বদন নাই, সৌকুমার্য্য আছে দেহ নাই, অথচ ইহার সকলই দেহ সকলই নয়ন—সসীমতার মধ্যে অসীমতা আবদ্ধ।

> The rounded world is fair to see
> Nine times folded in mystery
> Though baffled in seers cannot impart,
> The secret of its labouring heart
> Throb thine with Nature's throbbing breast—
> And all is clear from east to west—

এখানে মলিনতার নাম নাই—সকল স্থান পবিত্রতায় পূর্ণ, ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িয়া যে ধর্ম্মের উদ্রেক না হয়, এ দৃশ্য দেখিয়া মন স্রষ্টার নিমিত্ত তদপেক্ষা ধর্ম্মভাবে লীন হয়। প্রকৃতির মমতাময়ী বাণী কর্ণবিবরের মধ্য দিয়া মর্ম্ম স্পর্শ করে। প্রেম-বিচলিত প্রাণ মা মা বলিয়া প্রকৃতিকে ডাকিয়া উঠে। কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির দেখিয়াছিলাম, আগ্রার তাজ দেখিয়াছিলাম, কিন্তু এমন মহত্ত্ব-ব্যঞ্জক দৃশ্য কোথাও দেখি নাই।

আহারান্তে প্রকৃতির শোভা দেখিতে দেখিতে জলযানে চলিতে আরম্ভ করিলাম। একজন astronomer এক সময়ে বলিয়াছিলেন—'Give us matter and a light motion and we will construct the Universe" কালেজে বসিয়া অধ্যাপকের নিকট ঐ কথা শুনিলে—দাম্ভিক দার্শনিকের উপর শ্রদ্ধা বাড়িতে পারে, কিন্তু প্রকৃতির কোলে বসিয়া ঐ বাক্যের স্মরণে লোকটার প্রতি অশ্রদ্ধা বাড়িতে থাকে। এ স্থান সুরে—সৌন্দর্য্যে বাঁধা। Romanceএর সঙ্গে Realityর এমন সমন্বয় কোথায়ও নাই।

এখানকার station গুলির নাম নূতন রকম—যথা, ডিকোমুখ, ডিহিমুখ ডিসাংমুখ—ডিব্রুগড় ইত্যাদি। ব্রহ্মপুত্রে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়াছি, সেটি প্রকাশ না করিলে পত্রখানি অক্ষুণ্ণ হইবে না। প্রদোষে মৃদু মন্দ বায়ু বহিতেছিল, নানাবর্ণের মেঘে পশ্চিমের আকাশ ভূষিত। প্রদোষের প্রতিকৃতি নদীবক্ষে পতিত হওয়ায়—নদী আনন্দে পুলকিতা। বুকের ভিতর প্রিয় বস্তুকে যে এমন করিয়া স্থাপন করিতে পারে, তাহার আনন্দ স্বাভাবিক। যৌবন কুসুমে ভূষিত চারিটি আসামী রমণী সমকণ্ঠে বিরহের গান গাহিতে গাহিতে বহিত্র বহিয়া চলিয়াছে—ইহারা পুরুষ মাঝি গ্রহণ করে না। যাহা দেখিলাম তাহা স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইল।

দামোদর দাদা বড় নামজাদা নবেলিষ্ট। যদি ইচ্ছা কর, কালে নবেল লিখিয়া তুমিও একজন কেষ্টবেষ্ট হইতে পার। বাঙ্গালীর নবেল লেখা বড় সোজা। আসামী রমণীকে নায়িকা করিয়া একখানি যদি পুস্তক লেখ তাহা হইলে আমি তোমাকে materials দিতে পারি।

আমাদের দেশে ঘোড়ায় গাড়ি টানে এখানে বড় বড় কাঠ বহিবার নিমিত্ত গাড়িতে হাতি যোতা হয়। আমরা এখানে চা গাছের দাঁতন করি—তিক্ততা বিহীন উচ্ছে খাই। বঙ্গের উচ্ছে—ভট্টাচার্য্যমহাশয়েরা এখানে আসিলে, তাহাদিগের তিক্ততা অপনীত হইবার সম্ভাবনা আছে।

কবিতার মাঝারে আমার
আয় রে চাঁদের আলো আয়,
অবসন্না লেখনী সুন্দরী
ফুল বনে ঘুমাইতে চায়।

আজ এই পর্য্যন্ত। শ্রীবংশীবদন গোস্বামী।

সমাজ সংস্কারের এক পৃষ্ঠা।

স্থান—লতামণ্ডবেষ্টিত কুঞ্জকানন। সময়—গাঢাকা বেলা।

নব বরবধু পরস্পর সম্মুখীন ভাবে আসীন।

বর। প্রিয়ে।

বধূ। নাথ।

বর। মূর্খ হিন্দুগুলার বিবাহ প্রণালী কি কুৎসিৎ—

বধূ। ভয়ানক। ভয়ানক। তাহা মনে হলেও নাক্কার আসে। উঃ কি দুর্গন্ধ। Hellish।

বর। ভাগ্যে সে নরকের হাত হইতে উদ্ধার হইতে পারিয়াছিলাম, তাই তো আজ তোমা হেন ধন লাভ করিতে পারিযাছি।

বধূ। আচ্ছা, হিন্দুশাস্ত্রে না'কি Intermarriage একেবারে নিষিদ্ধ?

বর। Downright lie। যে বলে সে শাস্ত্রের 'শ' কি তা জানে না। শাস্ত্রে স্পষ্ট বচন আছে—

"যার সঙ্গে যার মজে মন,
কিবা হাড়ি কিবা ডোম।"

কেন, তুমি কি এ সকল উদারমত অধ্যয়ন কর নাই, না আমাকে পরীক্ষা করিতেছ?

বধূ। (ঈষদ্ধাস্যে) প্রিয়তম, যথার্থই আমি তোমাকে পরীক্ষা করিতেছিলাম, এ পরীক্ষায় তোমার সম্পূর্ণ জয়।

বর। যখন তোমা হেন বিজয়লক্ষ্মীকে লাভ করেছি, তখন আর জয়ের বাকি কি?

বধূ। যাক, এখন, কি রকম বাসা ভাড়া লইবে স্থির করিয়াছ, বল দেখি।

বর। তুমিই বল না কি হলে ভাল হয়।

বধূ। কেন, বেশ ঝর্ ঝরে পরিস্কার দক্ষিণখোলা একটী বাড়ী। উপরে একটী ঘর শোবার আর একটী লাইব্রেরী আর একটী ড্রয়িং রুম হলে ভাল হয়, তা না হয় দুইই এক ঘরে চলিবে, আর একটী কাপড় চোপড় রাখিবার—যাহাকে টয়েলেট রুম বলে। তাহার লাগাও একটী ছোট্‌টো কামরা গোশলখানার জন্য, তার একটু অন্তরেই পায়খানা। বাবুর্চিখানা আর চাকর বাকরেরা নীচে থাকিবে। আর—

বর। (রুদ্ধশ্বাসে) আর কি ?

বধূ। এত গেল আমাদের দুজনের জন্য, এ ছাড়া একটু তফাতে উপরে আর একটি ঘর চাই, সেখানে মা থাকিবেন।

বর। তা—তা, তিনি যখন আমাদিগকে দয়া করে আমাদিকে দেখিতে আসিবেন অবশ্যই তখন একটা স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিব।

বধূ। সে কি। দেখিতে আসিবেন কি ? মা যে আমাদের সঙ্গেই থাকিবেন।

বর। তা—তা—তা—

বধূ। আর জানইতো মাসির আর কেউ নাই, তিনি আমাদের সংসারেই থাকেন, কাজেই তাঁর জন্যও আর একটি ঘরের দরকার।

বর। মাসি। মাসি থাকিবেন।

বধূ। থাকিবেন বৈ কি। মাসিকে আমি বরাবর বলে এসেছি যে আমার বিয়ে হলেই তাঁকে আমার সঙ্গে থাকিতে হবে। মাসিও রাজি আছেন। আর—

বর। আর—আর কি ?

বধূ। আর বলিতেছিলাম কি ঠাকুমা ঠাকুরদাদা তো বুড়ো হইয়াছেন, যখন সকলেই চলিয়া আসিবে, তখন তাহাদের কে সেবা শুশ্রূষা করিবে ? প্রাণেশ্বর। যারা তোমার প্রণয়িণীকে বাল্যকাল হইতে এত করিয়া মানুষ করিয়াছে, তাহাদিগকে কি এ অবস্থায় ফেলিয়া আসা উচিত ?

বর। না—না,—তা—

বধূ। তা, তুমি তো অবুঝ নও অবশ্য তাহাদের জন্য আর একটী ঘর লইবে। তার পর, ছোট বোনটী, সে আমার বড় ন্যাওটো, তাকে ফেলিয়া আমি কখনই থাকিতে পারিব না, তার জন্যও যা হয় বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

বর। উঁ।—

বধূ। বস্, এই হলেই হলো। তবে বাকি এক ভাই আর ভাজ। ভাজটি ছেলেমানুষ, ভাইয়ের ও কিছু তেমন বেশী বয়স হয় নাই; তারা কাছে না থাকিলে মাই বা স্থির হইয়া কেমন করিয়া থাকেন। তা, এত যদি হয়, তাদের জন্য একটা ঘর বেশী নিতে কি আর পারিবে না।

বর। হুঁ।—কিন্তু—

বধূ। কিন্তু কি ?

বর। খরচ জোগাবে কে ?

বধূ। কেন, তুমি।

বর। কোথায় পাব ?

বধূ। সে খবর আমি কি জানি

বর। তোমার ভাইটাই আর ব্যবসা চালাবে না।

বধূ। (উত্তেজিত ভাবে) ব্যবসা! আবার ধোপার ব্যবসা! তবে আমি ধোপানি হইয়া তোমায় বিবাহ করিলাম কেন ?

বর। ভাল কর নাই, আমি কুলীন ব্রাহ্মণ, অবশ্যই তুমি পতিতা হয়েছ।

বধূ। বাজে কথা থাক, এখন আসল কথা যাহা বলিলাম তাহার কি বল;

বর। আমার বাবার ক্ষমতায়ও অত হবে না।

বধূ। হবে না।

বর। না।

বধূ। প্রিয়তম, একি ঠাট্টা করিতেছ ?

বর। ঠাট্টা নহে, স্বরূপ বলিতেছি।

বধূ। তবে কি আমাকে কোর্টের আশ্রয় লইতে হইবে ?

বর। কোর্ট। সে কি ?

বধূ। সে কি, আপনি এত বড় সংস্কারক হইয়া তাহা কি জানেন না। বিবাহ সংস্কারের ইহাই যে প্রধান অঙ্গ। আপনি অকৃতি স্বামী, আপনার সহিত আমার বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে। (প্রস্থানোদ্যম।)

বর। প্রিয়ে—প্রিয়ে—

বধূ। আপনার নামে আর একটী মোকদ্দামা আনিব, আপনি আমাকে "প্রিয়ে" সম্বোধন করিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়াও তাহা করিয়া আমার মানহানি করিলেন। D—d rogue of a husband! [বেগে প্রস্থান।

বর। ওঃ! [শাখাবলম্বনে অবস্থিতি।]

(দূর হইতে জনৈক বন্ধু অবলোকনানন্তর)

বন্ধু। ভায়াহে, আর তলায় কেন, এইবার ডালের উপর চড়িয়া ব'সো।

অভিনয় সমালোচনা।

বাঙ্গালা সাহিত্যের সঙ্গে বঙ্গীয় রঙ্গভূমির-সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমরা আজ বর্ত্তমান অভিনয় সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব। বিগত ২০।২২ বৎসরের মধ্যে দেশীয় রঙ্গভূমির যে আশাতীত উন্নতি হইয়াছে, একথা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। কি দৃশ্যপটে, কি পরিচ্ছদে, কি অভিনয়ে, কি অভিনয়গৃহ শোভায় সকল বিষয়েই আশাতীত উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু উন্নতি হয় নাই কেবল এক বিষয়ে। আমাদের রঙ্গভূমি যদি এই সকল বাহ্যিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উৎকৃষ্ট নাটকাদির জন্ম দিতে পারিত, তাহা হইলে আমাদের আনন্দের সীমা থাকিত না। রঙ্গভূমির জন্ম দিন হইতে যদি স্বত্বাধীকারীদিগের এত দিকে দৃষ্টি থাকিত, তাহা হইলে আমোদের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা সাহিত্যেরও অনেক উন্নতি আমরা দেখিতে পাইতাম। আমাদের মতে কেবলমাত্র রঙ্গভূমির অভিনেতারা যদি নাটক না লিখিয়া অভিনয়ের উৎকর্ষতায় বেশী মনোনিবেশ করেন, এবং উপযুক্ত নাটকারদিগকে উৎসাহ দেন, তাহা হইলে আমরা নাটকের দিন দিন উন্নতি দেখিতে পাই। স্বীকার করি, গিরিশ বাবু একজন ভাল নাটক লেখক, কিন্তু এই গিরিশ বাবু যদি কোন একটি রঙ্গভূমি একচেটিয়া করিয়া বসেন, তবে তাঁহার সকল নাটকই সেই রঙ্গভূমিতে অভিনয় হইবে, কিন্তু তাঁহার সকল নাটকই যে অভিনয়যোগ্য এ কথা কে বলিতে পারে?

কলিকাতায় প্রধানতঃ এখন চারিটী রঙ্গভূমি চলিতেছে। অদ্যকার এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবে আমরা ইহাদের সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব।

ষ্টার থিয়েটর। এই সম্প্রদায়ে অনেকগুলি সুদক্ষ অভিনেতা আছেন, ইহাঁদের অভিনয়ের খ্যাতি ও বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। কিছু দিন হইল, ইহাঁরা সুপ্রসিদ্ধ স্বর্ণলতা" উপন্যাসের অন্তর্গত সরলা চরিত্র লইয়া একখানি উৎকৃষ্ট গার্হস্থ নাটক প্রণয়ন করিয়া অভিনয় করিতেছেন। যিনি এই সরলাকে নাটকারে আনিয়াছেন, তিনি একজন উপযুক্ত নাটককার এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। সরলা অভিনয়ে আমরা সুখী হইয়াছি। সরলা অভিনয়ের একটা স্রোত ফিরাইয়াছে। আর ইহার part distributions দেখিয়া আমরা ম্যানেজারকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। তবে "সরলা" আরো কত দিন চলিবে?

রঙ্গ রঙ্গভূমি। আমরা এই রঙ্গভূমির দিন দিন উন্নতি দেখিয়া সুখী হইয়াছি। "প্রহ্লাদ চরিত্র" "প্রভাস মিলন" "নন্দবিদায়" ও "পরীক্ষীতের ব্রহ্মশাপ" এই তিন চারি খানি নাটক ইহারা বিলক্ষণ দক্ষতার সহিত অভিনয় করিয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। দৃশ্যপট ও পরিচ্ছদাদিও এখন উন্নতি লাভ করিয়াছে। সম্প্রতি সবলার অনুরূপ "শৈলজা" নামক একখানি সাংসারিক ঘটনামূলকনাটক ইহাঁরা অভিনয় করিতেছেন, তবে শৈলজা-লেখক সকল স্থানে নাটকের art বজায় রাখিতে পারেন নাই।

এমারেল্ড থিয়েটর। কলিকাতার একজন প্রধান ধনী ইহার স্বত্বাধিকারী, সুতরাং এত রঙ্গভূমি স্থাপনের সময় সাধারণে যেরূপ উচ্চ আশা করিয়াছিল, সে আশানুরূপ ফল সাধারণে পায় নাই, সেই কারণ প্রথমে ইহার উন্নতির পথে কণ্টকটা বাধা পড়িয়াছিল। ইহার বর্তমান ম্যানেজার ও ষ্টেজম্যানেজারের যত্নে ও অধ্যবসায় ইহার দিন দিন উন্নতি হইতে দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। "নন্দবিদায়" "বিবাদ" ও "আনন্দকুমার" সুন্দররূপে অভিনয় চলিতেছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসার বিষয় ইহার দৃশ্যপট ও পরিচ্ছদাদি। এ পর্য্যন্ত কোন রঙ্গভূমি এই বিষয়ে ইহার সমকক্ষ হইতে পারে নাই।

বীণারঙ্গভূমি। যে উদ্দেশে এই রঙ্গভূমি স্থাপন করা হয়, সে উদ্দেশ্য ইহার দ্বারা সুসিদ্ধ হয় নাই। তাহার পর ইহার "নিউ ন্যাসেন্যাল থিয়েটার" নামকরণ করিয়া একজন উপযুক্ত লোক ইহার কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই তিনিও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইহার প্রথম নূতন নাটক "দাদা ও আমি"। ইহা সামাজিক নাটক হইলেও সম্পূর্ণ সমাজ-বিরুদ্ধ ও রুচিবিরুদ্ধ। ইহার দ্বিতীয় নূতন নাটক "হিরণ্ময়ী।" হিরণ্ময়ীতে কিছুই নাটকত্ব নাই। সুতরাং এরূপ প্রতিযোগিতার মধ্যে এরূপ নিকৃষ্ট নাটক লইয়া কিরূপে রঙ্গভূমি চলিতে পারে?

আমরা সকল রঙ্গভূমির ম্যানেজারদিগের নিকট এই বিনীত প্রার্থনা করিতেছি যে, তাহারা কেবল অর্থোপার্জ্জন উদ্দেশ্য না করিয়া রঙ্গভূমির অন্য যে একটী মহৎ উদ্দেশ্য আছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, এবং সে উদ্দেশ্য কতদূর সিদ্ধ হইতেছে, সে জমাখরচটাও একবার মিলাইয়া দেখিবেন। আজ এই পর্য্যন্তই ভাল। বারান্তরে প্রত্যেক অভিনয়ের বিস্তারিত সমালোচনার ইচ্ছা রহিল।

বংশাবলি

চতুর্থ প্রস্তাব।

সপ্তশতী ব্রাহ্মণদিগের বিষয় অনুশীলন না করিলে, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রের বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকে, একারণ তদ্বৃত্তান্ত বর্ণিত হইতেছে।

"ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির গৌড়দেশ হইতে রাঢ়দেশে গিয়া বসতি করার প্রতি কাহারই আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু বারেন্দ্র কুলজ্ঞেরা যে কারণ দেন, তাহা সত্য কি মিথ্যা নির্ণয় করিবার অন্য উপায় নাই। উক্ত [illegible] স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে, কিন্তু আনু-[illegible]ক্তির উপর নির্ভর করিয়া প্রস্তাব বাহুল্য করা নিষ্প্রয়োজন। [illegible]সিক ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে জানা যায়, হয় ভট্টনারায়ণাদি নয় তাঁহাদের পুত্রগণ কর্তৃক সপ্তশতী কন্যা গ্রহণ করা উপলব্ধি হয় রাঢ়ীয় কুলে যে উনষষ্ঠি গাঁই দেখা যায়, সেই ৫৯ গ্রামী ব্রাহ্মণেরা ভট্টনারায়ণাদি বিপ্র পঞ্চকের সন্তান। এই ৫৯ জন ব্রাহ্মণ হইতেই রাঢ়ীয় বংশ বিস্তার আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দেন, তাঁহারা ঐ ৫৯ জনের মধ্যে কোন এক জনের বংশে জাত বলিয়া অবশ্যই পরিচয় দিবেন। ৫৯ সন্তানের বিবাহ নিমিত্ত ৫৯ কন্যার প্রয়োজন সমুদয়ে ৫ জন ব্রাহ্মণের ১১৮ সন্তান সন্ততি হওয়া স্বীকার করিতে হইবেক, কিন্তু বহুবিবাহ ব্যতীত এরূপ বংশ বিস্তার সম্ভবে না। যদি ৫ জন, ৫ স্ত্রীতে ১১৮ সন্তান সন্ততি জন্মান, তাহা হইলে গড়ে ২৩ জন সন্তানেরও অধিক জন্মে; তদ্রূপ বহুসংখ্যক সন্তানোৎপত্তি অসম্ভব। যদি ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি বহুবিবাহ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে রাঢ়দেশবাসী সপ্তশতী কন্যা ভিন্ন আর কন্যা কোথায় পাইলেন? আর যদি ভট্টনারায়ণাদির কেবল ৫৯টি পুত্র সন্তান হওয়াই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সেই ৫৯ পুত্রেরা সপ্তশতী কন্যা ভিন্ন বিবাহ নিমিত্ত কন্যা কোথায় পাইয়াছিলেন? বল্লালসেন যখন শ্রেণী বিভাগ করেন, তখন রাঢ়দেশে ৭৫০ এবং বারেন্দ্রে ৩৫০ জন ব্রাহ্মণ পাইয়াছিলেন। যদি ভট্টনারায়ণ-প্রমুখ বিপ্র-পঞ্চক অথবা তাঁহাদের সন্তানেরা সপ্তশতী কন্যা গ্রহণ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এত অল্প সময়ে এতাদৃশ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া সম্ভবপর বলা যাইতে পারে না; বল্লালের

সভাতে যখন ৫৯ গাঁই ব্রাহ্মণেরা উপস্থিত হন, তখন তাঁহাদের সহিত দেশীয় অর্থাৎ সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরাও উপস্থিত হইয়াছিলেন (১৯)। শিবাচার্য্য সপ্তশতী মুলুকজুড়ি কন্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাগরদিয়ার বন্দ্যগণও সপ্তশতী ভাবাপন্ন (২০)। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা সপ্তশতী কন্যা গ্রহণ করা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অনেক সপ্তশতী ব্রাহ্মণ, রাঢ়ীয়কুলে প্রবেশ করিয়াছেন, অদ্যাপি তাঁহাদিগকে চেনা যায়। যদি বারেন্দ্র দেশে সপ্তশতীর নিবাস থাকিত, তাহা হইলে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরাও সপ্তশতী কন্যা গ্রহণ করিতে ক্ষান্ত থাকিতেন না। বারেন্দ্র কুলজ্ঞেরা অবশেষে সমুদয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকে সপ্তশতী দৌহিত্র কহেন, তাহা অত্যুক্তি বলিয়া স্বীকার করিলেও, কিয়ৎ পরিমাণে সপ্তশতী-দৌহিত্র. [illegible] যে দলে আছেন, তৎপ্রতি আপত্তি হইতে পারে না।"—[গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ৭৪—৭৬ পৃষ্ঠায়।]

উক্ত গ্রন্থকর্ত্তার যুক্তি সারবতী নয়, উহা ইতিহাসের বিরোধিনী। "সম্বন্ধ-নির্ণয়" পুস্তকে যাহা লিখিত আছে, প্রথমতঃ তাহা আলোচিত হইলেই, অনেক মত খণ্ডিত হইয়া যাইবে। অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, পশ্চাৎ বিচার করা যাইবে।

"আদিশূরের আনীত কান্যকুব্জস্থ ব্রাহ্মণ-পঞ্চকের আগমনের পূর্ব্বে এদেশে যে সকল ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহাদিগের সংখ্যা সমস্ত বাঙ্গালায় সাড়ে সাত শত মাত্র ছিল। তাঁহারা কালক্রমে সাতশতী নাম প্রাপ্ত হন। ঐ সকল ব্রাহ্মণ চত্বারিংশৎ ৪০ পৃথক্ গ্রামীণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন; তাঁহাদিগকে আদর্শ করিয়া কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের সন্তানগণকে পৃথক্ পৃথক্ গ্রাম দেওয়া হয়। উত্তর কালে ঐ সকল নিবাস গ্রাম অনুসারে ইহাঁদিগের অধস্তন সন্তানবর্গও পৃথক্ পৃথক্ গ্রামীণ বলিয়া পরিচিত হন।

"সাতশতী ব্রাহ্মণগণ যে, কান্যকুব্জদিগের মত বিভিন্ন গাঁই ছিলেন, তাহার বিষয় দেখ।

---

(১৯) 'আহূয় রাজা সং দেশীর্বৈপ্রৈঃ কোন-মণ্ডিতসবর্গান্।"—[কুলরাম।

(২০) "সপ্তশতী-ভাবাপন্ন সাগর হইতে।
চারি মেলের নিস্তার দেখ কুলজিতে॥
শুদ্ধ হইতে অতি শুদ্ধ সপ্তশতী ভাব।
যাহা হইতে মেল-কুল হইল স্বভাব॥ —[সাগর প্রকাশ।]

"যে সাতশতীরা পূর্ব্বে এ দেশের অধিবাসী ছিলেন, তাঁহারা কোথায় গেলেন, কি হইলেন, তাহার নির্ণয়ে আমাদিগের কোন কোন সহৃদয় ও বিবেচক পাঠক বলেন, সাতশতীরা বৈদিক-ব্রাহ্মণগণ-মধ্যে অধিকাংশ অন্তর্ভাব হইয়া গিয়াছেন কি না, তাহা সন্দেহ-স্থল। তাঁহাদিগের সেই সন্দেহ ভঞ্জন ও অন্যান্য পাঠকের কৌতূহল-চরিতার্থের জন্য সাতশতীর সমস্ত বিবরণ লিখিত হইল। পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখুন।

"প্রথমতঃ পূর্ব্বকালে ইহাঁরাও রাঢ়ী ও বারেন্দ্রদিগের ন্যায় নৃপতিবর্গের নিকট নিজ নিজ বাসস্থল জন্য আপন আপন আভিজাত্যের চিহ্ন-স্বরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিই, পৃথক্ পৃথক্ গ্রাম পাইয়াছিলেন। প্রমাণ—

"সাগাঁই সুগাঁই নালসী জগাই হাটুরী কাটুরী ধাঁই।
কান্দড়ে বাটালী বন্যা পিতুণ্ডী বাগণ্ডী পিপাড়ী সাঁই॥
উল্লুক ধনধর মুল্লুক ফরফর বিশেষে শুনহ গাঁই॥

"বৈদিকদিগের মধ্যে ৪২টি গোত্র প্রচলিত আছে। তদনুসারে ইহাঁরা দ্বিচত্বারিংশৎ পৃথক্ পৃথক্ বংশে বিভক্ত। সাতশতী ব্রাহ্মণগণও চল্লিশটি পৃথক্ গ্রামীণ (গাঁই) বলিয়া বিভক্ত ছিলেন। প্রত্যেকের গোত্র পৃথক্ অর্থাৎ সাতশতীগণের প্রত্যেক গাঁই পৃথক্ পৃথক্ গোত্র-সম্ভূত।

"বৈদিকদিগের ৪২টি গোত্র। এই বিয়াল্লিশটির মধ্যে দুইটী ঘৃতকৌশিক ও জামদগ্ন্য এবং জামদগ্নি নামে পৃথক্বিধ অপর দুইটী গোত্র আছে। সাতশতীগণ-মধ্যে দুই ঘৃতকৌশিক ও জামদগ্ন্য প্রচলিত থাকে।

"বৈদিকগণ যখন বঙ্গে আসিয়া নিবাস গ্রহণ করিলেন এবং স্থল-বিশেষে রাঢ়ী ও বারেন্দ্রগণের নিকট সম্মানাস্পদ হইতে লাগিলেন, সেই সময়ে সুযোগ বুঝিয়া, সাতশতীগণ আপনাদিগের গাঁই ত্যাগ করিয়া বৈদিকদিগের মত নির্গাঁই বলিয়া আপনাদিগকে বৈদিক সংজ্ঞায় পরিচয় দিতে লাগিলেন। এই রূপে অধিকাংশ সাতশতী বৈদিককুলে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছেন। নতুবা বৈদিকদিগের মধ্যে যাঁহারা বিশিষ্ট বেদপারগ, তাঁহারা কেন দল-বলে ব্রহ্মপুত্রাদি প্রাচ্য দেশে নিবাস গ্রহণ করিবেন ?

"যখন এদেশে রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক প্রভৃতি ঔপনিবেশিক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণগণের সন্তান-সমূহ প্রকৃত-রূপে বদ্ধমূল হইলেন, তখনই এদেশের আদিম-নিবাসী ব্রাহ্মণগণের পৃথক সংজ্ঞা হয়। সমস্ত বাঙ্গালার ঐ

আদিম-নিবাসী ব্রাহ্মণগণের সংখ্যা সর্ব্বসমেত সাড়ে সাত শত ঘর ছিল বলিয়া তাঁহাদিগের সাতশতী আখ্যা হয়।

"আদিম নিবাসীরা যখন সাতশতী নাম প্রাপ্ত হইলেন তখন ইঁহারা এক প্রকার অপদার্থ-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন বলিলেও, বড় একটা দোষ হয় না। সে যাহাই হউক, তাঁহারা যখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহাদিগের সম্ভ্রম গিয়াছে, তদবধি তাঁহারা সাবধান হইতে লাগিলেন। সাবধানতা দেখাইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু আপনাদিগের দল-রক্ষার চেষ্টায় বিমুখ হইয়া, অন্য-দলে মিশিতে লাগিলেন এবং সাতশতী রূপ ঘৃণিত উপাধি পরিত্যাগ করেন। তদবধি সাতশতী ব্রাহ্মণের বংশ-ধ্বংসের সূত্রপাত হয়।" (২১)

সপ্তশতীর ৪০ চল্লিশ ভাগ এই, —

১ নগড়ি	২১ নালসী
২ দহড়ি	২২ সাঁগাই
৩ হামু	২৩ পুংসিক (রাঢ়ীর সহিত সাদৃশ্য)
৪ কাশ্যপ কাঞ্জিকা (বিশুদ্ধ সপ্তশতী)	২৪ ভট্টশালী (বারেন্দ্র সহিত সাদৃশ্য)
৫ বাপাড়ি	২৫ ফরফর ছত্রিকা (বিশুদ্ধ সপ্তশতী)
৬ তসিকা	২৬ আদিত্য (বারেন্দ্র)
৭ কেয়ুগাঁই	২৭ উজ্জ্বল গাঁই
৮ সুখদাসিক	২৮ সুরাই (রাঢ়ীয় সাদৃশ)
৯ পিত্তাড়ি ঐ	২৯ দীঘল (রাঢ়ীর সহিত সাদৃশ্য)
১০ বাগুড়ি	৩০ যবগ্রামী (বিশুদ্ধ সপ্তশতী)
১১ ভাদাড়ী (বৈদিক সদৃশ)	৩১ কড়ারী
১২ পিচু	৩২ কৌণ্ডিন্য (প্রসিদ্ধ সপ্তশতী)
১৩ কুলক	৩৩ বৈজুড়ী ,,
১৪ সাঁড়াকুলি	৩৪ কুড্যাল ,,
১৫ কোঁয়াড়ী (ঐ)	৩৫ হেলনী ,,
১৬ মূলুবজুড়ি (বিশুদ্ধ সপ্তশতী)	৩৬ ধার্মী ,,
১৭ হাঙ্গুড়ী	৩৭ ধাতাড়ী ,,
১৮ কাটানি (ঐ)	৩৮ বেলাড়ী ,,
১৯ কামদেব (বারেন্দ্র)	৩৯ করঞ্জ (বারেন্দ্র সহিত সাদৃশ্য)
২০ বেড়্‌গ্রামী	৪০ অম্বাড়ীরী

(২১) সম্বন্ধ নির্ণয় ১৭০—১৭৩ পৃষ্ঠা দেখ।

রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীর উৎপত্তি কোন কোন মতে এইরূপ,—

পঞ্চ ব্রাহ্মণ, আদিশূরের যজ্ঞ-সমাপনান্তে স্বদেশে প্রতিগমন করিলে পর, তদ্দেশস্থ ব্রাহ্মণগণ উক্ত দ্বিজপঞ্চকের সহিত আহার-ব্যবহারে অস্বীকৃত হন। তন্নিমিত্ত তাঁহারা ক্রোধান্ধ হইয়া রাজসমীপে দ্বিতীয় বার সমাগত হন। নরপাল, তাঁহাদিগকে ভূসম্পত্তি নিরূপিত করিয়া রাঢ় অঞ্চলে বসতি করিতে বলিলেন ও বঙ্গদেশস্থ পূর্ব্বাধিবাসী ব্রাহ্মণগণের পাঁচ সুলক্ষণা কন্যা বিবাহ দিলেন। কাল-সহকারে তাঁহাদের অনেক সন্তান-সন্ততি জন্মিল। পরে পাঞ্চাল দেশস্থ পূর্ব্ব-বিবাহিত পত্নীরা সন্তান-সমভিব্যাহারে গৌড়ে সমাগত হইলেন। রাজার আদেশে তাঁহাদের বাসস্থান বরেন্দ্রভূমে নির্দ্ধারিত হয়।

এই মত অবিসংবাদী নয়। ইহাতে কতিপয় আপত্তি ও সন্দেহ আছে।

(১) বঙ্গাগমন কালে ভট্টনারায়ণের বয়স ৭০ সপ্ততি। এই বয়ঃক্রমের পর বঙ্গদেশ-বিবাহিতা প্রেয়সীর ১৬ ষোল পুত্র জন্মান, সম্ভবপর বলিয়া বোধ করা সঙ্গত নয়।

(২) কান্যকুব্জোৎপন্ন তনয় ও তত্রত্য ভার্য্যারা কি কারণে প্রথমেই স্বামি-সঙ্গিনী হন নাই, এই সন্দেহ মনে হওয়া স্বাভাবিক।

(৩) যেরূপ বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে যাঁহারা বারেন্দ্রভূমে বাস করেন, তাঁহারা রাঢ়ীয় ভ্রাতৃবৃন্দ অপেক্ষা পবিত্র ; সুতরাং তাঁহাদের প্রাদুর্ভাব রাঢ়ীয় অপেক্ষা প্রবল নয় কেন ? তাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞানে কেন তাদৃশ সমীচীন নহেন ? তাঁহাদের প্রভুত্বই বা অল্প কেন ?

এই আপত্তি ও সংশয় গুলির খণ্ডন না করিলে, উল্লিখিত অভিপ্রায় গ্রহণীয় হইতে পারে না, এই জন্য সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মীমাংসা করিতে গেলে, আমাদের এইরূপ মনে হয় যে, প্রথমতঃ সকলেই রাঢ় প্রদেশে বসতি করিতেন, ভ্রাতৃবিরোধ বা জ্ঞাতিবৈর হেতু যাঁহারা পূর্ব্ব বাসস্থান করেন, তাঁহারাই বারেন্দ্রভূমের নিবাসী হইলেন। ইহার মধ্যে কাহারা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য।

রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের বংশ-বিবরণী তালিকা স্থানান্তরে প্রদত্ত হইল। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীর বর্ণনায় উভয়ের যে বৃত্তান্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহার একবাক্যতা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। শাণ্ডিল্য গোত্রীয়

বারেন্দ্রেরা, নারায়ণ ভট্টকে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বারেন্দ্রদের মূল ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করেন। "ভট্ট" বিদ্বান্ লোকের উপাধি। গৌরবাত্মক "ভট্ট" উপনাম, রাঢ়ীয় সম্প্রদায়ীরা নামের প্রথমে সংযুক্ত হইয়া থাকিলে, বারেন্দ্রগণ নামের শেষে উহা প্রযোগে করিযাছেন, বোধ হইতেছে। ভট্টনারায়ণ ও নারায়ণভট্ট যে এক ব্যক্তি, প্রস্তাবের প্রথমেই উক্ত আছে। যত দূর সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, বংশ-তালিকায় প্রদর্শিত হইল।

"গৌড়ে ব্রাহ্মণ" লেখক মহাশয়, "সম্বন্ধ নির্ণয়" পুস্তকের মীমাংসার অনুসরণ করিয়া যেরূপ সামঞ্জস্য-বিধানের উদ্যোগ করিয়াছেন, তাহা এই,—

কান্যকুব্জাগত বিপ্রগণের নাম	তাঁহাদের সন্তান-গণের নাম	রাঢ়ীয়শ্রেণীর মূল পুরুষ	বারেন্দ্রশ্রেণীর মূল পুরুষ
ক্ষিতীশ	ভট্টনারায়ণ, দামোদর	ভট্টনারায়ণ	দামোদর (২২) ও ভট্টনারায়ণ-পুত্র আদি গাঁই ওঝা
তিথিমেধা	শ্রীহর্ষ, গৌতম	শ্রীহর্ষ	গৌতম
বীতরাগ	দক্ষ, সুষেণ	দক্ষ	সুষেণ
সুধানিধি	ছান্দড, ধরাধর	ছান্দড়	ধরাধর
সৌভরি	বেদগর্ভ, পরাশর, রত্নগর্ভ	বেদগর্ভ	পরাশর, রত্নগর্ভ

এখন পুনরায় রাঢ়ীয়গণের বিশেষ বিবরণে মনোনিবেশ করিলাম। ভট্টনারায়ণের পুত্রগণের নাম ও তাঁহারা রাজদত্ত যে যে গ্রামে বাস করিতেন, তাহা লিখিত হইতেছে।

(২২) দামোদরের বংশাবলি দুষ্প্রাপ্য।

নাম।	গ্রাম।
১। আদিবরাহ	বন্দ্যঘটী
২। রাম	গড়গড়ী
৩। নীপ	কেশরকুনি
৪। লাল (নান)	কুসুমকলি
৫। বাটু (বটুক)	পারিহাল
৬। গুঁই	কুলভি
৭। গুণমণি (গুণ)	ঘোষলী
৮। শাও (সাহ	সেয়ক (সেয়)
৯। গণপতি (গণ, বুড)	মাষটক
১০। বিকর্ত্তন (মহামতি)	বটব্যাল
১১। নীল (বিক)	বসুয়ারি
১২। মধুসূদন	করাল
১৩। কোয় (নিহ্নো)	কুশারি
১৪। বাসু (শুভ, কাম)	কুলকুলী
১৫। মাধব (বিভূ)	আকাশ
১৬। মহামতি (গুণ্ড)	দীর্ঘাঙ্গী

বন্ধনীর মধ্যে যথায় এক বা ততোধিক নাম লেখা গেল, তাহা নামান্তর বলিয়া বুঝিতে হইবে। নানাবিধ গ্রন্থের সহিত ঐক্য করিয়া ঐ তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে।

আদিবরাহ।

ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, শ্রীহর্ষ মহোদয়, ভট্টনারায়ণ হইতে বয়োজ্যেষ্ঠ। শাস্ত্রপারদর্শিতা হেতু ভট্টনারায়ণ, আদিশূরের যজ্ঞে হোতায় কর্ম্ম নিষ্পাদন করেন। ভট্টনারায়ণ মহোদয়, যেমন গুরুতর, কষ্ট-সাধ্য কার্য্য সম্পাদন করেন, রাজাও তৎপ্রতি তদনুরূপ সম্মান প্রদর্শন করেন। পুত্রেষ্টি-যজ্ঞোৎপন্ন, আদিশূরের পুত্রের নাম ভূশূর। কোন মতে ভূশূর রাজা, পাঁচ জন ব্রাহ্মণের ৫৯ তনয়কে ৫৯খানি গ্রাম সমর্পণ করেন, তদনুসারে দ্বিজগণ গ্রামীণ অর্থাৎ গাঁই সংখ্যায় আখ্যাত হইতে থাকেন। অন্য মতে ভূশূর পুত্র ক্ষিতিশূরই ঐ প্রকার ক্রিয়ার সূত্রপাতকর্ত্তা, ঐ প্রকার সংজ্ঞা

করিবার তাৎপর্য্য এই যে, বিপ্রবৃন্দের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য রক্ষা না করিলে, উত্তর কালে কেহই ধর্ম্মানুশীলন বা বিদ্যাচর্চ্চায় মনোযোগী হইবেন না। সে যাহা হউক, ভূশূর বা তৎপুত্র ক্ষিতিশূর যে কেহ 'গাঁই" পদবীর সৃষ্টি-কর্ত্তা হউন না কেন, উক্ত পদবী যে সৃষ্ট হইয়াছিল, তৎপক্ষে কোনই সংশয় নাই। ভট্টনারায়ণের ১৬ ষোল পুত্রের মধ্যে বরাহ জ্যেষ্ঠ। তিনি স্বীয় গুণে ও পিতৃ-মাহাত্ম্যে নিজ নামের পূর্ব্বে "আদি" এই শ্লাঘ্য উপাধি প্রাপ্ত হন। বারেন্দ্র-মতে ভট্টনারায়ণের যে পুত্র হইতে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বারেন্দ্র শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে, তাঁহার নাম 'আদিগাঁই ওঝা'। অনেকের বিশ্বাস, আদি বরাহ ও আদিগাঁই ওঝা এক জনকেই বুঝায়। উভয় স্থলেই "আদি" শব্দ আছে। "ওঝা" গৌরবজনক উপাধি। সর্ব্বপ্রথমেই "গ্রাম" পান বলিয়া, তাঁহার "গাঁই" সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইয়া থাকিবে। এরূপ হইলে "আদিগাঁই ওঝা' নাম না হইয়া উপাধিমাত্র হয় এবং সেই উপাধি আদি বরাহেরই হওয়া সঙ্গত।

সর্ব্ব দিক্ বজায়ের চেষ্টায় ও বিশেষ প্রমাণাভাবে কেহ কেহ যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তদনুসারে আদিগাঁইওঝা, আদিবরাহের ভ্রাতা। সুতরাং রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র মতে ভট্টনারায়ণের ১৭ পুত্র। আদিবরাহের তৃতীয় ভ্রাতা নীপ, কেশরকুনী গ্রামের অধিবাসী। তিনিই নদীয়ার রাজোপাধিধারী জমিদার রায়গণের পূর্ব্বপুরুষ। আদিবরাহ নিজে বন্দ্যঘটী গ্রামে বাস করিতেন। বন্দ্যঘটী, কেশকুনি প্রভৃতি ১৬ গ্রাম পশ্চিম বাঙ্গালার অন্তর্গত ছিল। আদি-বরাহ-বংশীয়েরা "বন্দ্যঘটীগাঁই" বলিয়া পরিচিত।

ক্ষিতিশূরাত্মজ ধরাশূর, দ্বিজাতি-সমূহের বৈলক্ষণ্য-রক্ষার্থ ও আত্মোন্নতি-বিধানার্থ ৫৯ জন ব্রাহ্মণেকে মুখ্য কুলীন, গৌণকুলীন ও শ্রোত্রিয় এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। কেহ বা বলেন, বল্লাল এই কার্য্যের প্রবর্ত্তক। ইতি-হাসের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলে, এ মতে সম্মতি দেওয়া যাইতে পারে কি না, সন্দেহ-স্থল। শাণ্ডিল্য, ভারদ্বাজ, কাশ্যপ, বাৎস্য, এই পঞ্চগোত্রের মুখ্য কুলীন, গৌণকুলীন ও শ্রোত্রিয়দের সংখ্যা এই,—

মুখ্যকুলীন	৮ জন
গৌণকুলীন	১৫ জন
শ্রোত্রিয়	৩৬ জন
সমুদয়ে	৫৯ জন।

বর্ষমান।

৯৫ গিয়াছে। কিন্তু সে যাইতে না যাইতে ৯৬ আসিয়া তাহার শূন্য স্থান পূরাইয়াছে। এক বর্ষ গিয়া আবার এক বর্ষ আসিয়াছে। আজ বলিয়া নয়, পৃথিবীর সেই আদি দিন হইতে চক্রনেমির ন্যায় এমনই বর্ষের চক্র ঘুরিয়া আসিতেছে, এমনই এক একটি তরঙ্গ সেই মহাকালের বিশাল বক্ষে রহিয়া রহিয়া চলিয়া পড়িতেছে। ক্ষুদ্র মানুষ তাহার ক্ষুদ্র জ্ঞানের সীমায় যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, ততদূরই সে ইহার শক, অব্দ, সংবৎ বা সাল প্রভৃতি নামকরণ করিয়া অদ্য পর্য্যন্ত তাহার সংখ্যাপাত করিতেছে। কিন্তু সে কয় দিনের কথা? কয়দিনের জন্য এই গণনার সূত্রপাত হইয়াছে? এই ভূতধাত্রী ধরিত্রী যখন জীবের আবাসযোগ্য ছিল না, যখন ইহা পিণ্ডীভূত তরল বহ্নির আকারে ভ্রাম্যমানা ছিল, তখন পর্য্যন্ত বর্ষ, মাস, দিবা, মুহূর্ত্ত প্রভৃতি লইয়া কালের চক্র ঘুরিতেছে। ঐ যে প্রাচীন সূর্য্য নিত্য নিত্য পৃথিবীর কল্যাণের জন্য সর্ব্বত্যাগ করিয়া জাগিয়া প্রহরা দিতেছে, উহাকে জিজ্ঞাসা কর, এমনি কোটি কোটি বর্ষ উহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। তবে পূর্ব্বেও দিন হইত, আবার দিন গিয়া রাত্রি আসিত, কিন্তু তখন এতটা জ্ঞান লইয়া কেহ জন্মে নাই যে তাহার একটা ভাগ বা সংখ্যা নির্দ্দেশ করে। সকলেই চাহিয়া দেখিত, প্রাতে সূর্য্য হাসিয়া প্রাচী দেশে উদিত হইতেন, আবার আপনার সমস্ত কিরণ সংহার করিয়া কত পরে পশ্চিমে অস্ত যাইতেন; তার পর চন্দ্রতারকাভূষিত সুন্দর আকাশ লইয়া রাত্রি আসিত। সে রাত্রি গিয়া আবার দিন দেখা দিত। কিন্তু সে সময়ে একটিও মস্তিষ্ক ইহার একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম উদ্ভাবনার জন্য ক্ষণমাত্র আলোড়িত হয় নাই। ক্রমে মানুষ জ্ঞানী হইল, আপনার পার্শ্বস্থিত সমস্ত বস্তুর প্রকৃতি বুঝিল। সে দেখিয়া শুনিয়া স্তম্ভিত হইল। সর্ব্বাগ্রে সূর্য্যকে "সমস্তজগদাধারমূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ" বলিয়া সত্রাসভক্তিভরে প্রণাম করিল। তার পর, "সূর্য্যঃ সোমো যমঃকালঃ সন্ধীভূতান্যহঃ ক্ষপা" ইত্যাদি মন্ত্রে সকলের স্তব করিল। সেই ভয় ভক্তি বিস্ময়ের দিন হইতেই কালমানের একটা পদ্ধতি নিরূপণের চিন্তা মানবমনে উদিত হইয়াছিল। ক্রমে দেশ সমাজে ছাইয়া পড়িল। সমাজে সমাজে

অসংখ্য কার্য্যের সূত্রপাত হইল। সেই কার্য্যসৌকার্য্যার্থে অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমন্ত মানবগণ কাল নিরূপণে প্রবৃত্ত হইলেন। একজনের নিকট তাহা আর একজনে শিখিল। দূরস্থ জাতিনিচয় যাহারা এ বিষয়ে অজ্ঞ ছিল, ক্রমে তাহারাও শিক্ষা করিল। সেই কালমান দেশভেদে ব্যক্তিগণের বুদ্ধিভেদে পৃথক্ পৃথক্ নিরূপিত হইল। যাহার বুদ্ধিতে যেমন আসিল সে সেইরূপ ভাগ করিল।

অনেকেই বলেন আর্য্যজাতিই এই কালগণনার আদিকর্ত্তা, এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতেই অপরাপর জাতি সকল তাহা শিক্ষা করিয়াছে। কথাটা কতদূর প্রামাণিক তাহা বর্ত্তমানে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রচলিত বর্ষমান দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। আমাদের মধ্যে তিন প্রকার বর্ষমান প্রচলিত সম্বৎ, শক ও সন। ইহার মধ্যে সম্বৎ গণনাই সর্ব্বপ্রাচীন। বর্ত্তমান সম্বৎ সংখ্যা ১৯৪৬; শক—১৮১১, সন—১২৯৬, খৃষ্টাব্দ—১৮৮৯, ফসলী—১২৯৫; বিলায়তী—১২৯৫, মগী ১২৫১, হিজরী ১৩০৬। ইহা ছাড়া আরও বিস্তর প্রমাণ উল্লেখ করিবার আছে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই আর্য্যজাতি দ্বাদশ মাস, সাত বার ও দ্বাদশ রাশির গণনা করেন, সেই আর্য্যজাতি হইতেই পৃথিবীর সকল জাতি ইহা প্রাপ্ত হইয়াছে।

আর্য্যগণ আবার অনেকে অনেক প্রকার গণনার প্রথা বাহির করিয়া গিয়াছেন। কেহ নক্ষত্রের গতি ধরিয়া, কেহ চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি অবলম্বন করিয়া, কেহ বা সূর্য্যের গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কালগণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে কাল দুই প্রকার, এক স্থূল, অপর সূক্ষ্ম। এক গুরুবর্ণ উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে তাহার নাম বিপল, দশ বিপলে এক প্রাণ—এই প্রাণাদি কাল স্থূল; আর শত শত পদ্মপত্র একত্র করিয়া সূচশলাকাদ্বারা একেবারে বিদ্ধ করিতে যে সময় আবশ্যক হয় তাহার নাম ক্রটী—এই ক্রটী প্রভৃতি যে কাল তাহাকে সূক্ষ্ম কহা যায়। আর নক্ষত্রের গতি ধরিয়া যাঁহারা গণনা করিতেন, তাঁহাদের মতে, ৬০ অনুপলে ১ বিপল, ৬০ বিপলে অথবা ৬ প্রাণে এক পল; ৬০ পলে ১ দণ্ড, ৬০ দণ্ডে এক অহোরাত্রি, ৩০ নাক্ষত্র অহোরাত্রিতে ১ নাক্ষত্র মাস; ১২ নাক্ষত্র মাসে ১ নাক্ষত্র বৎসর। নাক্ষত্র ৩৬৬ অহোরাত্রি ১৫ দণ্ড ৩১ বিপল ২৪ অনুপলে এক সৌর বৎসর হয়। নাক্ষত্র অহোরাত্রিমান প্রত্যহই প্রায় সমান থাকে, কেন না তারাগণের গতির প্রায় বৈলক্ষণ্য

ঘটে না। নাক্ষত্র গণনা এখন প্রায় উঠিয়া গিয়াছে; জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ কেবল পরমায়ু গণনাতেই আজকাল উহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। চান্দ্র গণনাই অনেকের মতে প্রশস্ত এবং তাহাই বিশেষ প্রচলিত দেখা গিয়া থাকে। সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে চন্দ্র যতক্ষণে ঐ সূর্য্য হইতে দ্বাদশ অংশ অন্তরে গমন করে ততক্ষণে এক তিথি হয়—প্রথম ১২ অংশ গমনে শুক্ল প্রতিপদ, দ্বিতীয় ১২ অংশ গমনে দ্বিতীয়া—ইত্যাকারে সূর্য্য হইতে রাশিচক্রের অর্দ্ধেক অর্থাৎ ১১ অংশ গমনে ১৫ তিথি হয়। সেই ১৫ তিথির নাম শুক্ল পক্ষ। এইরূপ ২২ অংশ গমনে যে ১৫ তিথিতে চন্দ্র ক্রমশঃ সূর্য্যের নিকটগামী হইয়া সমসূত্রপাতের ন্যায় সূর্য্যের অধোবর্ত্তী হয়, সেই তিথিকে কৃষ্ণপক্ষ কহে। সূর্য্য হইতে চন্দ্র যত দ্বাদশ অংশ দূরে গমন করে, চন্দ্রের তত কলা দৃষ্টিগোচর হয়, পক্ষান্তরে, যত দ্বাদশ অংশ নিকটবর্ত্তী হয়, তত কলা অদৃশ্য থাকে। সূর্য্যের উভয় পার্শ্বে ১২ অংশ মধ্যে চন্দ্রের অবস্থিতি হইলে তাহার অদর্শন হয়, এই জন্য কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর শেষাবধি শুক্ল প্রতিপদের শেষ পর্য্যন্ত আমরা চন্দ্রকে দেখিতে পাই না। সমস্ত সময় একত্র করিলে প্রায় ৫৯ দণ্ড হয়; ইহাতে চন্দ্রের গতি ১৩ অংশ ১০ কলা হইবেক। চন্দ্রসূর্য্যের গতির তারতম্য বশতঃ তিথির হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। চন্দ্রের এক তিথিতে এক চান্দ্র দিন, ৩০ তিথিতে এক চান্দ্র মাস, ১২ চান্দ্র মাসে এক চান্দ্র বৎসর হয়। চান্দ্র মাস আবার তিন প্রকার। শুক্ল প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত যে ত্রিশ তিথি তাহাকে মুখ্য চান্দ্র, আর কৃষ্ণপ্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত যে ত্রিশ তিথি তাহাকে গৌণ চান্দ্র, এবং যে কোন পক্ষের যে কোন তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার পূর্ব্বের তিথি পর্য্যন্ত যে ত্রিশ তিথি তাহাকে চান্দ্র সাবন বলে।

চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি আছে সুতরাং তদ্দারা সময় গণনা অতি সহজ। এই জন্য চান্দ্র বর্ষই পৃথিবীর সর্ব্বত্র আগে প্রচলিত ছিল। পূর্ব্বে যে প্রকার চান্দ্রমাসের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে আর্য্যগণ এক পূর্ণিমা হইতে অপর পূর্ণিমা পর্য্যন্ত গণনাই প্রশস্ত বলিয়া ধরিতেন। এই জন্য পূর্ণিমাকে পৌর্ণমাসী বলা গিয়া থাকে। আরব জাতিরা এক অমাবস্যা হইতে অন্য অমাবস্যা পর্য্যন্ত মাস গণনা করিত, এইরূপ দশ মাসে বৎসর হইত। সুতরাং আরবী বৎসরে কেবল ২৯৫ বা ২৯৬ দিন হইত। রোমান জাতির বর্ষ গণনাও ঠিক্

আরবদিগের ন্যায় ছিল। গ্রীকেরা ডেল্‌ফি নগরের এক মেলা হইতে অপর মেলা পর্য্যন্ত এক বৎসর গণনা করিত। ইহাতে রোমানদিগের ৪ বৎসরে গ্রীকদিগের ১ বৎসর হইত। চীনেরা এক চন্দ্রগ্রহণ হইতে অন্য চন্দ্রগ্রহণ পর্য্যন্ত এক বৎসর স্থির করিত, সুতরাং তাহাদের বৎসর সকল সমান হইত না। কোন বৎসর ১০০ দিনে, কোন বৎসর ২০০ দিনে, কোন বৎসর ৫০০ দিনেও শেষ হইত না।

কিন্তু, আর্য্যগণ সৌরগণনা যে একেবারে জানিতেন না তাহা নহে। সূর্য্যই যে কালের একমাত্র কর্ত্তা ইহা ঋক্‌বেদের ঋষিগণ পর্য্যন্ত বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন। তবে সূর্য্যের হ্রাস বৃদ্ধি নাই, এই জন্য তদ্দ্বারা গণনা কিছু কঠিন বলিয়া চন্দ্রের গতিদ্বারাই বর্ষ, মাস, দিন গণিত হইত। সৌরগণনার নিয়ম ছিল—১০০ ত্রুটীতে ১ তৎপর, ৩০ তৎপরে ১ নিমেষ, ১৮ নিমিষে ১ কাষ্ঠা, ৩০ কাষ্ঠায় ১ কলা, ৬০ কলায় ১ অংশ, ৩০ অংশে ১ রাশি, ১২ রাশিতে ১ বৎসর। এক সৌর বৎসরে সূর্য্য দ্বাদশ রাশিতে ভোগ করেন, প্রত্যেক প্রত্যেক রাশিতে তিনি যতকাল অবস্থিতি করেন, সেই কালে এক এক সৌর মাস হয়। এইরূপ গণনা মোটামুটিভাবে অনেক দিন হইতেই চলিত, তার পর দ্বাপর যুগে সাবন মুনি সৌর গণনার শ্রেষ্ঠতা দেখিয়া এই বিষয়ের উৎকর্ষ সাধন জন্য বিশেষ মনোযোগী হন। তিনি সূর্য্যের গতিপথ লক্ষ্য করিয়া তাহার প্রায় সমান দূরে দ্বাদশটী নক্ষত্র স্থির করিলেন। সে নক্ষত্র—বিশাখা, জ্যেষ্ঠা, উত্তর আষাঢ়া, শ্রবণা, ভদ্রা, অশ্বিনী, কৃত্তিকা, অগ্রা, পুষ্যা, মঘা, ফল্গুনী ও চিত্রা। সূর্য্য পথচক্র পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক নক্ষত্র হইতে অন্য নক্ষত্রে পৌঁছিতে যত সময় লাগে তাহার নাম এক মাস। অতঃপর এই সকল নক্ষত্রদিগের নামানুসারেই মাসের নামকরণ হইল। বিশাখা হইতে বৈশাখ, জ্যেষ্ঠা হইতে জ্যৈষ্ঠ, উত্তর আষাঢ়া হইতে আষাঢ়, শ্রবণা হইতে শ্রাবণ, ভদ্রায় ভাদ্র, অশ্বিনীতে আশ্বিন, কৃত্তিকায় কার্ত্তিক, অগ্রায় অগ্রহায়ণ, পুষ্যায় পৌষ, মঘায় মাঘ, ফল্গুনীতে ফাল্গুন, এবং চিত্রা হইতে চৈত্র। এই এক নক্ষত্র হইতে আর এক নক্ষত্র পর্য্যন্ত যে ব্যবধান তাহা এক রাশি। এই জন্য মাসের নাম উল্লেখ না করিয়া তৎস্থলে রাশির নামোল্লেখও অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে। বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত দ্বাদশটী মাসে যে দ্বাদশ রাশি তাহাদিগের নাম মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ,

কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন। পণ্ডিতদিগের মধ্যে মাসের পরিবর্ত্তে রাশির ব্যবহার প্রথা আজিও লক্ষিত হইয়া থাকে।* সূর্য্য চিত্রা নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ রাশি পরিভ্রমণানন্তর যত দিনে পুনরায় চিত্রা নক্ষত্রে উপনীত হন তাহার নাম এক বৎসর। সৌর পথের ঠিক্ দ্বাদশতম অংশে কোন নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয় না, এই জন্য মাসসমূহ ঠিক্ সমান সমান হয় না। এইরূপে সাবন মুনি কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত বৎসর প্রাচীন চান্দ্র বৎসর অপেক্ষা ৯ দিন ৪২ দণ্ড ৩১ পল ১২ অনুপল বড়। সেই অনৈক্য সংশোধন জন্য সাবন মুনি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে প্রত্যেক তৃতীয় বর্ষে ১৩ মাস হইবে। এই অতিরিক্ত মাসের নাম মল মাস। সেই মল মাস ত্যাগ করিয়া চান্দ্র ও সৌর বৎসর সমান করিয়া লইতে হইবে। সাবন মুনির মতেই আজিও আমাদের সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম সংসাধিত হইয়া আসিতেছে। সাবন মুনি হইতে সংবৎ গণনার সূত্রপাত হয়।

তার পর দ্বাপরের পর কলি আসিল। এই সময়ে বৌদ্ধদিগের বড় প্রাবল্য বাড়িল। বলারি ভট্ট নামে জনৈক বৌদ্ধ বুধগয়া নামক নগরে সৌর বৎসর গণনার আর এক নিয়ম বাহির করেন। সেই গণনাপদ্ধতি বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী তিব্বত, চীন ও পূর্ব্বোপদ্বীপ পর্য্যন্ত প্রচলিত হইল। ভারতবর্ষে কিন্তু বৌদ্ধ রাজত্ব ধ্বংসের পর সূর্য্য সিদ্ধান্ত কর্ত্তৃক আবার সৌর বৎসর গণনা আবিষ্কৃত হয়। বিষুব রেখা, মকর রাশির অয়ন, কর্কট রাশির অয়ন, সৌরগতির ব্যবহৃতি বা ব্যতিক্রম প্রভৃতি কয়েকটী বিষয়ে বলারি ভট্ট ও সূর্য্য সিদ্ধান্তের মতে এত ঐক্য দেখা যায় যে কে কাহার পরবর্ত্তী তাহা সহজে বুঝা অতি কঠিন, এই সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতই সমস্ত দাক্ষিণাত্যে ও বঙ্গে প্রচলিত আছে। সাবন মিতির সংবৎও এই মতানুসারে সংশোধিত হইয়া থাকে।

---

* সামান্যতঃ একটী দৃষ্টান্তস্বরূপ একটা চলিত হেঁয়ালির কথা বলিতেছি :—

মকরেতে জন্ম তার কলসেতে ফোটে।
মৎস্যের উদরে কিঞ্চিৎ পাওয়া যায় বটে।
মেষেতে নাড়ে চাড়ে বৃষেতে বসে খায়,
ইহার কতক দ্রব্য পাঠাবে আমায়।

ক্রমে ভারতের উচ্চজ্ঞান ও অলোকসামান্য মনীষা দূর সিন্ধুপার পর্য্যন্ত পৌঁছিল। অপেক্ষাকৃত যাহারা জ্ঞানমার্গে আপনাদিগের অবস্থাকে উন্নীত করিতে সক্ষম হইয়াছিল, যে সকল নরনারী জ্ঞানের আস্বাদ কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল, তাহারা ভারতের অনন্যসাধারণ উন্নতি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। সেই জ্ঞান অর্জ্জন লালসায় শত যোজন দূর হইতে কোটী কোটী বৈদেশিক ভারতের দ্বারে ভিক্ষুকের বেশে উপনীত হইল। ভারত চিরদিন সকলের নিকট সকল বিষয়ে মুক্তহস্ত, অকপটে সেই বিজাতীয় দিগের সম্মুখে আপনার মহোজ্জ্বল জ্ঞানভাণ্ডার খুলিয়া দিল। বহু অধ্যবসায় সহকারে ছাত্রের ন্যায় বিদেশীয় মহা মহা পণ্ডিতগণ তাহা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই জ্ঞান দেশ বিদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। যে শিখিয়া গেল, সে নিজের দেশে গিয়া অপরকে শিখাইল। আবার নিকটবর্ত্তী অন্য কোন ভিন্ন জাতি আসিয়া তাহার নিকট তাহার উপদেশ গ্রহণ করিল। আজ আমেরিকা বিজ্ঞানগর্ব্বিত, ইয়ুরোপ সভ্যতাদৃপ্ত, আফ্রিকাও আপনার প্রাচীন কাহিনীর কথা বলিতে কুণ্ঠিত নহে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই হতবল, গতমান, নষ্টগৌরব ভারতই যে সকলের গুরুর গুরু সে বিষয়ে, তুমি দাম্ভিক উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানভূষণ, যাহাই বল, তোমার যে জন শিক্ষাদাতা তিনি কখনই তাহা মুখাগ্রে আনিবেন না। কিন্তু, যাউক, এখন যাহা বলিতেছিলাম তাহা বলি।

গণিত ও জ্যোতিষাদির ন্যায় এই বর্ষমানও ভারত হইতে ক্রমে বিদেশে রপ্তানি হইয়া পড়িল। টলেমী রাজগণই প্রথম এই বর্ষগণনা মিশর দেশে প্রচলিত করেন। তার পর জুলিয়াস সিজার যখন মিশর জয় করিলেন, তখন তদ্দেশে হিন্দুপদ্ধতি অনুসারে বর্ষগণনার প্রথা দেখিয়া অতি আনন্দের সহিত তাহা শিক্ষা করতঃ আপনার দেশে তাহা প্রচলিত করিলেন। দ্বাদশ মাস, সাতবার, দ্বাদশ রাশি রোমে প্রচলিত হইল বটে, কিন্তু তখনও তথায় গণিতশাস্ত্র বা জ্যোতিষশাস্ত্র সম্যক উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। রোমকেরা রাশি চক্র দ্বারা মাস গণনা করিতে সমর্থ হয় নাই। রোমে আগে দশটী মাস চলিত, জুলিয়স নিজের নামে ও উত্তরাধিকারী অগষ্টসের নামে আর দুই মাসের নামকরণ করিলেন। সে অতিরিক্ত মাস দুইটীর নাম হইল, জুলাই ও আগষ্ট। কিন্তু, জুলাই ও আগষ্ট যদিও অতিরিক্ত

তথাপি তাহাদিগকে যাহাতে অতিরিক্ত ও পশ্চাৎগণিত বলিয়া লোকে না বুঝে সেই জন্য তাহাদিগকে প্রচলিতপূর্ব্ব দশমাসের ভিতর সংপ্রবেশিত করা হইল। নহিলে যেরূপ বুঝা যায়, তাহাতে পূর্ব্বপ্রচলিত দশটী মাসের মধ্যে সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নবেম্বর, ডিসেম্বর এই কয়টী যে শেষেস্থ চারি মাস সে বিষয়ে আর কোন মতদ্বৈধ আছে বলিয়া বোধ হয় না। সেপ্টেম্বর অর্থে সপ্তম মাসই বুঝায়, তেমনি অক্টোবর অর্থাৎ অষ্টমমাস, নবেম্বর অর্থাৎ নবম মাস, এবং ডিসেম্বর অর্থাৎ দশমমাস। সিজার প্রত্যেক মাসের দিন-সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন এবং প্রতি চতুর্থ বর্ষে একদিন বেশী হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ করতঃ সৌর বর্ষের সহিত ঐক্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহারই নাম জুলিয়ান বর্ষ। সেই জুলিয়ান বর্ষগণনা আজিও রুষরাজ্যে প্রচলিত রহিয়াছে।

জুলিয়ান বর্ষ রুষরাজ্যে চলিতেছে, কিন্তু য়ুরোপের অন্যান্য সাম্রাজ্যে এখন আর ইহা চলে না। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পোপ গ্রেগরী নামক জনৈক তীক্ষ্নবুদ্ধিশালী গণিতবিদ্ ধর্ম্মযাজক জুলিয়ান বর্ষের ভ্রম নিবারকরণ করিয়া তাহা সংশোধন করেন। পোপ গ্রেগরীকর্ত্তৃক সেই সংশোধিত প্রণালীকে গ্রেগরিয়ান বর্ষগণনা বলে। ইয়ুরোপে এখন সেই গ্রেগেরিয়ান প্রণালীরই সর্ব্বত্র প্রচলন লক্ষিত হইয়া থাকে।

কিন্তু এক রোম বা মিশর বলিয়া নয়, দেখাদেখি আরব ও পারস্য দেশেও অল্পদিনের মধ্যে হিন্দুবর্ষমান প্রথা অনুকৃত হইয়াছিল। সেখানেও আগে দশমাস প্রচলিত ছিল, তার পর আর্য্যদিগের দ্বাদশমাস দেখিয়া তদনুযায়ী দ্বাদশমাস গণনার সূত্রপাত হয়। যে দুইটী মাস অতিরিক্ত গণিত হইল, তাহা প্রচলিত রবিউল ও জমাদিউল মাস দ্বয়কে দুইবার দুইরকমে গণনা করিয়াই পূরণ করা হইল। এই জন্য রবীউল আউয়ান ও রবীউল সানি এবং জমাদিউল আউয়ান ও জমাদিউল সানি এই এক নামে দুইটী মাস দেখা গিয়া থাকে। মুসলমানেরা এত চেষ্টা করিয়া এবং আর্য্যদিগের এত নিকটে থাকিয়াও তাঁহাদের প্রচলিত সৌর বৎসর গণনা শিক্ষা করিতে পারে নাই। আজিও তাহারা চান্দ্রমতে বর্ষ গণনা করিয়া থাকে, এবং এই জন্য আজিও তাহাদের বৎসর সৌর বৎসর হইতে ৯।১০ দিন কম থাকে। মুসলমানদিগের এই মত গণনাকে আরবী বর্ষ বলে।

জুলিয়ান বর্ষ ও আরবী বর্ষ বিস্তর ভ্রমসঙ্কুল। এই জন্য মধ্যে মধ্যে

ইহার সংশোধন বড় আবশ্যক। কিন্তু জুলিয়ান বর্ষ একপ্রকার লুপ্তপ্রায় হওয়ায় এবং মুসলমান দিগের মধ্যে তেমন কোন ভাল জ্যোতির্ব্বেত্তার আবির্ভাব না হওয়ায় এই দুই গণনার আর সংশোধন হয় না। সুতরাং দিনে দিনে ক্রমাগতই ভ্রম সঞ্চিত হইতেছে। আর, গ্রেগেরিয়ান বর্ষ বা সাবন মিতি যেখানে যেখানে প্রচলিত সে সব স্থানেও সংশোধনের আবশ্যকতা হইয়া থাকে। তাহার কারণ, এই দুই মতে ঠিক সূর্য্যের গতি অনুসারে বর্ষমান গণিত হয় না। এজন্য সাবন মিতি প্রত্যেক তৃতীয় বর্ষে এবং গ্রেগেরিয়ান বর্ষ প্রত্যেক সপ্তত্রিংশতিতম বৎসরে সংশোধন করিয়া সৌর বৎসরের সহিত মিল করিতে হয়। কিন্তু, বঙ্গে, দাক্ষিণাত্যে বা বৌদ্ধরাজ্যে যেখানে সূর্য্যসিদ্ধান্তের বা বলাবি ভট্টের মতে বর্ষ গণিত হয়, সেখানে সূর্য্যের গতির পরিমাণ অনুসারেই গণনা করা হয়, সুতরাং তাহাতে কখন কোন ভ্রম হইবার সম্ভাবনা থাকে না, এবং কাজেই তাহার সংশোধনও কখন আবশ্যক হয় না।

কৈলাস পর্ব্বত।

কবি যথার্থই লিখিয়াছেন, এ পৃথিবীতে আসিয়া প্রকৃতির সেই অনুপম পর্ব্বতশোভা যে একটীবারের জন্যও না দেখিল, সে বৃথায় চক্ষু লইয়া জন্মিয়াছে। সেই প্রশান্ত গম্ভীর উদার মূর্ত্তি—সেই শিশুর ভীতিকারণ, যুবার উপভোগ্য সামগ্রী, বৃদ্ধের শান্তিনিকেতন, সেই 'অদ্রির উপরে অদ্রি অদ্রি তার পর'—সেই গলশোভিত নীরদমাল বিরাট অথচ প্রসন্ন দেহ—কি সেই মূর্ত্তি! ভাষায় বুঝি তাহার বর্ণনা হয় না। তাই কবি অস্পষ্ট ভাষায় লিখিয়াছেন

"কি এক মহান্ মূর্ত্তি—কি এক মহান্ স্ফূর্ত্তি!"

ভাষার এই অস্পষ্টতাই এ শোভার চরম বর্ণনা।

শোভার চির আকর, সৌন্দর্য্যের পূর্ণ ভাণ্ডার, শান্তির পবিত্র নির্ঝর সেই পর্ব্বতরাজির মধ্যে হিমালয় সর্ব্বপ্রধান। তাই হিমালয়ের অন্য নাম গিরিরাজ।

ভারতের আদি কবিগণ এই হিমালয়ের মহামূর্ত্তি দর্শনে বিস্মিত ও আনন্দাপ্লুত হইয়া ইহার নাম দিয়াছেন, পৃথিবীর মানদণ্ড। এ নাম ইহার কতদূর সঙ্গত যে একবার কখন ইহার উপকণ্ঠে গমন করিয়াছে, সেই তাহার সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছে। শোভার অনন্তনিলয় এই হিমালয় হিন্দুর নিকট দেবনিবাস বলিয়া প্রখ্যাত। যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ সর্ব্বক্ষণ ইহার শৃঙ্গে শৃঙ্গে উপত্যকায় উপত্যকায় ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ইহার কোথাও শান্ত ছায়াশীতল পবিত্র আশ্রম, কোথাও প্রসন্নসলিলপূর্ণ লীলা-সরোবর, কোথাও ঝর ঝর তালে মৃদুগানে নির্ঝরিণী বহিয়া যাইতেছে, কোথাও কোন গহ্বরপ্রান্তে শিলাতলে বসিয়া কোন যোগী মুদ্রিতনয়নে ভগবৎধ্যানে সমাসীন রহিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রকে যে যাহাই বলুক, এ দৃশ্য দেখিয়া কোন্ পাষণ্ড ইহাকে স্বর্গধাম না বলিবে?

শিখরশালী দেবধাম সেই হিমালয়ের "কৈলাসশিখরে রম্যে" দেবদেব মহাদেবের আশ্রম। কৈলাস সমগ্র হিমালয়ের মধ্যে সর্ব্বাধিক পবিত্র ও সর্ব্বাধিক রমণীয়। ইহার সর্ব্বত্রই সুশান্তিপূর্ণ। হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা, রোষ নাম মাত্র নাই, ভেক ভোগীসহ নিদ্রা যায়, সিংহশিশু মৃগশিশুর সহিত খেলা করে, প্রবল দুর্ব্বলের প্রতি বলপ্রয়োগ করে না। এখানে আসিলে ভুবনচারী নারদ শান্তিবিহ্বল হইয়া পড়িতেন, দেবদৈত্যত্রাস দশানন বীরত্ব ভুলিয়া যাইতেন, চিরকৌতুকিনী কিন্নরীগণ সম্ভ্রমে বিলাসবাসনা বিস্মৃত হইত। আর সেই কবিগুরুর চিরন্তন উজ্জ্বল বর্ণনা—সেই "অবৃষ্টিসংরম্ভ মিবাম্বুবাহং নিবাত নিষ্কম্পমিব প্রদীপং" মৃকাণ্ডজ শান্তমৃগপ্রচার চিত্রার্পিতা-রম্ভবৎ মহাযোগীর মহাযোগাশ্রম—দ্বারদেশে নন্দীর সেই গম্ভীর মূর্ত্তি, বামপ্রকোষ্ঠে হেমবেত্র, দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী মুখমধ্যভাগে সন্নিবিষ্ট—ভয়ে বনের পাখীপর্য্যন্ত অবলীঢ় পুনর্গ্রহণ করিতেছে না—সেই ভয়ভক্তি বিস্ময়ের মিশ্রণস্থল কৈলাস পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমবতের শিখরশ্রেষ্ঠ।

কিন্তু ইহা গেল কবি-বর্ণনার চূড়ান্ত, কৈলাস-বর্ণনারও চূড়ান্ত। এক্ষণে কৈলাসের ভৌগলিকতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা যতদূর জ্ঞাত হইতে পারি, তদ্বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে।

মেঘদূত কাব্যজগতের চরম সৃষ্টি। মেঘদূতের নায়ক কুবেরশপ্ত বিরহ-বিধুর যক্ষরাজ প্রাবৃট সমাগমে একখণ্ড ঘননীল মেঘকে সম্বোধন করিয়া

রামগিরি হইতে স্বীয় পুরী অলকায় প্রেয়সীর নিকট দৌত্যকার্য্যে প্রেরণ করিতেছেন। কবি এই উপলক্ষে রামগিরি হইতে কৈলাস পর্য্যন্ত নদনদী বন উপবন ও গিরি নির্ঝরিণীর বর্ণনা করিয়াছেন। সেই বর্ণনায় আমরা দেখিতে পাই, যক্ষদূত মেঘ হিমালয় পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া ক্রৌঞ্চরন্ধ্র পথ দিয়া কৈলাসপুরে উপনীত হন। এক্ষণে, এই ক্রৌঞ্চরন্ধ্র কোথায় অবস্থিত তাহার নির্দ্দেশ করিতে পারিলে কৈলাস নির্দ্দেশ অনেকটা সুগম হইতে পারে।

কিন্তু, ইহাতে অনেক গোল দেখিতে পাই। মেঘদূতের মতে ক্রৌঞ্চরন্ধ্র কৈলাসের অগ্রে, আবার রামায়ণের মতে কৈলাসের পশ্চাতে। কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডে রামচন্দ্র যেখানে সীতান্বেষণ করিতেছেন, সেইখানে এই সকল বর্ণনার উল্লেখ দেখা গিয়া থাকে। তাহার মতে হিমালয়ের পর সোমাশ্রম, সোমাশ্রমের পর কালপর্ব্বত, কালপর্ব্বত ছাড়াইলে সুদর্শন, সুদর্শনের পর দেবসখা; দেবসখার পর কৈলাস, তদনন্তর কৈলাসের পশ্চাৎ ক্রৌঞ্চরন্ধ্র। মহাভারতে ইহার বিশেষ একটা বিশদ উল্লেখ কিছু নাই। তবে যোনাথ'ন ডনকান্ নামা কোন সাহেব মানসসরোবর ভ্রমণকারী জনৈক ঊর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসীর প্রমুখাৎ যেরূপ অবগত হইয়াছিলেন, তদ্বৃত্তান্ত পাঠে জানা যায় যে ক্রৌঞ্চরন্ধ্র পশ্চিম হিমালয়ের অন্তর্গত ও কেদারনাথের উত্তরবর্ত্তী। কেদারনাথ ব্রহ্মদণ্ডের দক্ষিণ, ব্রহ্মদণ্ড কৈলাসের দক্ষিণ। সুতরাং ক্রৌঞ্চরন্ধ্র কৈলাসের দক্ষিণে অবস্থিত। আবার কাপ্তেন জিরার্ড সাহেব বলেন, ক্রৌঞ্চরন্ধ্র আর কিছুই নহে, হিমালয়ের যে স্থলে শতদ্রুনদী ধীরগতিতে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, তাহারই অনতিদূরে পনরটী গিরিসঙ্কট আছে, তাহাদিগের মধ্যে একটীর নাম কুব্রঙ্গ; কুব্রঙ্গ ক্রৌঞ্চরন্ধ্রের অপর নাম মাত্র। কুব্রঙ্গ কৈলাসের দক্ষিণে অবস্থিত। প্রবাদ আছে, বর্ষা ও শরৎকালে এই ক্রৌঞ্চরন্ধ্র-পথে বরফ থাকে না, তখন হংসগণ এই পথ দিয়াই মানসসরোবরে গমনাগমন করে, এবং এই কারণে ইহা 'হংসদ্বার' নামে উক্ত হইয়া থাকে। জিরার্ড সাহেবের মন্তব্য পাঠ করিলেও তাহাই বুঝা যায়। তাঁহার মতে ঐ সময়ে কুব্রঙ্গ গিরিসঙ্কট বরফহীন হওয়ায় সকলে স্বচ্ছন্দে ঐ পথ দিয়া যাতায়াত করিয়া থাকে। সুতরাং যতদিন না অন্য কোন বিশিষ্টতর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, ততদিন একপ্রকার স্বীকার করিতে হইতেছে, কুব্রঙ্গই ক্রৌঞ্চরন্ধ্র এবং ক্রৌঞ্চরন্ধ্র বা কুব্রঙ্গের উত্তরেই কৈলাস পর্ব্বত।

মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, কৈলাস হিমালয়ের ঠিক্ মধ্যভাগে অবস্থিত। কিন্তু য়ুরোপীয় পর্য্যটকগণ তাহা স্বীকার করেন না। * অধ্যাপক উইলসনের মতে কৈলাস হিমালয়ের একটী অংশ মাত্র। আবার, উল্‌ফোর্ড সাহেব বলেন, কিউলনই কৈলাস পর্ব্বত। তিব্বতদেশীয় লামাগণেরও নাকি তাহাই বিশ্বাস। Thornton সাহেবও কতকটা তাহাই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, কনিংহামের মতে কৈলাস পশ্চিম তিব্বতের মধ্যদেশ ও সিন্ধুনদের দক্ষিণ তটভূমি অবলম্বন করিয়া অবস্থিত। এই পর্ব্বতশ্রেণীর দৈর্ঘ্য অন্যূন ৫৫০ মাইল, ইহা দক্ষিণ পূর্ব্ব হইতে উত্তর পশ্চিম অভিমুখে বিস্তৃত।

কৈলাস শৃঙ্গের উচ্চতা সম্বন্ধেও মতভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। লেপ্‌টিনেণ্ট ষ্ট্রেচীর মতে ২০,৭০০ ফীট, জিরার্ডের মতে ৩৪,০০০ ফীট আবার কেহ কেহ ইহার ছয়টী গিরিসঙ্কটের উচ্চতা ধরিয়া সমগ্র শ্রেণীর উচ্চতা মাত্র ১০,০০০ ফীট অনুমান করিয়া থাকেন। তিব্বতবাসীদিগের মতে ইহা পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত, এই জন্য তাহারা ইহার নাম দিয়াছে, রিগ্যাল অর্থাৎ গিরিরাজ। কৈলাস নিরন্তর তুষার রাশিতে সমাচ্ছন্ন থাকে, ইহার তুষার মণ্ডিত শ্বেতাভ শৃঙ্গ সকল বহুদুর হইতে পথিকের নয়নগোচর হয়। কোন কোন লোকেরা কৈলাসকে গাঙ্গ্রি বলে। গাঙ্গ্রি শব্দের অর্থ তুষারশৈল।

বলিয়াছি, হিন্দুর শাস্ত্রে কৈলাস অতি পবিত্র স্থান, এইখানে তাহাদের দেবাদিদেব মহাদেবের প্রিয় আশ্রম। হিন্দুদিগের ন্যায় তিব্বত ও চীনদেশীয়েরাও কৈলাসকে অতি পবিত্র জ্ঞান করে। তাহাদিগের মতে এই পর্ব্বত পরিবেষ্টন করা অপেক্ষা পুণ্য সঞ্চয়ের প্রকৃষ্ট পন্থা আর নাই। প্রতি বৎসর বহুতর যাত্রী দলে দলে আসিয়া এই উন্নত গিরিবরের পাদদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে, বহু কষ্ট সহিয়া বহু লোক দলে দলে ইহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া আইসে। বহুকাল ধরিয়া পর্ব্বতমূলে লামাদিগের চারিটী মন্দির বিদ্যমান আছে। কিন্তু ইহার সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াও ভূতভাবন ভবানীপতির আশ্রম কোন্ প্রদেশে অবস্থিত তাহা আজিও নির্ণীত হয় নাই।

বররুচি।

ভোজচম্পূ, প্রাকৃত প্রকাশ, নীতিরত্ন এবং লিঙ্গবিশেষবিধি কোষ এই কয়েকখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ বররুচি প্রণীত বলিয়া সাহিত্য সমাজে সমাদৃত হইয়াছে। বররুচি জাতিতে ব্রাহ্মণ, তিনি ভোজ রাজ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কালাতিপাত করিতেন এবং তাঁহার সভাসদ্ ও পৌরহিত্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। রাজতরঙ্গিনী নামক ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, ভোজরাজ হর্ষ দেবের পিতামহ কাশ্মীররাজ অনন্ত-দেবের সময় বর্ত্তমান ছিলেন। অন্যত্র লিখিত আছে, তিনি মালবদেশের রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া প্রভূত যশোপার্জ্জন করতঃ বহু সংখ্যক অনাথ লোকের দুঃখ মোচন করিয়াছিলেন।

মালবাধিপতির্ভোজঃ প্রহিতৈবত্ন সঞ্চয়ৈঃ।
অকারয়ৎ যেন কুণ্ড যোজনং কটকেশ্বরে। (ইত্যাদি)
১৯০ শ্লোক। ৭ম তরঙ্গ।

কবিবর বিহ্বন কৃত "বিক্রমাঙ্কদেবচরিত" গ্রন্থে এই অনন্তদেবের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পুস্তকে লিখিত আছে, রাজা অনন্তদেব 'রাম' বংশীয়। তিনি অসীম পরাক্রম প্রভাবে দারদ ও শকজাতিগণকে দমন করিয়া গঙ্গার তীর পর্য্যন্ত যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্ঞীর নাম সুভট। এই সুভটের গর্ভে কোশলরাজ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার তিন পুত্র হইয়াছিল, তন্মধ্যে হর্ষদেবই বিশেষ খ্যাত। অনন্তদেব ইহাঁরই পিতামহ।

কোলব্রুক সাহেব বলেন খৃষ্টীয় ১০৪২ অব্দে ভোজদেব বর্ত্তমান ছিলেন। (Colebrooke's Misc Essays vol II. P. 462-463 and 303)। জ্যোতি-র্ব্বিদাভরণ গ্রন্থমতে ভোজরাজ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রাজ্যশাসন করিয়া-ছিলেন। কিন্তু এই মত সমীচীন নহে। ভোজরাজা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা বহু সংখ্যক প্রাজ্ঞ প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের দ্বারা প্রমাণীত হইয়া গিয়াছে। রাজতরঙ্গিনী, কোলব্রুক এবং জ্যোতির্ব্বিদ্যাভরণোল্লিখিত ভোজরাজের সহিত এই ভোজরাজের কোন সম্পর্ক নাই, ইনি অন্য ভোজ

রাজা। এই প্রস্তাবের ভোজ রাজা ধারানগরের অধিপতি ছিলেন, ইহাঁরই সভায় বররুচি সদস্য ছিলেন।

অনেকে উজ্জয়িনী ও ধারানগরকে অভিন্ন জ্ঞান করিয়া থাকেন। আমার মতে উজ্জয়িনী ও ধারা ভিন্ন ভিন্ন নগর বিশেষ। উজ্জয়িনী হইতে ধারা, প্রায় ৫০ ক্রোশ অন্তর। হেমচন্দ্র কোষে, উজ্জয়িনীর তিনটি নাম দৃষ্ট হয়। বিশালা, অবন্তী, এবং পুষ্করণ্ডিনী। ইহাতে ধারা নাম দৃষ্ট হয় না। "বিক্রম-চরিত" প্রণেতা এবং কার্লাইল সাহেব এই ধারানগরকে দাক্ষিণাত্যের একটি নগর বলিয়াছেন। স্পষ্টতঃ ইহা তাঁহাদের ভ্রম; দাক্ষিণাত্যে ধারা নগর নাই, কেবল ধারাবার নাম দৃষ্ট হয়। ত্রিকাণ্ডশেষ গ্রন্থে উজ্জয়িনী 'বিশালা' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মেঘদূতেও বিশালার উল্লেখ আছে, যথা—

প্রাপ্যাবন্তীমুদয়ন কথা কোবিদ গ্রাম বৃদ্ধাং।
পূর্ব্বোদ্দিষ্টামনুসর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাং॥

মৎস্যপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, হেমচন্দ্রকোষ প্রভৃতি গ্রন্থে উজ্জয়িনীর ঐ তিনটি নামই দৃষ্ট হয়। উজ্জয়িনীর 'ধারা' নাম কোথাও দৃষ্ট হয় না। ইহাতে আমার বোধ হইতেছে, ধারা অন্য একটি নগরী। জেনেরল উড্‌ফোর্ডের মতে এই নগরী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ও ধর্ম্মারণ্যের নিকটবর্ত্তিনী। প্রাগ্-জ্যোতিষপুর, বর্ত্তমান কামরূপ এবং আসামের কিয়দংশ। ধর্ম্মারণ্য নগর, মহারাজ রামচন্দ্রের পৌত্র অমূর্ত্তরজঃ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। যথা—

"যথা অমূর্ত্তরজা বীরশ্চক্রে প্রাগ্‌জ্যোতিষং পুরং।
ধর্ম্মারণ্য সমীপস্থম্॥" (রামায়ণ)।

উড্‌ফোর্ডের মতটি সংযুক্তি সঙ্গত নয়। ধারানগর মালবদেশের অন্তঃ-পাতী। ইহা বিন্ধ্যপার্ব্বত্যপ্রদেশ সমীপস্থ বলিয়া বিখ্যাত। বররুচি যাঁহার সভাসদ ছিলেন, তিনি এই ধারানগরের রাজা। ধারানগরকে উজ্জয়িনী বলিয়া আখ্যাত করা সর্ব্বথা সংযুক্তি বিরুদ্ধ।

ভোজপ্রবন্ধ গ্রন্থের একটি শ্লোক পাঠে জানা যায়, বররুচি বাণভট্ট প্রভৃতির সমকালীন।

"অথ ধারানগরে ন কোপি মূর্খো নিবসতি। ক্রমেণ পঞ্চশতানি সেবন্তে বিদুষাং শ্রীভোজম্। বররুচি সুবন্ধু বাণ ময়ূর বামদেব হরিবংশ শঙ্কর কলিঙ্গ কর্পূর বিনায়ক মদন বিদ্যাবিনোদ কোকিল তারেন্দ্র প্রমুখাঃ।"

এই বাণভট্ট কাদম্বরী-প্রণেতা। তিনি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক বলিলে অসঙ্গত হয় না। টড্ সাহেবও এ মতের পোষকতা করেন।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দত্ত।

—o—

ক'নে বউ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বৈশাখ মাস—বেলা ১১টা বাজিয়া গিয়াছে, ইহারই মধ্যে সূর্য্যের কিরণ বড়ই প্রখর হইয়াছে। মনুষ্য মাত্রেই আর গৃহের বাহিরে আসিতে ইচ্ছা করে না, পশুপক্ষী সকলেই ক্রমে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। মাঠের গরু, বাছুর, ছাগল প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে বৃক্ষছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। পক্ষীগণ আহারান্বেষণ পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষের পত্রের মধ্যে লুকাইল। গ্রামের জীবন্ত ভাবও যেন ক্রমে ক্রমে কোথায় গিয়া লুকাইল। গ্রামের প্রান্তস্থিত মাঠ এখন নীরব। গ্রামের মধ্যস্থ বড় বড় বৃক্ষ সকল যাহারা ইতিপূর্ব্বে পক্ষীগণের কোলাহলে পরিপূর্ণ ছিল, তাহারা এখন নীরব। পথে এখন আর লোকজন চলে না—গ্রামের পথগুলিও এখন নীরব। কিন্তু এখনও ঘাট নীরব হয় নাই। কাপড়পুর গ্রামের বাইপুকুরের বাঁধাঘাটে তখনও কেহ স্নান করিতেছিল, কেহ আচমন করিতেছিল, কেহ বাসন মাজিতেছিল, কেহ কাপড় কাচিতেছিল। সুতরাং এখনও এ ঘাট নীরব হয় নাই। যাহারা ঘাটে ছিল, তাহারা সকলেই স্ত্রীলোক, ইহার মধ্যে বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, যুবতী, বালিকা, সকলেই আছে। সুতরাং সে স্থান নীরব থাকা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। দুই জন স্ত্রীলোককে একত্র কখন নীরবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছ কি?

এই সকল নবীনা ও প্রবীণায় মিলিয়া একটী প্রকাণ্ড সমালোচনা হইতেছিল। বালিকারা এই বিষয়ে বড়ই অমনোযোগী ছিল, তাহারা জলক্রীড়াতেই মত্ত। সমালোচ্য বিষয় পাড়ার মুখুর্য্যে পরিবার। সমালোচনা এইরূপ চলিতেছিলঃ—

গণেশের মা (বৃদ্ধা) বলিল—"এমন অংখার দেখি নাই মা, এমন অংখার দেখি নাই। সহরের লেখাপড়া জানা মেয়ে ব'লেই কি এত অংখার ক'র্‌তে হয়?

নিস্তারিণী (প্রৌঢ়া) বাসন মাজিতেছিল, তাড়াতাড়ি বাসনগুলি জলে ডুবাইয়া দিয়া বলিল—'তা এখন আর কিসের অংখার গা? তখন স্বামীর চাকুরি ছিল, গায়ে দশখানা গহনা ছিল, তখন অংখার ক'র্‌লেও সাজ্‌তো। এখন গায়ে গহনাও নাই, পেটে ভাতও সব দিন যোটে না, তবে আর কিসের অংখার?"

কমলা (নবীনা) বলিল—"ঠিক্‌ ব'লেছিস্‌ দিদি, সে দিন বড় বউয়ের ছেলে দুটী ক্ষীধেয় অস্থির হ'য়ে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদছিলো, আমি তাদের ঘরে নিয়ে গিয়ে খেতে দিয়েছিলাম বসে, বড়বউ আমায় এমনি মুখনাড়া দিলে আর ছেলে দুটীকে এমনি মার্‌লে যে সেই অবধি আমি আর ওদিক্‌ মাড়াইনে।"

তখন শ্যামের মা কাপড় কাচা স্থগিত রাখিয়া কমলার গা ঠেলিয়া বলিল,—হ্যাঁ কমল, বলি এই নেকাপড়া জান্‌লেই কি এমন অংখার হয় নাকি? আমার যে, বড় ভয় করে, আমার বউমাও নাকি নেকাপড়া জানা মেয়ে।"

কমল একটু মুচ্‌কিয়া হাসিয়া বলিল—"তোমার সে ভয় নাই মাসি, তোমার বউ কেবল পের্‌থম্‌ ফাগ প ড়েছে বইত নয়।"

সুহাসিনী বলিল—"স্ত্রীলোকে যথার্থ লেখা পড়া শিখিলে ভাল বই মন্দ হয় না, তার সাক্ষী দেখ না, ঐ মুখুর্য্যেদেরই ক'নে বউ। সেই একবার শ্বশুরের শ্রাদ্ধের সময় এসেছিল। সকলের সঙ্গে কেমন হেসে হেসে কথা কয়, যে যেমন তার তেম্‌নি মান রাখ্‌তে জানে। এত বড় মানুষের মেয়ে তবু যেন মাটীর মানুষ।"

চারুবালা বলিল—"আচ্ছা ভাই, ক'নে বউ আর আসে না কেন?'

তখন গণেশের মা তাড়াতাড়ি পূজা আহ্নিক বন্ধ করিয়া পুনরায় বলিল—"আস্‌বে কি ক'রে? খাওয়াবে কি? বড় ভাই রামকুমারের ত আজ্‌ দু'তিন বৎসর চাকরী নাই। আর ছোট শ্যামকুমার—ক'নে বউয়ের সোয়ামী ত মুখ্যু নেশাখোর—এক পয়সা রোজগার কখন করে নাই।

আর ভাল কথা—(এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া চুপি চুপি বলিল) ক'নে বউকে শ্রাদ্ধের সময় এনে তার সমস্ত গহনা বন্ধক দিয়েছে ব'লে, তার বাপ আর পাঠায় না।"

তখন সুহাসিনী বলিল "শ্যাম দাদা, গুলিখোর আর নেশাখোর হ'ক্, কিন্তু এমন পরোপকারী লোক ভাই দেখি নাই। লোকের কোন বিপদ আপদ হ'লে শ্যামদাদাকে ডাক্‌তেও হয় না।"

তখন শ্যামের মা বলিল—"আমার শ্যাম গুলি টুলি খায় না। তবে নাকি শুনেছি, কখন কখন একটু আধটু মদ খায়, তা, মদ খাওয়া এখন চলন হয়ে গেছে, তাতে কোন দোষ নাই। শুনিছে নাকি, ইংরিজী জান্‌লেই মদ খাওয়া শিখ্‌তে হয়; তা নইলে সাহেব নাকি ভাল চাক্‌রী দেয় না।"

গণেশের মা বলিল—"তা হ'বে মা! আমার এক বন্‌পোর নাকি ভারি বিদ্যে হয়েছে, কিন্তু ৫।৭ বৎসরের মধ্যে তার একটা চাক্‌রী হ'লো না। আরো দেখ না কেন, রামকুমারও ছেলে ভাল, বিদ্যেও আছে, আর স্বভাব চরিত্র ভাল, তা এমন ছেলেকে সাহেব চাক্‌রী থেকে ছাড়িয়ে দিলে কেন ?"

নিস্তারিণী বলিল—"চাক্‌রী হবে কি ? অমন স্ত্রী যার ঘরে থাকে, তার হাড়ে লক্ষ্মী থাকে না।"

এমন সময়ে ঠং ঠং ঠং বাসনের শব্দ করিতে করিতে রামকুমারের মাতা ধীরে ধীরে ঘাটে আসিয়া নামিল। তৎক্ষণাৎ পরস্পরের চোখে চোখে টেলিগ্রাফ্ হইয়া গেল। সকলে চুপ করিল। তখন যে যাহার কার্য্যে ব্যস্ত হইল। যে বৃদ্ধা পূজা আহ্নিক করিতেছিল, মাথায় একটি ফুল দিয়া মুদ্রিতনেত্রে ধ্যানে নিমগ্না হইল। যে প্রৌঢ়া বাসন মাজিতেছিল, সে মাজা বাসন পুনরায় মাজিতে বসিল। যে নবীনা কাপড় কাচিতে আসিয়া কাপড় কাচিতে ভুলিয়া গিয়া হাঁ করিয়া এই সকল সমালোচনা শুনিতেছিল, সে এখন তাড়াতাড়ি একগলা জলে গিয়া দাঁড়াইল। কেহ বা অন্য কোন কাজ না থাকায় কন্যাকে জলে নামিয়া খেলা করিতে দেখিয়া বিলক্ষণ প্রহার দিল। কন্যা প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিল, মাতা তাহাকে যমের বাড়ী যাইবার ব্যবস্থা দিল। তাহার পর কিছুক্ষণ সকলেই নীরব হইয়া রহিল, কারণ রামকুমারের মাতার গম্ভীর ও রাগা-

ম্বিত মুখখানা দেখিয়া কাহারও আর কথা কহিতে সাহস হইল না। অনেকেই কি ভাবিতে ভাবিতে তখনি গৃহে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে রামকুমারের জননীই প্রথম বক্তা হইল, কাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া আপন মনেই বকিতে আরম্ভ করিল—"একটুও গতর নাই—আমি ম'লে এদের কি দশা হবে! আমারও পোড়া কপাল। বিধাতা মরণ লিখ্‌তে ভুলে গেছে। এতখানি বেলা হ'লো, এখনও স্নান পর্য্যন্ত করি নাই, গতরখাগীর এঁটো বাসন মাজ্‌তে এসেছি।"

তখন গণেশের মা পূজা আহ্নিক শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বামহস্তের ভিজা কাপড়খানি কাঁধে রাখিয়া বলিল—"দিদি, বউকে একটু শাসন ক'রো।"

রামকুমারের জননী তখন একটু করুণস্বরে বলিল—"দিদি, তুমি আমার পর নও, তবে তোমার কাছেই বলি।" এই বলিয়া রামকুমারের জননী তখন গণেশের মার হাত ধরিয়া টানিয়া বসাইল। বড়বধূর গুণের অনেক পরিচয় দেওয়া হইল। কিন্তু সকল কথা বলা হইল না, কারণ সে সকল কথা বলিতে বলিতে রামকুমার-জননী কাঁদিয়াই আকুল হইল। গণেশের মা মিষ্ট কথায় অনেক সান্ত্বনা করিয়া বলিল—'দিদি, বড় বউকে না হয়, বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, কেননা—এখন তোমাদের সময় বড় ভাল নয়। আর না হয় ক'নে বউকে নিয়ে এস। সে মেয়েটি নাকি বড় লক্ষ্মী?" তখন রামকুমার-জননী চক্ষু মুছিয়া বলিল "তা'কে কি ক'রে আনি দিদি? একে'ত সেও বড় বউয়ের মতন বিদ্বান্ মেয়ে কাজেই ভয় হয়। আর আমার ছোট ছেলেটিও মানুষ নয়, সংসারের কিছুতে থাকে না, কেবল পরের কর্ম্মেই ব্যস্ত। আজ কি না কার মড়া ম'রেছে, অম্‌নি পোড়াতে চ'ল্লেন। কাল্ কিনা কাকে গঙ্গা যাত্রা ক'র্‌তে হবে, অম্‌নি দৌড়িলেন, কারো ব্যামো হয়েছে, সমস্ত রাত্রি জেগে আগুলে বসে রইলেন। এমন নির্ব্বোধ বেহ্মাণ্ডে নাই।"

তখন গণেশের মা চুপি চুপি বলিল—"বউ ঘরে নিয়ে এলে দিদি, ছেলের ঘরে মন ব'স্‌বে।" এই কথা বলিয়া গণেশের মা চলিয়া গেল।

কথাটি রামকুমার-জননীর মনের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া তোলাপাড়া করিতে লাগিল। সকল কথা ভুলিয়া গিয়া তখন সেই কথাই ভাবিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—o—

তখন এই কথাটি মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে রামকুমারের জননী মাজা বাসন লইয়া রাইপুকুরের ঘাট হইতে গৃহে ফিরিয়া চলিল। এখন রামকুমারের অবস্থার কিছু পরিচয় দিতেছি।

রামকুমারের বহির্বাটী ইষ্টকনির্ম্মিত, কিন্তু অনেক স্থলে তাহার ভগ্নাবশেষ মাত্র রহিয়াছে। সদর দরজার দুই ধারে যে দুইটি বৈঠকখানা ছিল' তাহা এখন আর মনুষ্য-আবাস-যোগ্য নহে—ইন্দুর, মূষিক প্রভৃতি জীবজন্তুগণ এখন দিবারাত্র তথায় নির্ব্বিবাদে বিহার করিতেছে। চারি ধারে যে চক্‌মিলান ছিল, তাহার সমস্ত খিলানই প্রায় ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। সম্মুখেই পূজার দালান। এখন এই দালানে চড়ুই ও পায়রার লীলাভূমি হইয়াছে। দেয়ালে অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি নানা বৃক্ষ সকল জন্মিয়াছে। উঠান জঞ্জালে পরিপূর্ণ। ভিতর বাটীতে তিন খানি মাত্র মেটে ঘর, ঘরগুলির অবস্থা বড়ই শোচনীয়। চালে খড় নাই, দেয়াল গুলিও অনেক স্থানে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, চারিদিকেই অপরিষ্কার। ঘরের মধ্যে যে দিকে চাও, সেই দিকে যেন মূর্ত্তিমান দরিদ্রতা বিরাজমান।

রামকুমার-জননী একখানি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মাজা বাসন গুলি রাখিল। তাহার পর ভিজা কাপড় খানি ছাড়িয়া ডাকিল—'বউ! বউ—ও বউ!"

বধূমাতা তখন অন্য গৃহের মেঝের উপর এক খানি মাদুর পাতিয়া তাহাতে শয়ন করিয়া নাসিকাধ্বনি করিতেছিল, সুতরাং শাশুড়ীর কথায় কোন উত্তর দিতে পারিল না। তখন বৃদ্ধা মনে করিল বউমা বুঝি ঘরে নাই, কার্য্যান্তরে কোথায় গিয়াছে, কিন্তু তাহারই পর কি মনে করিয়া একবার বড় ঘরের জানালা ঠেলিয়া দেখিল যে, সেই গৃহের মেজের উপর তাঁহার বড় সাধের বধূমাতা সুখে নিদ্রা যাইতেছে। রামকুমারের জননীর কেমন একটা বকারোগ ছিল। মনে কোনরূপ কোরকাপ ছিল না, এখনি যাহার সহিত একটা ভয়ানক বকাবকি হইল, পরমুহূর্ত্তেই তাহার সহিত

হাসিয়া কথা কহিত। বৃদ্ধা পরিশ্রমে কাতর ছিল না, দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতে পারিত, কিন্তু পরিশ্রম করিতে করিতে কাহাকেও দুই একবার না বকিলে বৃদ্ধার পরিশ্রমে উৎসাহ হইত না—বৃদ্ধা যেন নিস্তেজ হইয়া পড়িত। যখন কাহাকেও না পাইত তখন হয়, আপনার অদৃষ্টকে তিরস্কার করিত, না হয় বাক্‌শক্তিহীন পশুপক্ষীর উপর মনের সাধ মিটাইত। কিন্তু ইদানীং এই বধূমাতার সম্মুখে তাহাকে কোন কথা বলিতে তাহার সাহস হইত না। এখন তাহাকে নিদ্রিতা দেখিয়া বৃদ্ধা এ সুযোগ ছাড়িল না। বলিল—"কি আক্কেল দেখ। খে'য়ে দে'য়ে ঘুম হ'চ্ছে। আর আমি এখন মুখে জল দিই নাই। লোকে যে ব্যাটার বিয়ে দিয়ে বউ আনে, সেকি ঘরে বসিয়ে রেখে পূজো কর্‌বার জন্যে? এমন ছোট লোকের মেয়েও ঘরে এ'নে-ছিলাম। যত--"

বৃদ্ধার মুখের কথা মুখেই রহিল, বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া দেখে যে, তাহার নিদ্রিতা পুত্রবধূ ঝনাৎ ক'রে দরজা খুলিয়া ঘরের বাহিরে আসিল। বৃদ্ধা পুত্রবধূকে দেখিয়া কিছু থতমত খাইল। বড় বউ গর্জ্জন করিতে করিতে বলিল—"আমার বাপের আঁস্তাকুড় ঝাঁট দিলে যা'র দিন সুখে যায়, সে আবার আমার বাপ্‌কে ছোট লোক বলে।"

বৃদ্ধা সকল কথা ভালরূপ বুঝিতে পারিল না, কিন্তু তাহাকে যে বউমার বাপের বাড়ীর আঁস্তাকুড় ঝাঁট দিতে বলা হইয়াছে একথা বেশ বুঝিতে পারিল। এই আঁস্তাকুড় কথাটা বৃদ্ধার অন্তরে বড়ই আঘাত করিল। বৃদ্ধা কাঁদিল—অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল। তখন বড়বউয়ের সে কান্নাও বড় অসহ্য হইল। দুই প্রহরের সময় বুড়োমাগীর ভ্যান্ ভ্যান্ করিয়া কান্না ভাল লাগিবে কেন? বড়বউ মুখ নাড়িয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল—"অমন ক'রে রাত্রিদিন কেঁদ না বলছি। এমন ঘরেও রে হ'য়েছিল, যে এক দিনের জন্যেও সুখী হ'তে পেলেম না। একবার আসুক ঘরে, ইহার বিহিত না ক'রে আর এ বাটীতে থাক্‌বো না।"

বৃদ্ধা। বিহিত আর কি ক'র্‌বে মা? আমায় তাড়িয়ে দেবে—তাই দাও। তোমরাও সুখী হও, আর আমারও হাড় জুড়ুক। আমি আর তোমার মুখনাড়া সহ্য কর্‌তে পারি না।

বড় বউ এবার রাগিয়া বলিল— আমলো, মাগীর কথার শ্রী দেখ।

আমি কি বলেছি, যে আমার যা মুখে আসে তাই বল্‌তে আরম্ভ ক'ল্লে!"

এবার বৃদ্ধাও রাগিল, তাহার পর হাত নাড়িয়া মুখ নাড়িয়া উভয়ের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড কোন্দল আরম্ভ হইল। এমন সময় রামকুমার ধীরে ধীরে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। দূর হইতেই রামকুমার কোন্দলের শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল, সেই শব্দ শুনিয়াই তাহার প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল, বুকের ভিতর একটা ধড়াস্ ধড়াস্ শব্দ হইতেছিল। বাড়ী আসিতে তাঁহার পা যেন উঠিতে চাহে না, কিন্তু না আসিলে এ আগুন নিবিবে না জানিয়া ভীতমনে ধীরে ধীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন জননী কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া পুত্রবধূর বিষয় অনেক কথা বলিল। পুত্রবধূও শাশুড়ীর অনেক গুণের কথা স্বামীকে জানাইল। সে সকল কথা এরূপ অলঙ্কারের সহিত বলা হইল যে, শাশুড়ী পর্য্যন্ত তাহা শুনিয়া বিস্মিত হইল, রামকুমার বড়ই বিপদে পড়িল—এক দিকে জননী অন্য দিকে প্রখরা স্ত্রী। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তাঁহার মুখে আর কথা নাই। তাহার পর স্ত্রীকেই অনেক ভর্ৎসনা করিল। তখন বড়বউ কাঁদিতে কাঁদিতে নিদ্রিত দুই পুত্রকে জাগাইয়া তুলিয়া, দুই পুত্রের হাত ধরিয়া লইয়া গৃহের বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় স্বামীকেও দশ কথা শুনাইয়া দিল। আর তাহার গৃহে জন্মেও আসিবে না এরূপ আভাসও দিয়া গেল। সে সময় কেহ তাহাকে নিবারণ করিল না। রামকুমার নিজে ভর্ৎসনা করিয়াছে, সুতরাং রামকুমার নিবারণ করিতে পারে না। তাহার জননীর রাগ এখনও পড়ে নাই, সুতরাং তিনি কোন বাধা দিলেন না। আর বড় বউ যে রাগ করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া যাইবে, তাহা কেহই মনে করে নাই। এদিকে বড় বউ মনে করিয়াছিল যে, পিত্রালয় যাইব বলিয়া বাড়ীর বাহির হইলেই উভয়েই তাহার খোসামোদ করিয়া তাহাকে থামাইবে, কিন্তু যখন পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল যে কেহই তাহাকে ফিরাইতে আসিতেছে না, তখন তাহার রাগ দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। বড় বউ রাগের ভরে তখন সত্যই পাড়ার একজন নীচবংশীয়া স্ত্রীলোক সঙ্গে পিত্রালয়ে চলিয়া গেল।

রামকুমার তাহার পর কি ভাবিয়া এইবার জননীকে মৃদুভর্ৎসনা আরম্ভ করিল। বলিল—"দেখ মা, আমাদের ত অবস্থা এই, কাল কি খাব আজ

তাহার ঠিক্ নাই। আমার মনের অবস্থা সেই জন্য সর্ব্বদাই ভাল থাকে না; তাহার উপর তোমাদের এই সকল কোন্দল ঝগড়া কি ভাল লাগে? এতে যে লক্ষ্মী ছেড়ে যায়।"

মাতা তখন পুনরায় কান্না আরম্ভ করিল, কিন্তু রামকুমারের মনের অবস্থা এখন ভাল ছিল না, সুতরাং রামকুমার জননীকে এখন আর কোনরূপ সান্ত্বনা করিল না। তখন জননীরও পুত্রের উপর বড় অভিমান হইল। এতদিন পরে বৃদ্ধার পিতৃশোকের কথা মনে পড়িল, বৃদ্ধা উচ্চৈঃস্বরে "বাবাগো, একবার এসোগো" বলিয়া চীৎকার ছাড়িতে লাগিল। অদৃষ্টক্রমে রামকুমার কাহাকেই সন্তোষ করিতে পারিল না।

(ক্রমশঃ

বাঙ্গালার উপন্যাস-লেখক।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(মৃণালিনী ও বিষবৃক্ষ।)

বঙ্কিম বাবুর তৃতীয় উপন্যাস মৃণালিনী। ইহাও দুর্গেশনন্দিনীর ন্যায় ঐতিহাসিক উপন্যাস। বাঙ্গালার স্বাধীনতা সূর্য্য যে ঘটনায় চিরদিনের জন্য অস্ত যায়, ব ন্যায় ইতিহাসের সেই কলঙ্কের কথা এই উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা অনেকাংশে দুর্গেশনন্দিনীর ধরণের উপন্যাস, আমরা দুর্গেশনন্দিনী সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছি, এই উপন্যাস খানি সম্বন্ধেও তাহার অনেক কথা খাটিতে পারে। তবে দুর্গেশনন্দিনীর চরিত্র চিত্রন অপেক্ষা ইহার চরিত্র চিত্রন অনেকাংশে উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে।

ইহা গল্পাংশে অতি চমৎকার, ঘটনার পর ঘটনা বিলক্ষণ নিপুণতার সহিত সংযোজিত করা হইয়াছে, সে ঘটনাগুলিও বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। ইহা নাটকাংশেও দুর্গেশনন্দিনী অপেক্ষা হীন নহে, বঙ্গভূমিতে শত শত

বার অভিনয় হইয়া গিয়াছে, এবং এখনও হইতেছে, তত্রাচ ইহা পুরাতন হয় নাই।

হেমচন্দ্র ইহার নায়ক, মৃণালিনী ইহার নায়িকা, পশুপতি ইহার উপনায়ক এবং মনোরমা ইহার উপনায়িকা। নায়ক নায়িকা অপেক্ষা ইহার উপনায়ক ও উপনায়িকা আমাদের মন বেশী আকর্ষণ করিয়া থাকে। সাধারণ নায়ক নায়িকা যেরূপ হইয়া থাকে, হেমচন্দ্র ও মৃণালিনী সেইরূপ গুণবিশিষ্ট, তাহাদের চরিত্রে কিছুই বিশেষত্ব নাই, সুতরাং কিসে আমাদের মন আকর্ষণ করিতে পারিবে? কিন্তু পশুপতি ও মনোরমা সম্বন্ধে আমরা একথা বলিতে পারি না, বঙ্কিম বাবুর পশুপতি ও মনোরমা সাধারণ চরিত্র নহে, ইহারাও কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি। তবে বঙ্কিম বাবু স্ত্রীচরিত্র যেরূপ সুন্দররূপে পরিস্ফুট করিয়া থাকেন, পুরুষচরিত্র ততদূর পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করেন না, সেই কারণ মনোরমা চরিত্র যেরূপ সুন্দর হইয়াছে, পশুপতি চরিত্র তত সুন্দর চিত্রিত হয় নাই, স্থানে স্থানে খুঁত রহিয়া গিয়াছে।

মনোরমার প্রকৃতি বড়ই সরল—বড়ই মধুর, যখন হেমচন্দ্রের সহিত মনোরমার প্রথম পরিচয় হয়, তখনই আমরা সেই সরল ও মধুর প্রকৃতির পরিচয় পাই। হেমচন্দ্র প্রথম আলাপে মনোরমাকে অতি সরলা বালিকা ভিন্ন আর কিছুই ভাবিতে পারিলেন না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে মনোরমার প্রকৃতি হেমচন্দ্রের নিকট অধিকতর বিস্ময়জনক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কখন সরলা বালিকা, কখন বা গাম্ভির্য্যশালিনী তরুণী। একদিন রাত্রে এক বাপীকূলে মনোরমাকে জলে চরণ রক্ষা করিয়া সরাধঃস্থ সোপানে বসিয়া চন্দ্রালোকে আর্দ্র কেশরাশি শুকাইতে দেখিয়া মনোরমার প্রকৃতি সম্বন্ধে হেমচন্দ্রের বিস্ময় আরো বৃদ্ধি পাইল। তৎপরে যে দিন হেমচন্দ্র মৃণালিনীর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া অপার চিন্তাসাগরে নিমগ্ন সেই দিন মনোরমার নিকট ভর্ৎসিত হইয়া হেমচন্দ্র বুঝিল—মনোরমা প্রণয়োন্মাদিনী—সে প্রণয় সঙ্কীর্ণ ও কলুষিত প্রণয় নহে, সে প্রণয় অতি গভীর—সে প্রণয় অতি পবিত্র স্বর্গীয়ভাবে পরিপূর্ণ। সরলা বালিকার সেই অতলস্পর্শ গভীর প্রণয় আমরা বুঝিতে পারি, কিন্তু বুঝাইতে পারি না। হেমচন্দ্রের ন্যায় একজন প্রণয়ীও সেই ক্ষুদ্র বালিকার গভীর প্রণয় স্রোতের সম্মুখে দাঁড়াইতে সক্ষম হইল না, হেমচন্দ্র মনোরমার নিকট পরাজিত হইল। মনোরমার দুই মূর্ত্তি

বড়ই সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে, একমূর্ত্তি যেন কুসুমনির্ম্মিত, বড় কোমল, সেই মূর্ত্তি আমাদের হৃদয়কে বড়ই স্নিগ্ধ করে, ইহার অন্য মূর্ত্তি বড়ই গাম্ভীর্য্য-শালিনী, সে মূর্ত্তিতে আমাদের হৃদয় গাম্ভীর্য্যে ভরিয়া যায়।

আর এক কথা, আমরা মৃণালিনীকে ভুলিয়া যাইতে পারি, এমন কি মনোরমাকে ভুলিলেও ভুলিতে পারি, কিন্তু ইহার সেই ভিখারিণী গিরি-জায়াকে এ জন্মে কখন ভুলিতে পারিব না। সেই কোকিলকণ্ঠীর মধুর স্বরলহরী যেন এখনও আমাদের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিতেছে। তাহার নিঃস্বার্থ পরোপকারব্রত সরলহৃদয় উচ্চৈঃস্বরে যেন আমাদিগকে পরোপকার-ব্রত শিক্ষা দিতেছে। গিরিজায়া নীচবংশীয়া হইলেও তাহার হৃদয় অতি উচ্চ। এরূপ সদা চাঁদ ত্‌ নিঃস্বার্থ পরোপকারী ও বুদ্ধিমতী রমণী সংসারে অতি দুর্ল্লভ।

বঙ্কিমবাবুর চতুর্থ উপন্যাস বিষবৃক্ষ। বিষবৃক্ষ একখানি সামাজিক উপন্যাস। সন ১২৮১ সালের বৈশাখ মাসে প্রথম সংখ্যা বঙ্গদর্শন মুদ্রিত হয়। এই সংখ্যা হইতেই বিষবৃক্ষ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়া প্রথম বৎসরের বঙ্গদর্শনেই ইহা শেষ হয়। বিষবৃক্ষ বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস, আমাদের মতে বিষবৃক্ষই বঙ্কিম বাবুর সকল উপন্যাসের শীর্ষস্থানীয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, ও মৃণালিনীতে ইংরাজী গন্ধ ও ইংরাজী ভাব বিলক্ষণ বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু বিষবৃক্ষে সে গন্ধ ও সে ভাব সেরূপ ভাবে নাই। ইহা বাঙ্গালীর নিজের সম্পত্তি, ইহা বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারের একটি উজ্জ্বল রত্ন। দীন বঙ্গভাষা ত দূরের কথা—এই উপন্যাস পৃথিবীর যে কোন ভাষায় লিখিত হউক না কেন ইহা সেই ভাষারই গৌরবস্থল হইবে।

যে প্রতিভাবলে বঙ্কিম বাবু বাঙ্গালার উপন্যাস-লেখকগণের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছেন সে প্রতিভার স্ফূর্ত্তি যেমন আমরা, এই বিষবৃক্ষতে দেখিতে পাই, একাধারে এরূপ স্ফূর্ত্তি আর তাঁহার কোন উপন্যাসে নাই। ইহার ভাষা, ভঙ্গী. ও গল্পের বিষয়ে কোন কথাই বলিতে ইচ্ছা করি না, কারণ বঙ্কিম বাবু সম্বন্ধে এখন আর এরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়াই অসম্ভব, তবে চরিত্রচিত্রণে তিনি যে অসাধারণ গুণপনা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে আমরা চেষ্টা করিব।

এই উপন্যাসের ছয়টী চরিত্র এই স্থলে উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে পুরুষ চরিত্র দুইটী, আর স্ত্রী চরিত্র চারিটী। পুরুষ চরিত্র নগেন্দ্র ও দেবেন্দ্র, আর স্ত্রী চরিত্র সূর্য্যমুখী, কমলমণি, কুন্দনন্দিনী ও হীরা।

১ম। নগেন্দ্র নাথ। নগেন্দ্রকে গ্রন্থকার বড়ই উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। নগেন্দ্রকে আমরা যেন চক্ষের সম্মুখেই দেখিতে পাইতেছি, তাঁহার সমস্ত কার্য্যকলাপও যেন আমরা স্বচক্ষে দেখিযাছি। নগেন্দ্র ধনে, রূপে গুণে, মানে সকল বিষয়েই গোবিন্দপুরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহা ব্যতীত প্রতিপ্রাণা, সাধ্বী, প্রেমময়ী ভার্য্যা তাহার বামপার্শ্বে। নগেন্দ্রের আর কিসের অভাব? অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও নগেন্দ্র বিনয়ী গুরুজনের প্রতি ভক্তিমান, আশ্রিতের প্রতিপালক, দরিদ্রের প্রতি স্নেহবান, পত্নীর প্রতি দয়াবান ইত্যাদি প্রধানতঃ সকল গুণেই গুণবান। কিন্তু নগেন্দ্র নাথের হৃদয়ে যে ইন্দ্রিয়-ভোগ-লালসা প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছিল, যতদিন সেই লালসা উত্তেজিত হইবার সুযোগ হয় নাই ততদিন সূর্য্যমুখীর দ্বারাই তাহা পরিতৃপ্ত হইত, তার পর, যখন কুন্দনন্দিনী সেই সুযোগ উপস্থিত করিয়া দিল, তখনই বিষবৃক্ষের বীজ নগেন্দ্রের হৃদয়ে উপ্ত হইল।

প্রথমে নগেন্দ্রনাথ কুন্দকে অনাথা দেখিয়া দয়া করিয়া আশ্রয় দিযাছিলেন, সুতরাং প্রথমে কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রনাথের দয়ার পাত্রী। তাহার পর কুন্দের রূপ ও গুণ দেখিয়া নগেন্দ্র মোহিত হইল, তখন কুন্দ নগেন্দ্রের প্রশংসার পাত্রী হইল, এই সময় নগেন্দ্র কুন্দকে কিরূপ চক্ষে দেখিত তাহা তাঁহার হরদেব ঘোষালের উদ্দেশে স্বহস্তলিখিত পত্রেই প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার পর সূর্য্যমুখীর অনুরোধে তারাচরণের সহিত কুন্দর বিবাহ হইয়া গেল বটে কিন্তু কুন্দের রূপের ছায়া নগেন্দ্রের হৃদয় হইতে অপসৃত হইল না। তিন বৎসর পরে কুন্দ বিধবা হইয়া পুনরায় নগেন্দ্রের গৃহে আনীত হইলে, তখন হইতেই নগেন্দ্রের হৃদয়ে ঘাতপ্রতিঘাত আরম্ভ হইল। কত রাত্রি নগেন্দ্র জাগিয়াই কাটাইল, কত সময় শূন্য মনে উদাস চিন্তায় অতিবাহিত করিল, বিনারোগে দিনে দিনে নগেন্দ্র শুকাইয়া যাইতে লাগিল, তাঁহার অমনোযোগে বিষয় কার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল, লোকজন অনুচরবর্গ দেখিয়া শুনিয়া ভীত হইল, পতিব্রতা সূর্য্যমুখী নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিধাতার নিকট স্বামীর কল্যাণ ভিক্ষা করিল, বিষবৃক্ষের অঙ্কুর দেখা দিল।

ক্রমেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। নগেন্দ্র আপনার হৃদয়ের সহিত, যুদ্ধ করিয়া আপনি ক্ষতবিক্ষত হইল। নগেন্দ্র চিত্তসংযম করিবার চেষ্টাও অনেক করিয়াছিল, কিন্তু তাহার সকল চেষ্টাই বৃথা হইল। শেষে নগেন্দ্রনাথের জীবন কুন্দময় হইয়া গেল। এই সময় একদিন সূর্য্যমুখী বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কুন্দের চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিল। সেই ভর্ৎসনায় কুন্দ নগেন্দ্রনাথের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গেল। নগেন্দ্র সে সংবাদ শুনিল, তাহার প্রণয় পুত্তলীর উপর সূর্য্যমুখীর একরূপ ব্যবহার তাহার অসহ্য হইল। ইহার জন্য পতিপ্রাণা সাধ্বীর উপর অত্যাচারও আরম্ভ হইল। এই সময় হইতেই বৃষবৃক্ষের মুকুল ধরিল। কুন্দ এই সময় অন্যায়রূপে অত্যাচারিত না হইলে নগেন্দ্র আরো কিছুদিন চিত্তসংযমের চেষ্টা করিতে পারিত। আবার এই অত্যাচারী অন্য কেহ না হইয়া স্বয়ং সূর্য্যমুখী, সুতরাং সূর্য্যমুখীরই কপাল ভাঙ্গিল।

পুনরায় যখন কুন্দনন্দিনীকে পাওয়া গেল, তাহার পরই নগেন্দ্রনাথের সহিত কুন্দর বিবাহ কার্য্য শেষ হইল। বিবাহান্তে সূর্য্যমুখী কিন্তু গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া গেল। তখন নগেন্দ্রনাথের চৈতন্য হইল, সূর্য্যমুখীর ন্যায় পতিপ্রাণা রমণীর প্রতি কিরূপ অন্যায় ব্যবহার করা হইয়াছে, এতদিন পরে নগেন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিল। এইবার action এর পর reation আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে একটী প্রণয় পরীক্ষা হইয়া গেল, সে পরীক্ষায় সূর্য্যমুখীরই জয় হইল। নগেন্দ্র নিজের মুখেই স্বীকার করিল যে, কুন্দনন্দিনীর প্রতি তাহার যে ভালবাসা, সে ভালবাসা কেবল "চোখের ভালবাসা।" সূর্য্যমুখীর প্রতি তাহার ভালবাসা অতি গাঢ়ই ছিল, কেবল দুই দিনের জন্য কুন্দনন্দিনীর ছায়ায় তাহা আবৃত ছিল মাত্র। তখন নগেন্দ্রনাথের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল—বিষবৃক্ষের ফল ফলিল। লোকে কথায় বলে দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝিতে পারা যায় না, নগেন্দ্রের পক্ষে তাহাই ঘটিল।

পুনরায় সূর্য্যমুখীর সহিত নগেন্দ্রের মিলন হইল, উভয়ে সুখসাগরে আবার ভাসিল। এই আনন্দের সময় হটাৎ একটা শোকাবহ ঘটনা ঘটিল। কুন্দ বিষপানে প্রাণত্যাগ করিল।

এই কয়েকটী ঘটনা লইয়াই বিষবৃক্ষের নগেন্দ্র চরিত্র। নগেন্দ্রনাথের

সকল গুণ ছিল, কিন্তু একটি দোষই সকল গুণ মাটি করিয়াছিল। অন্যান্য গুণের সহিত যদি তাঁহার চিত্তসংযম গুণও থাকিত, তাহা হইলে বিষবৃক্ষের সৃষ্টি হইত না। নগেন্দ্রের জীবনে কিছুরই অভাব ছিল না, সুতরাং তিনি কখন প্রলোভনে পড়েন নাই। তাঁহার কোন বিষয়ে অভাব থাকিলে অভাবের সঙ্গে সঙ্গে চিত্তসংযমও অভ্যাস হইয়া যাইতে পারিত। সংসারে অভাব না থাকা যে সকল সময় সুখের কারণ হয় না, এই নগেন্দ্র চরিত্রে তাহা আমরা শিক্ষা পাইয়াছি।

বিষবৃক্ষের দ্বিতীয় পুরুষচরিত্র দেবেন্দ্রনাথ। দেবেন্দ্রের চরিত্র প্রথমে নগেন্দ্রের ন্যায় নিষ্কলঙ্ক ছিল, কিন্তু যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রূপতৃষা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এদিকে কুরূপা, মুখরা, অপ্রিয়বাদিনী ও আত্মপরায়ণা পত্নী হৈমবতীর দ্বারা সে রূপ তৃষ্ণার শান্তি হইল না, তখন কাজেই দেবেন্দ্র যথেচ্ছাচারিতা আরম্ভ করিল। যদি নগেন্দ্রের ন্যায় প্রেমময়ী ভার্য্যা সূর্য্যমুখী দেবেন্দ্রের পার্শ্বে থাকিত, তাহা হইলে কখনই সে এরূপ অধঃপাতে যাইত না। দেবেন্দ্রেরও নগেন্দ্রের ন্যায় চিত্তসংযম গুণ প্রকাশ পায় নাই সত্য, কিন্তু দেবেন্দ্র কখন চিত্তসংযম করিবার চেষ্টা করিয়াও দেখে নাই। দেবেন্দ্রের চরিত্র অতি জঘন্য বটে, কিন্তু যখন তাহার দুরদৃষ্টের কথা মনে হয়, তখন তাহার প্রতিও আমাদের সহানুভূতি হয়। নগেন্দ্র ও দেবেন্দ্র উভয়েই কুন্দের রূপে মোহিত, কিন্তু যখন নগেন্দ্রের পার্শ্বে প্রেমময়ী সূর্য্যমুখী আর দেবেন্দ্রের পার্শ্বে অপ্রিয়বাদিনী হৈমবতীর কথা আমাদের মনে হয়, তখন কিন্তু দেবেন্দ্র অপেক্ষা নগেন্দ্রের প্রতি আমাদের ঘৃণা বেশী হয়। আমরা বলি, উভয়েই এক ধাতুতে নির্ম্মিত, তবে একজনের সূর্য্যমুখী ছিল বলিয়া, তাহার অধঃপতন ক্ষণিক, আর অপরের সূর্য্যমুখীর ন্যায় ভার্য্যার অভাবেই চির-অধঃপতন। সুতরাং নগেন্দ্রের পুনরুত্থান তাহার নিজের গুণে নহে, সে কেবল তাহার পতিপ্রাণা ভার্য্যা সূর্য্যমুখীরই গুণে। উভয়ের মধ্যে এক সূর্য্যমুখীই পার্থক্য, তদ্ভিন্ন অন্য বিশেষ পার্থক্য আমরা দেখি না। প্রেমময়ী ভার্য্যা বর্ত্তমানে যদি চিত্তসংযমে অক্ষম যুবাপুরুষের পদস্খলন হয়, তবে সেই ভার্য্যার সাহায্যে যে তাহার পুনরুত্থান হইতে পারে, নগেন্দ্রই তাহার দৃষ্টান্ত; আর প্রেমময়ী ভার্য্যার অভাবে নিরাশপ্রণয়ী যুবক যে কতদূর অধঃপাতে যাইতে পারে, দেবেন্দ্রই তাহার দৃষ্টান্ত।

স্ত্রী চরিত্রের মধ্যে প্রথম সূর্য্যমুখী। সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রনাথের ভার্য্যা।

সূর্য্যমুখী হিন্দুপত্নী, এক ভারতবর্ষ ভিন্ন জগতের সকল দেশেই এ রমণী অতি দুর্ল্লভ। সূর্য্যমুখীর চক্ষে তাহার পতি নগেন্দ্রনাথই পৃথিবীর আদর্শ পুরুষ। নগেন্দ্র চরিত্রে যখন কলঙ্ক স্পর্শ করিয়াছে, যখন সূর্য্যমুখী স্বামীকর্ত্তৃক ভৎ'সিত, যখন তাহার স্বামী অন্য রমণীগতপ্রাণ, তখনও সূর্য্যমুখী আপন ভাগিনেয় শিশু সতীশচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতেছে "বাবা। আশীর্ব্বাদ করি, যেন তোমার মামার মত অক্ষয় গুণে গুণবান হও। ইহার বাড়া আশীর্ব্বাদ আমি আর জানি না।" ইহা অপেক্ষা পতিভক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে? আর একদিন কমলমণিকে সূর্য্যমুখী বলিয়াছিল—"যদি কখন স্বামীর পায়ে কাঁকর ফুটিয়াছে দেখিয়াছি, তখনই মনে হইয়াছে, যে আমি ঐখানে বুক পাতিয়া দিই নাই কেন, স্বামী আমার বুকের উপর পা রাখিয়া যাইতেন।" হিন্দুরমণী ভিন্ন এরূপ কথা আর কাহার মুখে কখন শুনিয়াছ কি?

আমরা যে ২।৪ ছত্র উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতেই সূর্য্যমুখীর চরিত্র ফুটিয়াছে, বাস্তবিক সূর্য্যমুখীকে গ্রন্থকার এরূপ উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, যে সূর্য্যমুখী যেন আমাদের চক্ষের সম্মুখেই দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিবার জন্য আমাদের কোন কষ্টই করিতে হয় না। সূর্য্যমুখীর এতগুণ থাকিলেও সূর্য্যমুখীর কাল্পনিক আদর্শ হিন্দুরমণী নহে। সূর্য্যমুখীর পতিভক্তি আদর্শ পতিভক্তি বটে, কিন্তু তাহার হৃদয় সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় দুর্ব্বল, সেই কারণ সূর্য্যমুখী পতির সুখের জন্য প্রসন্নমনে আত্মবিসর্জ্জন করিতে সক্ষম হয় নাই। আমাদের বিশ্বাস—যে ভালবাসা, আত্মবিসর্জ্জন শিক্ষা দেয় না, সে ভালবাসাকে কখনই ভালবাসার চরমসীমা বলিতে পারি না। সূর্য্যমুখী যদি প্রসন্নমনে আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারিত, তাহা হইলে আমরা অকালে কুন্দনন্দিনীকে হারাইতাম না। সূর্য্যমুখী কুন্দনন্দিনীর সহিত তাহার জীবিতেশ্বরের বিবাহ দিয়া ছিল বটে, এবং "প্রভো! তোমার সুখই আমার সুখ, তুমি কুন্দকে বিবাহ কর, আমি সুখী হইব" একথাও মুখে বলিয়াছিল বটে, কিন্তু সূর্য্যমুখী সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় সে মিলন স্বচক্ষে দেখিতে পারে নাই, ঈর্ষার বশবর্ত্তী হইয়া সূর্য্যমুখী সেই জন্য গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। কমলমণি সূর্য্যমুখীকে যথার্থই বলিয়াছিল—"তোমার অন্তঃকরণের আধখানা আজও আমিতে ভরা, নহিলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াও অনুতাপ করিতেছ কেন?"

সূর্য্যমুখী চরিত্রে এই দোষটুকু স্পর্শ করিলেও সূর্য্যমুখী রমণী-রত্ন। সূর্য্যমুখীর ন্যায় পত্নীলাভ কয়জনের অদৃষ্টে ঘটে? সূর্য্যমুখী পুনরায় যখন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, তখন কিন্তু সূর্য্যমুখীচরিত্রে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তখন সূর্য্যমুখী কুন্দকে আপনার কনিষ্ঠা ভগিনী মনে করিয়াছিল, কিন্তু সে অসময়ে,—কুন্দ তখন বিষপান করিয়া ফেলিয়াছে।

সূর্য্যমুখীর পর কমলমণি। কমলমণিও সূর্য্যমুখীর ন্যায় পতি-পরায়ণা। তাহারও পতিভক্তি অসাধারণ, কিন্তু যেমন কেবল পতিভক্তি লইয়া সূর্য্যমুখী, তেমনই কেবল পতিভক্তি লইয়া কমলমণি নহে। কমলমণিতে আরো একটু কি আছে, যাহা দেখিয়া আমাদের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করে। সূর্য্যমুখীকে দেখিলে আমাদের হৃদয় গাম্ভীর্য্যে ও বিস্ময়ে ভরিয়া যায়, কিন্তু কমলমণিকে দেখিলে আমরা আনন্দে আত্মবিস্মৃত হই। কমল যেখানে সেইখানেই শান্তি, কমল যেখানে সেইখানেই আনন্দ, কমল যেখানে সেইখানেই সুখ, একজন পুত্রশোককাতরা রমণীর নিকট কমলকে বসাইয়া রাখ, কিছুক্ষণ পরে দেখিবে যে কমলের সহবাসে সে রমণী পুত্রশোক পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে। তবে কমলের কি হৃদয় নাই? কমলের যে হৃদয় আছে, সে হৃদয় তোমার সূর্য্যমুখীরও নাই। কমল বিশ্বপ্রেমিক, শত্রুর জন্যও কমলের প্রাণ কাঁদে। কুন্দকে ভৎসনা করিতে গিয়া কুন্দের দুঃখে কমলও কাঁদিয়া আকুল হইল। একদিন পতিভক্তিতে সূর্য্যমুখীও কমলমণির নিকট পরাজিত হইয়াছিল। সূর্য্যমুখী আপনার স্বামীর চরিত্রে সন্দিহান হইয়া কমলকে যে পত্র লেখে, তাহার উত্তরে কমল লিখিয়াছিল,—"আমি কমলমণি তর্কসিদ্ধান্ত ব্যবস্থা দিতেছি, তুমি দড়ি কলসী লইয়া জলে ডুবিয়া মরিতে পার। স্বামীর প্রতি যাহার বিশ্বাস রহিল না—তাহার মরাই মঙ্গল।" স্বামীর চরিত্রে সন্দিহান হওয়াকেও কমল পাপ মনে করিত। ইহা অপেক্ষা পতিভক্তি আর কি হইতে পারে?

আমরা বলি, একশত হিন্দুরমণীর মধ্যে যদি একজন সূর্য্যমুখী পাওয়া যায়, কিন্তু এক সহস্র হিন্দুরমণীর মধ্যে একজন কমলমণি পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। অথচ সূর্য্যমুখীকে এস্থলে আমরা কোন অংশে নিন্দা করিতেছি না। সূর্য্যমুখীতে যাহা আছে, কমলমণিতেও তাহাই আছে, কিন্তু কমলমণিতে যাহা আছে, সূর্য্যমুখীতে তাহা নাই। বঙ্কিমবাবু এই দুই রমণীরত্নের পার্থক্য

সুন্দররূপে দেখাইয়া গিয়াছেন, বিষবৃক্ষের পাঠকমাত্রেই সে পার্থক্য দেখিতে পাইবেন। 'কমলমণি যদি কখন সূর্য্যমুখীর অবস্থায় পড়িত, তাহা হইলে আমরাও সে সময়ে তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী পরিচয় পাইতাম।

কমলমণির পর কুন্দনন্দিনী। সূর্য্যমুখী ও কমলমণির ন্যায় এ কুসুম প্রস্ফুটিতা নহে, ইহা এই উদ্যানের একটি কলিকামাত্র। কিন্তু এই কুন্দ কলিকাতে যে সৌন্দর্য্য ও মধুরতা আছে, তাহা প্রস্ফুটিতা সূর্য্যমুখী ও কমলমণিতেও নাই। গ্রন্থকার এ কুসুমকে প্রস্ফুটিত করেন নাই। কলিকাবস্থাতেই ইহাকে শুকাইয়া যাইতে হইয়াছিল, সুতরাং ইহার সৌগন্ধে এ উদ্যানের চারিদিক আমোদিত হয় নাই। পাঠকগণের মন সূর্য্যমুখী ও কমলমণি লইয়াই ব্যস্ত থাকে, কেবল মধ্যে মধ্যে আবৃত সৌন্দর্য্যের প্রতি এক একবার দৃষ্টি পড়ে, কিন্তু কুন্দর সেই চিরবিদায় দিনে পাঠক কুন্দকে চিনিতে পারেন, তখন সেই অসময়ে কুন্দর জন্য তাহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠে।

কুন্দের প্রকৃতি অতি কোমল, অতি মধুর, অতি সরল। সে কোমলতা ও সরলতা এ পৃথিবীর উপযুক্ত নহে। তাহাকে স্পর্শ করিতে আমাদের সাহস হয় না, তাহার প্রতি চাহিতেও যেন ভয় হয়। বোধ হয়, এই বঙ্গদেশ ভিন্ন আর কোন দেশের কবি এমন কোমল, সরল, ও মধুর প্রকৃতির কল্পনা করিতে পারেন না। এ কল্পনা কেবল কতকগুলি ভাবের সমষ্টি। সরলতা, লজ্জা, ভীরুতা, প্রেম, দুঃখ, সহিষ্ণুতা, পরদুঃখকারতা, ও আত্মবিসর্জ্জন প্রভৃতি কয়েকটী ভাব একত্রীত করিয়া কবি এই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রেমই ইহার সকল বৃত্তির শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছে। এ প্রেমও সাধারণ প্রেম নহে, সে বিশেষত্ব আমরা নিম্নে দেখাইতেছি :

তারাচরণের সহিত কুন্দের বিবাহ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও কুন্দ সরলা বালিকা, তখনও তাহার হৃদয়ে প্রণয়বীজ অঙ্কুরিত হয় নাই। আর তারাচরণও কোন অংশেই কুন্দের উপযুক্ত পাত্র ছিল না, কেবল সূর্য্যমুখীর অনুরোধে এই বিবাহ হয়। তিন বৎসরের পর যখন কুন্দ বিধবা হইয়া নগেন্দ্রের গৃহে আনীত হইল, তখন পর্য্যন্তও সে সরলা বালিকা মাত্র। এই সরলা বালিকার হৃদয়ে ধীরে ধীরে নগেন্দ্রের দেবমূর্ত্তি অঙ্কিত হইতে লাগিল। কুন্দ মনে মনে নগেন্দ্রকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিত, প্রাণ ভরিয়া তাহাকে ভাল বাসিত। এ ভালবাসার প্রতিদান কুন্দ কখন মনেও কল্পনা করে নাই। সূর্য্যমুখী

নগেন্দ্রকে সকল গুণের আধার মনে করিত, কিন্তু নগেন্দ্রের দোষ কিম্বা গুণের কথা কুন্দনন্দিনীর মনে কথন উদয় হইত না। তাহার পক্ষে নগেন্দ্র দোষ গুণের অতীত। কুন্দ যৌবনের প্রথম প্রবল অনুরাগের সহিত তাহার হৃদয়-মন্দিরের প্রতিষ্ঠিতদেবতা নগেন্দ্রকে ভাল বাসিত। অথচ সে অনুরাগ প্রচ্ছন্ন-ভাবে তাহার হৃদয় মধ্যেই লুক্কায়িত থাকিত।

একদিন কমলমণির মুখে কুন্দ শুনিল যে নগেন্দ্র তাহাকে ভালবাসে। সেই দিন কিন্তু এই অনুরাগের বেগ কুন্দ হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে নাই, সেই দিন কেবল তাহা উথলিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাহার এই অনুরাগে অন্যের অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া কুন্দ নিজের জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। কুন্দর যে প্রকৃতি, ইহা ব্যতীত সে আর কি করিতে পারে?

শেষে তাহাই ঘটিল, কুন্দ সূর্য্যমুখীর সুখের পথ পরিস্কার করিবার জন্য নিজে বিষপানে প্রাণত্যাগ করিল। কুন্দনন্দিনীর এই শেষ পরিণাম আমাদের হৃদয়কে বড়ই ব্যথিত করে। কুন্দের জন্য আমাদের প্রাণ এত ব্যাকুল হয়, যে গ্রন্থকারের উপর পর্য্যন্ত আমাদের রাগ হয়। কিন্তু গ্রন্থকারেরও দোষ নাই, কুন্দ এ পৃথিবীর নহে, সুতরাং গ্রন্থকার কতদিন তাহাকে আর ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিবে?

বিষবৃক্ষের শেষ চিত্র হীরা। এ চিত্রখানিও গ্রন্থকার বেশ উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। হিংসা, দ্বেষ, প্রতিহিংসা স্বার্থপরতা প্রভৃতি নীচবৃত্তি গুলি লইয়া হীরার সৃষ্টি। কিন্তু গ্রন্থকার কেমন কৌশলে এই সকল নীচবৃত্তির উপরে প্রেমবৃত্তিকে প্রভুত্ব করিতে বসাইয়া দিয়াছেন। এই সকল নীচ-বৃত্তির সহবাসে হীরার প্রেম অতি জঘন্য আকার ধারণ করিয়াছিল। হীরার প্রেম অতি দুর্দ্দমনীয় নিকৃষ্ট প্রেম, ইহা সকল বাধা সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিতে প্রস্তুত। সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনীর সর্ব্বনাশ করিতেও হীরা কুণ্ঠিত হয় নাই। এরূপ প্রেমের যাহা পরিণাম, তাহা ও গ্রন্থকার সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন।

এই "বিষবৃক্ষে" আরো যে কত সৌন্দর্য্য আছে, তাহার সংখ্যা করিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু আমাদের স্থান অল্প, এই জন্য আমরা সকল কথাই অতি সংক্ষেপেই শেষ করিলাম।

পঞ্চবটি।

দশম পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে রসিক বড়ই বাড়াইয়া উঠিল। সে এখন বাড়ী আসা প্রায় এক রকম ছাড়িয়া দিয়াছে। যদি কখন আসে তো কেবল অত্যাচার অনাচার, কেবল দাঙ্গা হাঙ্গামা ও মারপিট, কেবল টাকা টাকা টাকা। টাকা কোথায় পাইবে? সকল দিন দুবেলা যাব চলে না সে কোথা হইতে পুত্রের মদের খরচ জোগাইবে? কিন্তু না দিলে তো নিস্তার নাই। রসিক বাক্স পেটরা ভাঙ্গিয়া ফেলে, ঘটী বাটী পরণের কাপড় খানা পর্য্যন্ত লইয়া ছুটিয়া গিয়া শুঁড়ির দোকানে বাঁধা দেয়। নিতান্ত অসহ্য হইলে হারাধন একবার ভৎর্সনা করিতে যান,—পিতা এক কথা বলিবেন কি, পুত্র দশ কথা শুনাইয়া দেয়। ঘৃণায় মনের আপশোষে হারাধন আর তাহার মুখদর্শন করেন না। খুড়া খুড়ী সবাই যে অত প্রাণের অধিক করিয়া ভাল বাসিত, তাহারা এখন বড় কষ্টে অশ্রুবেগ নিবারণ করিতে করিতে বিধাতার নিকট তাহার মৃত্যু কামনা করিয়া থাকেন। ভগবান্ একদিন রসিককে নিভৃতে ডাকিয়া বিস্তর বুঝাইয়াদিলেন, হতভাগা কথা কয় না, কেবল মাথা হেঁট করিয়া মুখ গুঁজিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। কখন পীড়াপীড়ি করিলে বলে, "আর কেন আমায় বাধা দাও, আমি বিষ খাইতে শিখিয়াছি, ঐ বিষ খাইয়াই মরিব। বাঁচনে আর আমার সুখ কি?" ভগবান্ দেখিয়া শুনিয়া বুঝিলেন সংশোধনের অনেক বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে, তাহার আশা বৃথা। শেষ তাহাকে আর কেহই কোন কথা বলিত না। রসিকও স্বাধীনবৃত্ত হইয়া যাহা মনে করিত উদ্দাম-ভাবে তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইত।

কিন্তু, যাহাই কর, পয়সা ভিন্ন এ সংসারে কিছুই হইবার নয়। যে বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিবে, তাহাকেও পয়সা দিয়া সে বিষ ক্রয় করিতে হয়। শুনিয়াছি একজন দরিদ্র উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়া একজনের নিকট দুটী পয়সা ভিক্ষা করিয়া এক গাছি দড়ি কিনিয়া তবে

গলায় দিয়া মরিয়াছিল। পয়সা ভিন্ন আর কিছুই হয় না, তখন রসিক ইচ্ছা করিলেই যে, যা মনে করিবে তাই করিবে তাহাই বা হয় কোথা হইতে? শুঁড়ী ধার দেয় না। এক দিন দিল, দুই দিন দিল, আর হাত পাতিলে কথা কানে তোলেনা। সঙ্গীরাও যে কেহ দিবার, সে দুইএক দিনের জন্য দিল, তারপর তোমার ইচ্ছা হয় আপনার উপায় আপনি কর। কিন্তু উপায় কৈ? ঘরে তো ছেঁড়া মাদুর ভিন্ন কিছুই নাই। গতর খাটাইয়া যে কিছু করিবে,তাহারও আশা নাই। মাতাল বলিয়া কেহ কাজে লইতে চাহে না। কিন্তু পয়সা তো চাই--ই চাই। শুঁড়ী বেটা বড় নিষ্ঠুর, একদিন নাই বলিলে শুনে না। রসিক তবে করিবে কি? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া রসিক এক উপায় ঠাহরিল। ক্রমে পাড়ায় রাষ্ট্র হইল, রসিকের হাতটান দোষ জন্মিয়াছে।

পাড়ার সকলে যখন একথা লইয়া আন্দোলন করিতেছিল, তখন সে কথাটা হারাধনের কানে পৌছান কিছু বিচিত্র নহে। ক্রমে হারাধনও তাহা শুনিলেন। তাঁহার মনে হইল, কে যেন এক খানা প্রকাণ্ড পাথর তুলিয়া তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্রের উপর ফেলিয়া দিল। শুনিবামাত্র হারাধন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে সকলে তাঁহার চৈতন্য উৎপাদনে প্রবৃত্ত হইল। ক্ষণেক পরে সুস্থ হইয়া হারাধন উঠিয়া বসিলেন, সে দিন তিনি জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিলেন না, নির্জ্জনে একেলা বসিয়া কেবল যুক্তকরে উর্দ্ধমুখে সজল-নয়নে ভগবানের নিকট বার বার আপনার মৃত্যু কামনা করিতে লাগিলেন, দুঃখের গভীর নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে সেই দিন সেই স্নেহময় পিতা সেই প্রাণাধিক প্রিয়তম সামগ্রী পুত্রের মরণ কামনাও করিলেন। সেই সর্ব্বনেশে সংবাদ যত না হউক হারাধনের অবস্থা দেখিয়া পরিবারশুদ্ধ সকলে মহা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। সে দিন বাড়ীতে হাঁড়ি চড়িল না।

একদিন—তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল, ঘরে ঘরে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিয়া পুর-সুন্দরীরা শঙ্খধ্বনি করিতেছিল, কৃষাণেরা ক্ষেত হইতে ফিরিয়া আসিতেছিল, দুই একটা গোরু তখনও তাহার বাছুরটীকে দেখিতে না পাইয়া উচ্চে হাম্বারব করিতেছিল, গৃহিণী দাবায় বালকদিগকে খাওয়াইয়া তাড়াতাড়ি বাসন কয় খানি জলে ফেলিয়া আসিতেছিলেন, ছেলেরা বহি লইয়া আলোর সন্ধান করিতেছিল, কেহ ছুটাছুটি করিতেছিল, কেহ বা কান্নার সুর তুলিতেছিল, কেহ বা গল্প শুনিবার জন্য দিদিমার উপাসনা করিতেছিল, গোবর্দ্ধন ও

ভগবান্ দিনের কাজ সারিয়া দূর বাজার হইতে চাউল আদি কিনিয়া আনিয়াছিল, মাতা তাহা যতনে তুলিতেছিলেন, হারাধন এতক্ষণ একমনে পাট কাটিতেছিল, ভাইদিগকে প্রত্যাগত দেখিয়া পাটের টাকুরটী চালের বাতায় তুলিয়া রাখিয়া তাহাদিগের শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছিল, এমন সময় পাড়ার একজন আসিয়া ভগবানকে কাছে ডাকিল। ভগবান নিকটে গেলে তাহার কানে কানে কি বলিল, ভগবান্ শিহরিয়া উঠিল। ফিরিয়া আসিয়া হারাধনকে বলিল—"দাদা, রাত হইয়াছে, আহ্নিক করিবে কখন?" হারাধন ভগবানকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু দেখিলেন সত্যসত্যই অনেকটা রাত্রি হইয়া পড়িয়াছে আর বিলম্ব না করিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। ভগবান্ তখন সেই লোকটীকে গোবর্দ্ধনের নিকট ডাকিল। সে তাহার যাহা বলিবার তাহা পুনরায় বলিল। গোবর্দ্ধন শুনিয়া ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন "ভগবান, উপায়?'

ভগবান্ বলিল "তাইত দাদা, ভাবছি। দাদা এ কথা শুনলেতো আর জীবন্ত থাকিবে না।"

গোবর্দ্ধন সেই লোকটীকে বলিলেন "আচ্ছা, শুঁড়ীর পায়ে হাতে ধরিলেও কি সে দয়া করিয়া ছাড়িয়া দেয় না।"

লোকটী বলিল, 'আমরা তাহার বাকি কিছু রাখি নাই, সে তা কিছুতেই শুনে না। বলে, বমাল সমেত চোর ধরিয়াছি, পুলিসে চালান দিব।"

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া ভগবান্ বলিল "এক কাজ করিলে হয় না? শুনিয়াছি গদাধরের সঙ্গে ঘটোৎকচ সাহার বিশেষ আলাপ, গদাধর বলিলে ছাড়িয়া দিলে দিতে পারে। কিন্তু সে পাষণ্ডের মুখ দেখিতেতো ইচ্ছা করে না, তাহাকে অনুরোধ করিবই বা কি করিয়া?"

গোবর্দ্ধন একটু ভাবিল। তার পর বলিল—"ভগবান, সে অভিমান করিলে এখন চলিবে না, কোন মতে ছোঁড়াটাকে বাঁচাইতে হইবে। রসিক যদি জেলে যায়, তাহলে নিশ্চয়ই দাদা এক সপ্তাহের মধ্যে মারা পড়িবেন। এখন চল, দাদা কিছু না জানিতে জানিতে আমরা উহার একটা বিধান করিয়া আসি।"

ভগবান্ দেখিল, কথাটা মিছা নয়। মান অপমান এখন করিলে

আপনাদেরই ক্ষতি। তখন সেই লোকটীকে সঙ্গে লইয়া দুই ভাইয়ে গদাধরের নিকট গমন করিলেন।

—o—

একাদশ পরিচ্ছেদ।

গদাধর তখন আপনার কামরায় বসিয়া "মথিলিখিত সুসমাচার" পুস্তকখানি খুলিয়া দুই একটী বালককে পাঠ দিতেছিলেন, আর সেই পাঠের ব্যাখ্যায় খৃষ্টানি ধর্ম্ম যে কত উচ্চধর্ম্ম, ইহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফলই যে কত শীঘ্র হাতে হাতে ফলে তাহা একে একে বুঝাইতেছিলেন। বিশেষ এই ধর্ম্মাবলম্বীরা কখনই অসুখে থাকে না, পয়সার জন্য কাহাকেও ভাবিতে হয় না, ইচ্ছা করিলে মেম বিবাহ করা যায়, পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া খাও, শোও, আমোদ কর, আর রবিবার হইলে একবার মাত্র চর্চ্চে গিয়া চেয়ারে বসিয়া টানাপাখার হাওয়া খাইয়া গানবাজনা করিয়া যীশুর নাম কর। তোমার খরচের জন্য সাত সমুদ্র তের নদী পারে বসিয়া মিশনারি দল চিন্তা করিতেছে, তোমার যত খরচ পড়ে, মাসে মাসে তাহারা বিলাত হইতে হুণ্ডি করিয়া পাঠাইয়া দিবে। আবার একটা সাহেবের যত না মান, একজন বাঙ্গালি খৃষ্টানের তাহার অপেক্ষা অধিক মান, বিলাতে তাহাদের খুব পশার, মেমেরা তাহাদিগকে পাইলে আর সাহেব বিয়ে করিতে চাহে না। এমন মজার ধর্ম্ম কি আর আছে? গদাধর একে একে খৃষ্টধর্ম্মের অগণ্য মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছিলেন, আর হাঁ করিয়া বালকেরা সেই সব কথা শুনিতেছিল। যাহারা তাহাদের মধ্যে একটু অধিক বয়স্ক তাহারা মনে মনে কতই কল্পনা আঁটিতেছিল। সাহেব আর বাঙ্গালিতে বিবি আর বৌয়ে কত তফাৎ তাহা মনে মনে তৌল করিয়া বুঝিতেছিল, বুঝিতেছিল, যে ধর্ম্মে এত মজা অথচ খাটিয়া খাইতে হয় না, গাড়ি চড়িয়া পরের পয়সায় সাহেবিয়ানা করিয়া বেড়ান যায় তাহা কত সুখের। কি করিলে এই সুখের পথিক হওয়া যায় অনেকে তাহার জন্য মনে২ মতলব আঁটিতেছিল।

সেই তিনজন—গোবর্দ্ধন, ভগবান ও তাহাদের সঙ্গী ধীরে ধীরে গুরুপদ-

ক্ষিপ্রপদে গদাধরের কামারার বারাণ্ডায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। পদশব্দ শুনিয়া গদাধর হাঁকিলেন—"কেও ?"

স্পষ্ট উত্তর কিছু আসিল না। গোবর্দ্ধন ও ভগবান তখন কথা খুঁজিয়া পাইতেছিল না, সঙ্গী বলিল "আমরা।"

'আমরা। আমরা কে ?" গদাধর বাহিরে আসিলেন দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন। বলিলেন "গোবর্দ্ধন আর তুমি ভগবান—কি মনে করিয়া ?"

গদাধরকে দেখিয়া গোবর্দ্ধন পূর্ব্বকথা স্মরণ হইবামাত্র রাগে কাঁপিতেছিল। ভগবান এত কথা কহে তবু সহসা কি বলিবে স্থির করিতে পারিতেছিল না। তাহাদের সঙ্গী সমস্ত বুঝিয়া নিজেই বলিলেন "বড় বিপদে পড়িয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, বলুন আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। অন্য উপায় আমাদের আর নাই।"

গদাধর ভাবিলেন একি রহস্য ? এত দিনের পর একি কাণ্ড ? যাহা হউক, তিনি যে সকলের কর্ত্তাকর্ত্তা—মনে করিলে রাখিলে রাখিতে পারেন, মারিলে মারিতে পারেন, ইহা শুনিয়া বড়ই হর্ষ হইল। বলিতে কি, সর্দ্দারদিগের সেই দশা দেখিয়া তাঁহারও অন্তঃকরণে মধ্যে মধ্যে করুণার উদয় হইত। আজ গোবর্দ্ধন ও ভগবানকে যার পর নাই কাতর দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল! বলিলেন 'বল কি করিতে হইবে, আমি এখনই করিব। আমাদ্বারা এমন কি উপকারের প্রত্যাশা করিতে পারেন যে, তাহা আমি মনে করিলেই করিতে পারি ? আমি অতি সামান্য লোক—আমার ক্ষমতা কি ?"

এতক্ষণে ভগবান কথা কহিল। বলিল "আপনি অমন আজ্ঞা করিবেন না। আপনার বিশেষ ক্ষমতা আছে না জানিলে আমরা আপনার নিকট এ অবস্থায় আসিতাম না।"

গদাধর বলিলেন "তবে বলুন, শুনি।"

তখন ভগবান উপস্থিত বিপদের কথা কাঁদিয়া সমস্ত জানাইল, এবং যাহাতে তাহার প্রতিবিধান হয় তাহা করিবার জন্য বারবার সজলনয়নে অনুরোধ করিতে লাগিল। গদাধর ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া সম্মত হইলেন। তার পর একটু ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন "আপনাদের ছেলেরা যে বিগড়াইয়া যাইবে, তাহা আমি অনেকদিন হইতেই বুঝিয়াছিলাম। সত্য, মানুষের

অবস্থা কখন চিরদিন সমান থাকে না। যে কারণেই হউক, রাজা রাজড়ারও পতন হইয়া থাকে, তাই বলিয়া বালকদিগকে লেখাপড়া না শেখান উচিত নয়। লেখাপড়ার দোষ কি? ইহাতে ভাল ভিন্ন কখনই মন্দ হয় না। আজ যদি রসিক যেমন মন দিয়া পড়া শুনা করিতেছিল, তেমনি করিত তাহা হইলে কখনই আপনাদিগকে এ মনস্তাপ পাইতে হইত না। বরং রসিক দশ টাকা আনিয়া আপনাদের সংসারে সাহায্য করিতে পারিত। যাহা হউক, ইহাদিগকে স্কুল ছাড়াইয়া ভাল করেন নাই। তা, রসিকতো গিয়াছে, এখন নফরও যাহাতে অমন করিয়া বহিয়া না যায় তাহা এই সময় হইতে করা উচিত। আমার আর অধিক বলিবার কিছু নাই, নফরকে কাল হইতে স্কুলে পাঠাইয়া দিবেন। সাহেবকে বলিয়া যাহাতে মাহিযানা না লাগে আমি তাহা করিয়া দিব। কি বলেন? স্বীকার করুন।"

গোবর্দ্ধন ভগবান দুই ভাইয়ে পরামর্শ করিয়া দেখিল, কথাটা যুক্তিসঙ্গত বটে। তাহারা স্বীকার করিল, পরদিন প্রাতেই নফরকে পূর্ব্ববৎ স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিবে। গদাধর তখন শুঁড়ীর নামে একখানি চিঠি দিলেন। তিন জনে সেই চিঠি লইয়া শুঁড়ীর দোকানে উপস্থিত হইল। দেখিল, দোকানের এক পাশে দুই হাত বাঁধা রসিক দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে, শুঁড়ী পত্র পড়িবামাত্র তৎক্ষণাৎ রসিকের বন্ধন খুলিয়া দিল। রাত্রি যখন দশটা তখন গোবর্দ্ধন ও ভগবান রসিককে লইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন; বাড়ীর সকলে হঠাৎ দুইভায়ের না বলিয়া না কহিয়া চলিয়া যাওয়ায় মহা উৎকণ্ঠিত ছিলেন, হারাধন কেবল বাহিরের দিকে চাহিয়া বারম্বার দুর্গা দুর্গা করিতেছিলেন, গোবর্দ্ধন ও ভগবান আসিয়া আপনাদিগের অনুপস্থিতির একটা কল্পিত কারণ বলিল আসল কথা প্রকাশ করিল না। সকলে আহারাদি করিয়া শয়ন করিল।

প্রভাতে কেহই রসিকের দেখা পাইল না। সে অমন প্রায়ই চলিয়া যাইত বলিয়া কেহ বড় একটা খোঁজও করিল না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

হারাধনকে বলিয়া তাঁহার মত করিয়া প্রাতে ভগবান নফরকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া আসিল। নফর স্কুলে যাতায়াত করিতে লাগিল। হারাধন ও

আর আর সকলে রসিকের অনেক সন্ধান করিল, কোথাও কোন সংবাদ পাওয়া গেল না, হাজার মন্দ হউক, ছেলেতো বটে, হারাধন দিন কতক শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। সকলের অপেক্ষা বেশি শোক লাগিল— বুড়ীর। আহা, বুড়ী অনেক কষ্টে রসিককে মানুষ করিয়াছিল। কিন্তু কাঁদিলে আর কি হইবে? এত করিয়াও রসিকের কোন সন্ধান মিলিল না। ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল ততই সকলে রসিকের উপর হতাশ হইয়া নফরের উপর দ্বিগুণ আশা বাঁধিতে লাগিল। মানুষ এমনই আশার খেলানা বটে। যে মাটীতে পড়ে সেই মাটী ধরিয়াই আবার উঠিবার চেষ্টা করে।

নফর এখন গদাধরের বড় প্রিয় হইয়া পড়িয়াছে, সে বাড়ীতে প্রায়ই থাকিতে চায় না, কেবল বহি লইয়া গদাধরের কাছে পাঠ অভ্যাস করিতে যায়। গদাধরের সুখ্যাতি তাহার মুখে ধরে না। গদাধর প্রায়ই তাহাকে আপনার কাছে রাখেন, বহি ছিঁড়িয়া গেলে নিজে নূতন পুস্তক কিনিয়া দেন, কাপড় না থাকিলে কাপড় দেন, নফরের মুখ একটু শুষ্ক দেখিলে তখনি খাবার দেন। ছেলেরা নফরের বড়ই হিংসা করিতে আরম্ভ করিল। বালক নফর গদাধরের স্নেহে বশীভূত হইয়া পিতা মাতার নিকট তাহার কতই গুণ-কীর্ত্তন করিত। হারাধন শুনিয়া অবাক্ হইতেন। সত্য মিথ্যা জানিবার জন্য মাসে মাসে গোপনে তথ্য লইতেন, জানিতেন নফর কিছুই অধিক বলে না। ভগবানের মনে কিন্তু কিছু সন্দেহ হইল। ভাবিল, এত বাড়াবাড়ি কেন? ইহার ভিতর নিশ্চয়ই কোন গূঢ়তত্ত্ব আছে। ভগবান গোপনে থাকিয়া সেই গূঢ়তত্ত্বটুকু বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

হটাৎ গোবর্দ্ধনের বড় জ্বর হইল। জ্বর দুই দিনেই বাড়িয়া গেল। সকলে ভীত হইয়া পড়িল। কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া সকলে তাহার শুশ্রূষায় মন দিল। কিন্তু একদিন না খাটিলে যাহাদের দিন চলে না তাহাদের একেবারে কাজ কামাই দিলে বড় বিভ্রাট। ঘরে যাহা ছিল, তাহা এক দিনেই ফুরাইয়া গেল। দ্বিতীয় দিবস আর হাঁড়ি চড়িল না। অনাহারেই সকলে রুগ্নের সেবা করিতে লাগিল। নফর দুই দিন স্কুল কামাই করিয়াছিল, সেদিন স্কুল হইতে লোক ডাকিতে আসায় অনাহারে শুষ্কমনে নফর স্কুলে গেল। গদাধর তাহাকে দেখিয়া বলিলেন "নফর, আজ তোমার কি আহার হয় নাই?"

নফর কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল "মেজকাকার বড় শক্ত ব্যাম, আমাদের আজ রান্না হয় নাই।"

গদাধর তৎক্ষণাৎ নফরকে আপনার আহার ধরিয়া দিলেন। আহ্লাদে বালক তাহা ভোজন করিল। ভোজনাবশেষ কতকগুলি সামগ্রী রাখিয়া বলিল "যদি বলেনতো দৌড়াইয়া গিয়া এই কয়টী জিনিষ প্রসন্নকে খাইতে দিয়া আসি। প্রসন্নও আমার ন্যায় উপবাসে রহিয়াছে।"

প্রসন্ন! ছাঁৎ করিয়া গদাধরের কি মনে পড়িল। বলিল "তা, ও গুলা কেন, আমি আর ভাল জিনিষ। বাছি, তুমি দিয়া আইস।" গদাধরের নিকট খাবার লইয়া নফর দৌড়াইয়া বাহির গেল। কিন্তু প্রসন্ন যখন শুনিল যে সে সব খাবার গদাধরের প্রদত্ত, তখন খৃষ্টানের ছোঁয়া বলিয়া তাহার কিছুই স্পর্শ করিল না। বড় দুঃখে নফর ফিরিয়া আসিল।

তখনও গদাধর একস্থানে চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন, মনটা বড়ই বে-ইক্তিয়ার হইয়া গিয়াছিল। ছেলেরা মাঝে মাঝে পড়া জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়া বিরক্ত করিতেছিল, গদাধর তাহাদিগকে খিঁচাইয়া উঠিতেছিলেন; ভয়ে তাহারা জড়সড় হইয়া আপন আপন স্থানে গিয়া বসিতেছিল। এমন সময় নফর প্রত্যাগমন করিল। গদাধর তাহাকে কাছে ডাকিলেন। কি বলিবেন মনে করিলেন বলিয়া উঠিতে পারিলেন না। অথচ না বলিলে কষ্ট যায় না। গদাধর বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। কতক্ষণ পরে জিজ্ঞাসিলেন "প্রসন্ন কি আহার করিল?"

নফর অভিমানস্বরে বলিল "না।"

"না! কেন, নফর?" গদাধর চমকিয়া উঠিলেন।

"সে বলিল, তাহার প্রবৃত্তি নাই।' নফর আসল কথাটা ভাঁড়াইল।

গদাধর বলিলেন "তোমার মেজ কাকা কেমন আছেন?"

নফর বলিল "ভাল নয়।"

গদাধর বলিলেন "আমি একবার দেখিতে ইচ্ছা করি। চল এখনই যাই।"

নফরের সঙ্গে গদাধর গোবর্দ্ধনকে দেখিতে চলিলেন। গোবর্দ্ধনের অবস্থা সত্যই বড় ভাল ছিল না; কিন্তু গদাধরের সে সব দেখিবার তত ইচ্ছাও ছিল না, সে আবশ্যকতা ছিল না। তিনি যাহা দেখিতে গিয়াছিলেন চক্ষু ভরিয়া

তাহা দেখিতে লাগিলেন। ভগবান সে চাহনি দেখিয়া একবার কট্‌মট করিয়া গদাধরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। গদাধর চক্ষু নত করিল, ভগবান তৎক্ষণাৎ প্রসন্নকে বলিলেন "যাও মা, ও ঘরে গিয়া শোওগে।" প্রসন্ন স্থানান্তরে চলিয়া গেল। আরও কয়েকদণ্ড অপেক্ষা করিয়া গদাধর শূন্যমনে তথা হইতে ধীরে ধীরে প্রত্যাগমন করিলেন। ভগবান নফরকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন সে যেন আর কখনও গদাধরকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীতে লইয়া না আসে। ছোটকাকার কথায় নফর বড়ই ব্যথিত হইল, কিন্তু কিছু বলিতে তাহার সাহস কুলাইল না।

পরদিন আর বসিয়া থাকিলে চলে না, আপনারা উপবাসে থাকা যায়, কিন্তু পীড়িতের ঔষধ ও পথ্য না হইলে চলে না, ভগবান অগত্যা প্রভাতে কার্য্যের জন্য বাহির হইলেন। নফর তাহা দেখিল। সেদিন গদাধর তাহাদিগের বাড়ীতে যাইবার জন্য পুনরায় ইচ্ছা প্রকাশ করায় নফর তাহাকে তাড়াতাড়ি সঙ্গে করিয়া আসিল, তার পর তার ছোটকাকার ফিরিবার সময় আগত দেখিয়া তাড়াতাড়ি গদাধরকে লইয়া আবার স্কুলে ফিরিয়া গেল। এমনি ভগবানকে ভাঁড়াইয়া ৪। ৫ দিন ধরিয়া আনাগোনা চলিতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার পর ভগবান দূরগ্রাম হইতে এক মোট ধান মাথায় করিয়া গৃহে ফিরিতেছিল, হটাৎ পথে কাহার আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইল। ভগবান মোট মাথায় করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। একি! এ কাহার কণ্ঠধ্বনি? প্রসন্ন—প্রসন্নর গলা! ভগবানের সেই দৃঢ়পেশিযুক্ত মাংসল পদদ্বয় ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সেইখানে মোট ফেলিয়া, যে দিক্ হইতে শব্দ আসিতেছিল সেই দিকে দৌড়িল। বড় বন, তায় সেদিন অমাবস্যা, অন্ধকারে ভগবান কিছু দেখিতে পাইল না, কেবল সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া হাতড়িয়া হাতড়িয়া বনভেদ করিয়া যাইতে লাগিল। পদে পদে গতিরোধ হইতে লাগিল, বড় বড় ডালগুলা নত হইয়া পড়িয়া বড়ই বাধা দিতে লাগিল, অন্ধকারে ঠাহর না হওয়ায় গাছে গাছে মাথা ঠুকিয়া যাইতে লাগিল, কণ্টকে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইতে লাগিল, তবু ভগবান বন্য মহিষের ন্যায় সেই শব্দপথ অনুসরণ করিয়া দ্রুত চলিতে লাগিল। কিন্তু হায়, এত করিয়াও ভগবান সে আক্রান্তের কোন উদ্দেশ করিতে পারিল না। দূর—দূর—দূর—ক্রমে ভগবান যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই সে শব্দ তাহাকে

ছাড়াইয়া দূরগত হইতে লাগিল। ক্ষোভে রোষে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ক্ষিপ্তের ন্যায় ভগ্নোদ্যম ভগবান গৃহে ফিরিল। গৃহে আসিয়াই বিকৃত কণ্ঠে ডাকিল. "প্রসন্ন।' প্রসন্ন নাই। হারাধন আসিয়া কাঁদিয়া বলিলেন "প্রসন্ন নাই।" মূর্চ্ছিত হইয়া ভগবান সেইখানে পড়িয়া গেলেন।

অনেক শুশ্রূষার পর ভগবানের চৈতন্য হইল। ভগবান যাহা শুনিয়াছিল ও যাহা করিয়াছিল তাহা বিবৃত করিল। সকলে শুনিয়া আড়ষ্ট হইল। উপায়? সেই মরণদ্বারগমনোন্মুখ রোগী রোগযন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া চীৎকার ছাড়িয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। বলিল "ভগবান, উপায়? কৈ, আমার মা কৈ? আমার সোণার পুতলী কৈ? আমার মাকে নিয়ে এসে দেখাও, নহিলে এখনই আমি আছাড় খাইয়া প্রাণত্যাগ করিব।"

অনেক যত্নে হারাধন ও ভগবান গোবর্দ্ধনকে থামাইলেন। তৎক্ষণাৎ মসাল জ্বালিয়া ১০। ১৫ জন প্রতিবেশিকে সঙ্গে লইয়া ভগবান সেই বনের দিকে ছুটিয়া গেল। আতিপাতি করিয়া নানাস্থান খুঁজিল। কোথাও কাহারও সাড়াশব্দ মিলিল না। উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ভগবান বারবার 'প্রসন্ন প্রসন্ন' করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, কেহই সে ডাকের উত্তর দিল না। কপালে হাত চাপড়াইতে চাপড়াইতে ভগবান রাত্রি দুই প্রহরের পর নিষ্ফল হইয়া গৃহে ফিরিলেন, তখনও সেই পীড়িত নিদ্রা ভুলিয়া ভগবানের প্রত্যাশায় দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিয়াছিল, ভগবান আসিবামাত্র জোরে জিজ্ঞাসিল "কৈ ভগবান, দেখাও, আমার মাকে দেখাও।" গোবর্দ্ধন কন্যাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য উঠিয়া বসিয়া দুই হস্ত প্রসারণ করিল। ভগবান কপালে আঘাত করিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল।

"কি। মা নাই। মা—মা—মা—প্রসন্ন।" আর কথা সরিল না। সেই নিস্তব্ধ গৃহ কম্পিত করিয়া এই কথা কয়টী উচ্চারিত হইবামাত্র পীড়িতের মাথা ঘুরিয়া লুটাইয়া পড়িল। চকিতে ভগবান সে মাথা কোলে লইয়া ডাকিল— 'দাদা—দাদা।" সে ডাকের উত্তর না পাইয়া সকলে মুখের নিকট আলো লইয়া দেখিল, গোবর্দ্ধনের সর্ব্বাঙ্গ অসাড, চোখের তারা স্থির, দেহ হরিদ্রাবর্ণ। আলো ফেলিয়া ডাক ছাড়িয়া সকলে কাঁদিয়া উঠিল।

গ্রন্থকার versus পাঠক।

(মান্যবর শ্রীল শ্রীযুক্ত বিচারপতি সমালোচকের এজলাস।)

১নং গ্রন্থকার। ধর্ম্মাবতার! আমি প্রাণপণে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি করিয়াছি। শরীর, মন, ধর্ম্ম, অর্থ, কাগজ, কলম সকলই এই বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য নষ্ট করিয়াছি। কিন্তু এত করিয়াও আমার অন্ন জোটে না, কারণ পাঠকগণের নিকট আমার আদর নাই, তাহারা আমার প্রাপ্য দেয় না। এই আমার নালিশ, আপনি ইহার বিচার করুন।

বিচারকর্ত্তা। আপনি কি কি পুস্তক লিখিয়াছেন ?

১নং গ্রন্থ। আজ্ঞে, মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, গীতিকাব্য, নাটক, নবেল, প্রহসন, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল রকম পুস্তকই আমি লিখিয়াছি। আমার পুস্তকের সংখ্যা ছোটবড় লইয়া ১৫২ খানি, আমি উৎসাহ পাইলে এক এক নিশ্বাসে এক একখানি পুস্তক লিখিতে পারি, কিন্তু সেরূপ উৎসাহ আমায় কেহ দেয় না।

বিচার। (পাঠকগণের প্রতি) তোমাদের কিছু বলিবার আছে ?

পাঠকগণ। ধর্ম্মবতার, ইনি অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহার পোনের আনা উনিশগণ্ডা অসার, এক গণ্ডা ভালর জন্য ইহার ধারাবাহী গ্রন্থাবলী আমরা কিনিব কি করিয়া ?

বিচারকর্ত্তা। (১ নং গ্রন্থকারের প্রতি) ইহার উত্তর আপনি কি দিতে ইচ্ছা করেন ?

১ নং গ্রন্থ। একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি বঙ্গের প্রধান প্রধান সংবাদ ও সাময়িক পত্রের সমালোচনা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারিব যে, আমার সকল গ্রন্থই সারকথায় পরিপূর্ণ।

বিচার। সে সকল নজীর এখানে খাটিবে না, আপনার আর কিছু প্রমাণ আছে ?

১ নং গ্রন্থ। সাহিত্যজগতে আমার মান, সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট আছে।

বিচার। বেশ—তবে আবার কি চান ?

১ নং গ্রন্থ। আজ্ঞে, অন্য কিছুই নয়, কেবল পেট ভরিয়া খাইতে পাইলেই এ যাত্রা বাঁচিয়া যাই।

বিচার। যে উদর হইতে ১৫২ খানা পুস্তকের বিদ্যে বাহির হইয়া গিয়াছে, সে উদর ভরাণ বড় সহজ কথা নহে। আমি যথেষ্ট প্রমাণ অভাবে আপনার মকর্দ্দমা ডিস্‌মিস করিলাম।

(১নং গ্রন্থকারের অধোবদনে প্রস্থান এবং ২নং গ্রন্থকারের প্রবেশ।)

২নং। হুজুর। আমারো মকর্দ্দমা পাঠকের বিরুদ্ধে। কারণ তাহারা আমার পুস্তক যথেষ্ট পরিমাণে কেনে না। আমি তাহাদের আশায় পুস্তক ছাপাইয়া থাকি, কিন্তু দুঃখের কথা কি বলিব, এক হাজার কাপির মধ্যে বড় জোর ১০ খানা বিক্রয় হয়, বাকি সমস্ত স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া থাকে। সে দৃশ্য অসহ্য হওয়ায় একদিন রাগ করিয়া সমস্ত পুস্তক ষোল আনার মাল এক আনা হিসাবে বিক্রয় করিয়া ফেলি। তখন ভাবিয়াছিলাম, যাহা পাইলাম, সমস্তই লাভ। এখন দেখিতেছি, আমার সমস্তই লোকসান হইয়াছে।

বিচার। আপনার গৃহে আর পুস্তক আছে ?

২নং। আজ্ঞে, না। একখানিও নাই।

বিচার। যে মূল্যেই হউক, পাঠকে যখন সমস্তই কিনিয়াছে, তখন পাঠকের বিরুদ্ধে আপনার এ মকর্দ্দমা আর টিকিতে পারে না।

২নং। আজ্ঞে, পাঠকে সমস্ত কেনে নাই।

বিচার। তবে কাহাকে সমস্ত বিক্রয় করিয়াছিলেন ?

২নং। সে একজন পুস্তক বিক্রেতাকে।

বিচার। ও বুঝিয়াছি। তার পর।

২নং। তার পর পুস্তকবিক্রেতা শেষে ওজনদরে পর্য্যন্ত আমার পুস্তক বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও যেমন স্তূপাকার তেমনি স্তূপাকারই রহিয়াছে। এমন কি গুদাম বোঝাই হইয়া শেষে তাঁহার শয়নগৃহ পর্য্যন্ত আমার পুস্তকে বোঝাই হইয়া গিয়াছে। বিক্রেতা এখন মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছে, তাহারও লোকসান হইয়াছে, আর আমারত ষোল আনাই লোকসান।

বিচার। এই বলিলে ষোল আনার মাল এক আনা নগদমূল্যে বিক্রয় করিয়াছ, তবে ষোল আনাই লোকসান হইল কিসে?

২নং। আজ্ঞে, দোকানদার শেষে সেই এক আনা কমিসনে বাদ দিয়াছে।

বিচার। বুঝিলাম, দোকানদার বিনামূল্যে আপনার সমস্ত পুস্তক খরিদ করিয়াছে, কিন্তু তবে তাহার আবার লোকসান হইল কিসে?

২নং। বিজ্ঞাপন খরচায় এবং গুদাম ভাড়ায়।

বিচার। আপনি কি কি পুস্তক লিখিয়াছেন?

২নং। কবিতাই আমার প্রাণ, আমি অনেকগুলি কাব্য লিখিয়াছি। ইহা ব্যতীত উপন্যাস নাটকাদিও আমার আছে।

বিচার। (পাঠকগণের প্রতি) এ মকর্দ্দমার জবাব তোমরা কি দিতে ইচ্ছা কর?

পাঠক। ধর্ম্মাবতার! এই নবীন গ্রন্থকার একজন লেখক ভাল বটে, কিন্তু ইহার সাংসারিক কোন কষ্ট নাই, কারণ ইহার পিতা অনেক অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন, এদেশের বড় মানুষের ছেলেরা সচরাচর যেরূপ অর্থের অপব্যয় করিয়া থাকেন, তাহা না করিয়া ইনি পুস্তক ছাপাইয়া সেই অর্থের সংব্যয়ই করিয়াছেন।

বিচার। কেমন, আপনার পিতা অনেক অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন?

২নং। আজ্ঞে হাঁ।

বিচার। হুকুম হইল—অতঃপর ফরিয়াদী নিজের অর্থে পুস্তক ছাপাইয়া পাঠকগণকে বিনামূল্যে বিতরণ করিবেন, কারণ এরূপ না করিলে গরিব পুস্তক বিক্রেতাগণ মারা যাইবে।

এই সময় ৩নং গ্রন্থকার তাড়াতাড়ি আসিয়া নিবেদন করিল—"হুজুর! ধর্ম্মাবতার! খোদাবন্দ! আমি, একজন গ্রন্থকার। বিনামূল্যের পুস্তকেরই ব্যবসা করিয়া থাকি, কিন্তু তত্রাচ আমার খরিদার নাই।"

বিচার। (পাঠকগণের প্রতি) কিছু জিজ্ঞাসা আছে?

পাঠক। আজ্ঞে হাঁ। (গ্রন্থকারের প্রতি) আপনি সে সকল পুস্তক যে নিজে লিখিয়া থাকেন, তাহার কিছু প্রমাণ আছে?

৩নং। আছে—অবশ্যই আছে।

পাঠক। কি প্রমাণ ?

৩নং। গ্রন্থের উপর ছাপার অক্ষরে আমার নাম লেখা আছে।

পাঠক। আপনি কোন্ পুস্তকে কি কি বিষয় লিখিয়াছেন, এইখানে দাঁড়াইয়া পুস্তক না দেখিয়া বলিতে পারেন ?

৩নং। তা—তা—তা কেমন করে বলিব।

পাঠক। আচ্ছা, আপনার পুস্তকত বিনামূল্যেই দেন, কিন্তু ডাকমাশুলাদির ব্যয় কিছু লইয়া থাকেন ?

৩নং। থাকি।

পাঠক। কত ?

৩নং। তিন টাকা চারি আনা মাত্র।

বিচার। পুস্তকের ওজন কত হে বাপু ?

৩নং। আজ্ঞে, তা প্রায় বিশ তোলা হইবে।

বিচার। বিশ তোলার ডাকমাশুল কত লাগে ?

৩নং। এক আনা।

বিচার। ডাকমাশুলের ব্যয় গেল ⁄০ এক আনা, তবে বাকি তিন টাকা তিন আনা কিসের ব্যয় ?

৩নং। আজ্ঞে সে সব আদির ব্যয়।

বিচার। হুকুম হইল—"গ্রন্থকার প্রতারক তাহার নালিশের কোন কারণ নাই। আদালতের সময় বৃথা নষ্ট করার জন্য ১০৲ টাকা জরিবানা।"

(কাঁদিতে কাঁদিতে ৩নং গ্রন্থকারের প্রস্থান এবং হাসিতে হাসিতে ৪নং গ্রন্থকারের প্রবেশ।)

৪নং। ধর্ম্মাবতার! আমি একজন গ্রন্থব্যবসায়ী।

বিচার। গ্রন্থব্যবসায়ীর বিচার এখানে হইতেছে না। এখানে গ্রন্থকারের বিচার হইতেছে।

৪নং। আজ্ঞে, সে কথাটা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আমিও একজন গ্রন্থকার এবং বিচারের প্রার্থনা করি।

বিচার। তোমার প্রার্থনা কি ?

৪নং। ধর্ম্মাবতার! আমার দুঃখের কথা কি বলিব ? (ক্রন্দন) আমার এত সাধের পুস্তকখানি যাহা আমি স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিয়া ছাপাইয়া

ছিলাম, সে পুস্তক সিকিমূল্যেও এখন কেহ খরিদ করে না! (ক্রন্দন) তার পর সব মাটি হয় দেখে, কোন বন্ধুর নিকট টাকা হাওলাত করে এক বিজ্ঞাপন দিলাম—"যে কোন গ্রাহক মায় ডাকমাশুল সিকি মূল্য চারি আনা দিয়া আমার সাধের পুস্তক ক্রয় করিবেন, তাঁহাকে ৫৲ পাঁচ টাকা মূল্যের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক, ১০৲ টাকা মূল্যের ঘড়ি, এবং আরো এক টাকা মূল্যের যে কোন জিনিষ আবশ্যক হইবে, আমরা নিজ হইতে ডাকমাশুল দিয়া উপহার পাঠাইয়া দিব।" দুঃখের কথা বলিব কি? এরূপ প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী উপহার কাণ্ডেও আমার সকল আশা ভরসা লণ্ডভণ্ড হইয়া গিয়াছে। বিজ্ঞাপনের খরচাও উঠে নাই। লাভের আশাত এখন চুলোয় যাক্।

বিচার। তুমি এরূপ বিজ্ঞাপন দিয়া লাভের আশা করিয়াছিলে! ষোল পয়সার পুস্তকের উপহার ষোল টাকা, লাভটা কিরূপে হইবে হে বাপু?

৪নং। আজ্ঞে, কাট্তির মুখেই লাভ।

বিচার। আসামীদিগকে আর ডাকিবার আবশ্যক নাই, ফরিয়াদী একজন ভয়ানক জুয়াচোর! আমি ইহাকে ফৌজদারী সোপরদ্দ করিলাম।

তখন আদালতের মধ্যে মহা একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ আর কোন গ্রন্থকার কাটগড়ায় আসিয়া দাঁড়াইতে সাহস করিল না। এজলাস একেবারে গরম হইয়া উঠিয়াছে। এমন সময় ধীরে ধীরে ৫নং গ্রন্থকার আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মলিনবেশ, শীর্ণ দেহ এবং শুষ্কমুখ দেখিয়া বিচারপতির একটু দয়া হইল। তাহাতে এজলাসের গরমটা, কতক কমিয়া গেল দেখিয়া গ্রন্থকার উচ্চৈঃস্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন। "ধর্ম্মাবতার! আমি একজন স্কুল পাঠ্যপুস্তক প্রণেতা। স্কুল পাঠ্যপুস্তক লিখিয়া অনেকেই বড় লোক হইয়া গিয়াছে, তাহাদের প্রণীত পুস্তক অপেক্ষা আমার পুস্তক কোন অংশেই ন্যূন নহে, অথচ তাহারা গাড়ি ঘোড়া চড়িয়া বেড়াইতেছে, আর আমি উদরান্নের জন্য লালায়িত। আপনি ইহার বিচার করুন।

বিচার। (পাঠকগণের প্রতি) এ মকর্দ্দমার জবাব কি?

পাঠক। ধর্ম্মাবতার! আমরা স্কুল পাঠ্যপুস্তক যথেষ্ট কিনিয়া থাকি। তাহার প্রমাণ পুস্তক বিক্রেতাগণের খাতা। তবে এ গ্রন্থকারের পুস্তক স্কুলবুক কমিটির মনোনীত নহে, সুতরাং সে পুস্তক স্কুলে চলে না, ইহাতে আমাদের অপরাধ কি?

বিচার। কেমন আপনার পুস্তক স্কুলবুক কমিটিতে মনোনীত হয় নাই ?

৫নং। আজ্ঞে হয় নাই, তাহার কারণ সে কমিটিতে আমার আত্মীয় বন্ধু কেহ নাই।

বিচার। এ মকর্দ্দমা এ আদালতের এলাকাধীন নহে, ইহার উপযুক্ত আদালত District charitable society, সেই আদালতে এ মকর্দ্দমার নথী পাঠান গেল।

তখন ৬ নং গ্রন্থকার হাঁপাইতে হাঁপাইতে আদালতের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল—"আমি একজন প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত ঔপন্যাসিক। স্কুল পাঠ্যপুস্তক বাদে এক উপন্যাস ব্যতীত বাঙ্গালায় আর কোন পুস্তকেরই কাটতি নাই দেখিয়া আমি উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করি। বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান ঔপন্যাসিক অপেক্ষা আমার উপন্যাসগুলি সংখ্যায় বেশী এবং ওজনে ভারি। ইহা আমি স্বয়ং গণিয়া এবং স্বয়ং দাঁড়িপাল্লায় ওজন করিয়া দেখিয়াছি ; সুতরাং সে সকল উপন্যাস অপেক্ষা আমার উপন্যাসের কাটতি কেন অধিক হয় না, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। পাঠিকাগণ আমার উপন্যাসের বিশেষ আদর করিয়া থাকেন, সুতরাং আমার এ নালিশ তাহাদের বিপক্ষে নহে। কিন্তু পাঠকগণের দৌরাত্মে আমার উপন্যাস সকল সিকির সিকি মূল্যে আমি নিজে মাথায় করিয়া দোকানদারের ঘরে দিয়া আসিতেছি, তত্রাচ পাঠকগণ তাহা ক্রয় করে না। আপনি ইহার বিচার করুন।

বিচার। (পাঠকগণের প্রতি) কোন জবাব দিতে ইচ্ছা কর ?

পাঠক। ইনি একজন "হাম্‌বড়া" গ্রন্থকার, কেবল খুঁড়িয়ে বড় হইবার ইচ্ছা। বর্ষাকালের দামোদরের ন্যায় মূর্ত্তিমান দম্ভাবতার। সর্ব্বপ্রধান ঔপন্যাসিকের সহিত তুলনায় ইনি বিশাল পর্ব্বতের নিকট যেন একটি বালিকা কণা !

৬নং। (ক্রোধে) সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা, এরূপ মিথ্যা কথা কল্পনারও অতীত। এরূপ কথা আমার সম্মুখে এপর্য্যন্ত কেহ বলিতে সাহস করে নাই। এখন এই আদালতের মধ্যে আমি কি করি ? এরূপ অপমান কখনই সহ্য হয় না।

এই কথা বলিতে বলিতে গ্রন্থকার রাগে অন্ধ হইয়া আপনার চুল ও দাড়ি ছিঁড়িতে আরম্ভ করিলেন। বিচারপতি বেগতিক দেখিয়া তৎক্ষণাৎ হুকুম

দিলেন—"এই মকর্দ্দমা এখন মুলতবী রহিল; কিন্তু আপাতক ফৈরিয়াদীকে Lunatic Asylumএ পাঠান গেল।"

এই সময় পেষকার বিচারপতিকে বলিল—"৭নং গ্রন্থকার স্বয়ং হাজির না হইয়া তাঁহার উকিল পাঠাইয়াছেন।"

বিচার। উকিলের দ্বারাই মকর্দ্দমা চলিতে পারে।

তখন ৭নং গ্রন্থকারের উকিল দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—'আমার মক্কেলের দুর্ভাগ্য যে তিনি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইংরাজী ভাষায় তিনি যাহা কিছু লিখিয়াছেন শতসহস্র বাঙ্গালি ও ইংরাজ পড়িয়া তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালায় তাঁহার গভীরতত্ত্বপূর্ণ লেখার আর কেহ তত্ত্ব লয় না। এই নাটকনবেলপ্লাবিত বঙ্গদেশে সে সকল মূল্যবান তত্ত্বের কিছুই আদর নাই। যাহাতে পাঠকগণের রুচি পরিবর্ত্তন হয় তাহা করুন।

বিচার। (পাঠকগণের প্রতি) আপনাদের কোন কথা বলিবার আছে?

পাঠক। আমরা সে সকল লেখা বুঝিতে পারি না।

বিচার। হুকুম হইল—৭নং গ্রন্থকার ডিক্রি পাইলেন, কিন্তু এ ডিক্রি তিনি এখন জারি করিতে পারিবেন না, ভবিষ্যতে তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ এই ডিক্রি পাঠকগণের উপর জারি করিয়া মায় সুদ ও খরচা আদায় করিয়া লইবেন।

তখন একটী ডিক্রি হইয়া যাইতে দেখিয়া পঙ্গপালের ন্যায় গ্রন্থকারগণ "আমি গ্রন্থকার, আমি গ্রন্থকার,' বলিয়া হাঁকিতে লাগিল, কিন্তু এদিকে 'আমি গ্রন্থকার" উচ্চারিত হইতে না হইতেই বিচারপতিও "ডিস্‌মিস্—ডিস্‌মিস্" হাঁকিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ ধরিয়া আদালতগৃহ "আমি গ্রন্থকার ও ডিস্‌মিস্' রবে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

নাটকের নাটকত্ব।

কেহ কেহ দুঃখ করিয়া বলিয়া থাকেন যে বাঙ্গালায় উৎকৃষ্ট নাটক একখানিও নাই। বাস্তবিক কথাটা উড়াইয়া দিবার নহে। কিন্তু এদিকে এ কথাটা

আবার অনেকের প্রাণে বড়ই আঘাত করিবে। তাঁহারা বলিলেন—দশ পোনের বৎসর পূর্ব্বে যে বঙ্গদেশে নাটকের এত ছড়াছড়ি ছিল, সে বঙ্গদেশে একখানিও উৎকৃষ্ট নাটক নাই। এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমরা বলি, এখন সে ছড়াছড়িটা কমিয়াছে, নাটকের স্রোতের টানে পড়িয়া হাবুডুবু খাইবার ভয় এখন আর নাই, সুতরাং জমা খরচটা এই সময় একবার মিলাইয়া দেখিলেই ভাল হয়।

বাঙ্গালায় ভাল নাটক যে একখানিও নাই একথা আমরা বলি না, কিন্তু আদর্শ নাটকের সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত নাটক যে একখানিও নাই একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে বাধ্য। আর একথাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি যে বঙ্গীয় প্রসিদ্ধ নাটককারগণও তাঁহাদের প্রণীত অনেক নাটকের নাটকত্ব কিছুই বজায় রাখিতে পারেন নাই। কেহ এরূপ মনে করিবেন না, যে আমরা সমগ্র বঙ্গীয় নাটক লেখকগণের নিন্দা করিতেছি। তাঁহাদের দ্বারায় যে বাঙ্গালা সাহিত্যের কিছুই উন্নতি হয় নাই, এ কথা বলিতে কে সাহস করিবে ? তবে আমাদের কথাটা এই উপন্যাসে যেমন বঙ্গীয় সাহিত্যভাণ্ডার উজ্জ্বল হইয়াছে, নাটকে তেমন হয় নাই। বাঙ্গালায় এরূপ উপন্যাস আছে যে পৃথিবীর সকল ভাষার উপন্যাসের সহিতই তাহা প্রতিযোগীতা করিতে পারে,কিন্তু বাঙ্গালায় সেরূপ নাটক কৈ ?

স্বর্গীয় মাইকেল ও দীনবন্ধু অনেকগুলি নাটক লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে দুই তিন খানি ভিন্ন অন্য নাটক কয়েকখানি নাটকত্ব বর্জ্জিত। যাহা হউক মাইকেল ও দীনবন্ধু বঙ্গীয় নাটক লেখকগণের শীর্ষস্থানীয়, তাঁহাদের দ্বারা বাঙ্গালা নাটকের অনেক উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারাও অনেক দিন হইল স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন, তবে তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গেই কি বাঙ্গালা নাটকের লোপ হইবে ?—না। মাইকেল দীনবন্ধু গিয়াছেন, কিন্তু এখনও মনমোহন, জ্যোতিরীন্দ্র, গিরীশ প্রভৃতি নাটককার রহিয়াছেন। ইহারা রহিয়াছেন বলিয়াই আমরা আজিকার এই প্রস্তাবে হস্তক্ষেপ করিলাম।

উপন্যাস লেখা যেরূপ সহজ, নাটক লেখা সেরূপ সহজ নহে। সকল নাটকই উপন্যাস হইতে পারে, কিন্তু সকল উপন্যাস নাটক হইতে পারে না। একটি গল্প লইয়া সেই গল্পে বর্ণিত চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে পারিলেই একখানি উপন্যাস হইল। কিন্তু একটি গল্প লইয়া সেই গল্প বর্ণিত

চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে পারিলেই একখানা নাটক হয় না। নাটকের আরো কিছু বিশেষত্ব আছে, নাটকে একটা ঘাতপ্রতিঘাত চাই। সেই টুকুও ইহার নাটকত্ব। আমরা এখন নাটকত্ব বুঝাইতেই এই প্রস্তাবে হস্তক্ষেপ করিয়াছি।

একটি অদ্ভুত ঘটনাপরিপূর্ণ গল্প রচনা করিতে পারিলেই তাহা একখানি নাটক হয় না। গল্প নাটকের প্রাণ নহে, একটা বাহ্যিক শোভা মাত্র। প্রসিদ্ধ নাটককারগণ নিজে গল্প রচনা না করিয়া প্রচলিত গল্প লইয়া নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। কালিদাস, সেক্সপীয়র এবং গেটি প্রভৃতির প্রধান প্রধান নাটকই প্রচলিত গল্প লইয়াই লিখিত। তবে সেই সকল গল্পকে একটু আধটু পরিবর্তন করিয়া তাঁহারা নাটকোপযোগী করিয়া লইয়া থাকেন। গল্পকে নাটকোপযোগী করা কিম্বা নাটকোপযোগী গল্প রচনা করিয়া লওয়াই নাটককারগণের গল্পসম্বন্ধীয় নাটকত্ব। ফল কথা যে সে গল্প লইয়া ভাল নাটক হয় না।

এইত গেল গল্প সম্বন্ধে। তাহার পর নাটকের চরিত্র। নাটকের চরিত্রেতেই নাটকের প্রধান নাটকত্ব প্রকাশ পায়। এই থানেই নাটককারের কল্পনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কিরূপ অবস্থায় পড়িয়া কিরূপ কার্য্য করিলে সেই চরিত্র পরিস্ফুট হয়, এই সকল দেখানই নাটককারগণের বাহাদুরী। কোন্ চরিত্রের কিরূপ প্রকৃতি, সেই প্রকৃতির কার্য্যই বা কি, তাহা দেখাইতে না পারিলে উৎকৃষ্ট নাটক হয় না। আমি মুখে বলিলাম, আমার নায়ক ধার্ম্মিক, সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়বান, ইন্দ্রিয়সংযমী কিন্তু এই সকল কার্য্যে না দেখাইতে পারিলে নাটক হয় না। আমি যদি নিজে সাহসীও বীরপুরুষ বলিয়া পরিচয় দিই—কিন্তু কখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাই না, কখন বীরের ও সাহসের কার্য্য করি না, তাহা হইলে কে আমাকে বীর ও সাহসী বলিয়া স্বীকার করিবে? পরীক্ষা ভিন্ন কোন বিষয়েরই যেমন স্থিরতা করিতে পারা যায় না, সেইরূপ নাটকের বর্ণিত চরিত্রেরও পরীক্ষা আবশ্যক, তাহা হইলেই আমরা সে চরিত্রের নাটকত্ব বুঝিতে পারি। এই চরিত্রগত নাটকত্বই নাটকের প্রধান নাটকত্ব।

ইহা ব্যতীত আরো কয়েকটি নাটকত্ব আছে, তাহাদের মধ্যে প্রধান—নাটক রচনার কৌশল (Art)। এই কৌশল জানা না থাকিলে কেহই উৎকৃষ্ট নাটককার হইতে পারেন না।

মহাকবি কালিদাস ও Shakespeare জগতের প্রধান নাটককার। ইহাঁদের নাটকে আমরা এই নাটকত্বটুকু যত পরিস্ফুট দেখিতে পাই, এরূপ আর কোন কবির নাটকে দেখিতে পাওয়া যায় না। কালিদাসের শকুন্তলা আর Shakespeareএর Merchant of Venice এই দুইজন প্রধান নাটককারের দুইখানি প্রধান নাটক অবলম্বন করিয়া আমরা নাটকের নাটকত্ব দেখাইতে চেষ্টা করিব।

মহাভারতের শকুন্তলোপাখ্যানই কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের মালমস্‌লা। এখন দেখা যাউক, মহাভারতের শকুন্তলোপাখ্যান জিনিষটী কি? মহাভারতে যে ভাবে শকুন্তলোপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে এই গল্প লইয়া ইহা একখানি বেশ প্রণয়মূলক উপন্যাস হইতে পারে, কিন্তু নাটক হইতে পারে না। তত্রাচ এই সামান্য Material হইতে কালিদাস কি অপূর্ব্ব কৌশলে ইহাকে নাটকে পরিণত করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কালিদাস দেখিলেন দুষ্মন্তচরিত্র নাটকের নায়কোপযোগী চরিত্র। দুষ্মন্ত মহাভারতের বর্ণনায় একজন সচ্চরিত্র, সদ্বংশজাত, ধার্ম্মিক, প্রজারঞ্জক নৃপতি। আরো বর্ণিত আছে "বলে তিনি বিষ্ণুতুল্য, তেজে ভাস্কর তুল্য, গাম্ভীর্য্যে সাগরতুল্য ও সহিষ্ণুতাতে ধরাতুল্য ছিলেন।" সুতরাং এই দেবতুল্য নৃপতি যে একখানি নাটকের নায়ক হইবার উপযুক্ত পাত্র, এবিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তাহার পর দেখিলেন শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত এবং জীবনের ঘটনাবলীও বেশ Romantic ধরণের, সুতরাং শকুন্তলা চরিত্র? একখানি Romantic নাটকের বেশ উপযুক্ত নায়িকার চরিত্র। আর শকুন্তলার উপাখ্যান গল্পাংশেও চমৎকার। সুতরাং এখন গল্প ও চরিত্র এই দুই Material কালিদাস মহাভারত হইতেই পাইলেন। বাকি—এই গল্প আর চরিত্রকে নাটকের উপযোগী করিয়া লওয়া। সেই জন্য কালিদাস গল্পটীর শেষভাগ পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেন, ইহার মধ্যে দুর্ব্বাসার অভিশাপ প্রবেশ করাইয়া দিলেন, তখন ইহা একখানি নাটক হইল। বাস্তবিক শকুন্তলা নাটকের মধ্যে দুর্ব্বাসার অভিশাপ ও অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় ঘটনা না থাকিলে শকুন্তলা নাটক হইত না। ইহাই শকুন্তলা নাটকের নাটকত্ব। এই নাটকত্ব মহাভারতের শকুন্তলা উপাখ্যানে নাই। মহাভারতে বর্ণিত আছে—

মহর্ষি কণ্বের অনুপস্থিতকালে দুষ্মন্ত তাঁহার আশ্রমে গিয়া গন্ধর্ব্বমতে

শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়া চলিয়া আসেন। সেই আশ্রমেই দুষ্মন্তের ঔরসজাত শকুন্তলায় এক পুত্র জন্মায়। তখন মহর্ষি শিষ্য সমভিব্যাহারে শকুন্তলাকে দুষ্মন্তের নিকট পাঠাইয়া দেন। কিন্তু দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, এবং শকুন্তলা সম্বন্ধে তাঁহার কোন কথা স্মরণ নাই—এইরূপ বলেন। এই কথা লইয়া সভামধ্যে বাক্‌বিতণ্ডা চলিতেছে, এমন সময় শকুন্তলাকে গ্রহণ করিবার জন্য স্বর্গ হইতে দেবগণ দুষ্মন্তকে আকাশবাণী করিলেন। সব গোল মিটিয়া গেল—তাহাতেই দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে গ্রহণ করিলেন, আর এই বলিয়া রাজা তখন শকুন্তলার নিকট নিজে সাফাই হন যে, তাঁহাদের বিবাহ সকলের অজ্ঞাতে গোপনে সম্পন্ন হইয়াছিল সুতরাং সহজে গ্রহণ করিলে হয়ত লোকে রাজাকে কামপরবশ এবং শকুন্তলাকে কুলটা মনে করিতে পারিত। [illegible] সেই শকুন্তলা উপাখ্যানের শেষ এবং ইহাই মহাভারত বর্ণিত শকুন্তলা [illegible]ন। এই উপাখ্যানের সহিত দুর্ব্বাসার অভিশাপ ঘটনাদি মিশ্রিত করিয়াই কালিদাস ইহাকে পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক করিয়াছেন। এইরূপ সুন্দর কৌশল শকুন্তলাতে আরো আছে, সেই সকলই ইহার নাটকত্ব।*

দুর্ব্বাসার অভিশাপেই দুষ্মন্ত শকুন্তলার বিষয় সমস্তই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। এদিকে শকুন্তলা রাজার সম্মুখে আসিয়া বলিল—"আমি আপনার পরিণীতা ভার্য্যা, আমায় গ্রহণ করুন।" কিন্তু দুষ্মন্তের তখন শকুন্তলার কথা কোন ক্রমেই স্মরণ হইল না, সুতরাং শকুন্তলা তাঁহার পক্ষে পরস্ত্রী। এখন দুষ্মন্ত যে কিরূপ ধার্ম্মিক ও ইন্দ্রিয় সংযমী তাহার পরীক্ষা হইয়া গেল। তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে একটী ঘাতপ্রতিঘাত হইতে লাগিল। একদিকে অলৌকিক রূপযৌবনসম্পন্না রমণী আর অপর দিকে ধর্ম্ম। দুষ্মন্ত এই মহা পরীক্ষায় জয়ী হইলেন, এরূপ প্রলোভন তাঁহার হৃদয় মুগ্ধ করিতে

---

* শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার "শকুন্তলাতত্ত্ব" নামক পুস্তকে সে সকল সুন্দররূপে দেখাইয়া গিয়াছেন, সুতরাং এস্থলে সে সকল পুনরুল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই। সকলকেই সেই পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

পারিল না। তিনি বাহ্য শক্তিদ্বারা অনুশাসিত না হইয়া বাহ্য শক্তিকে আপনার বশে আনিলেন। ইহাতেই নাটকের সৃষ্টি হইল।

এখন শকুন্তলা ছাড়িয়া Merchant of Veniceএর নাটকত্ব কি একবার দেখা যাউক। Shakespeare দুইটী সামান্য গল্প অবলম্বন করিয়া এই সুন্দর নাটকখানি লিখিয়াছেন। ইহার প্রথম গল্পটী একটি Jewএর গল্প। Jew তাহার এক শত্রুকে এই মর্ম্মের তমসুকে টাকা ধার দেয় যে, নির্দ্ধারিত দিনে টাকা পরিশোধ করিতে না পারিলে খাতক নিজের দেহ হইতে একপাউণ্ড মাংস কাটিয়া দিবে। দ্বিতীয় গল্পটি The Heiress and the Casketsএর গল্প। এই সুন্দরীর ধনী পিতা মৃত্যুকালে কন্যাকে অতুল ধনরাশির সহিত তিনটী বাক্স (Casket) দিয়া যান, এবং বলিয়া যান যে এই তিনটী বাক্সের মধ্যে আমার মনোনীত বাক্সটি যে বাছিয়া লইতে পারিবে, তাহাকেই তুমি পতিত্বে বরণ করিবে। ভাবিলে

জুর গল্পে ভাগ্যলক্ষ্মীর পরিবর্ত্তন এবং প্রতিশোধের প্রতিশোধ এই দুইটী চিত্র দেখান হইয়াছে। Antonioর ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রতি অধিকতর বিশ্বাস ছিল, সেই কারণ তিনি কষ্ট পাইলেন। আর Shylock প্রতিশোধ লইতে গিয়া নিজে প্রতিশোধ পাইলেন। এখন কথা হইতেছে—একজন টাকা ধার লইয়া নির্দ্ধারিত দিনে সেই টাকা পরিশোধ করিতে না পারিলে গায়ের মাংস কাটিয়া দিবে এরূপ অসম্ভব কথা গল্পে থাকিতে পারে, কিন্তু নাটকে কিরূপে খাটিবে? Shakespeareএর নাটক লিখিবার কৌশলকে (Art) ধন্যবাদ! তিনি যেরূপ কৌশলে এক কথার পর সেই আনুসঙ্গিক অন্য কথা পাড়িয়া এইরূপ অসম্ভব কথাকেও সম্ভব করিয়া লইয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে এদেশের ন্যায় ইউরোপেও টাকা ধার দিয়া সুদ গ্রহণ করা সমাজের অনুমোদিত ছিল না, যে লইত, তাহাকে সকলেই ঘৃণা করিত। সেকালের লোকেরা জানিতেন যে একমুষ্ঠি বীজ মাটিতে ছড়াইয়া দিলে তাহা হইতে রাশি রাশি শস্য উৎপন্ন হইতে পারে, একটি ছাগী কিম্বা ভেড়ী পুষিলে তাহা হইতেও অনেক ছাগল ও ভেড়া উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু সোণা ও রূপা ধাতুমাত্র, ইহারা আবার যে বংশবৃদ্ধি করিতে পারে তাহা তাঁহারা জানিতেন না। টাকা ধার লইবার সময় যখন Antonio আর Shylockএ বাক্-

বিতণ্ডা চলিতেছিল, তখন Antonioর মাথার মধ্যে এই ভাবটী আসিয়াছিল, সেই কারণে Antonio রাগান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

————When did friendship take
A breed for barren metal of his friend ?

Shylock যে উত্তর দিলেন, সে উত্তর শুনিয়া বাধ্য হইয়া এণ্টনিও পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

Is your gold and silver ewes and rams ?

Shylock উত্তর করিলেন—

I can not tell ; I make it breed as fast ,

এইরূপে টাকার সঙ্গে মাংসের কথাটা আসিয়া পড়িল। তাহার পর যখন এণ্টনিও আস্ফালন করিয়া বলিল—

If thou wilt lend this money, lend it not
As to thy friends * * * *
But lend it rather to thine enemy

তখন সাইলকের মনে এণ্টনিওর দেহ হইতে মাংস কাটিয়া লইবার মতলবটী আসিল। এইরূপ ক্রমে ক্রমে কিরূপে এতবড় একটা অসম্ভব কথাকে সম্ভব করা হইয়াছে, তাহার কৌশল দেখিলেন ?

তাহার পর বিচারের দৃশ্য। এইখানে আমরা এই নাটকের নাটকত্ব বেশ দেখিতে পাই। উন্নতমনা ও পরোপকারী এণ্টনিওর চিত্ত এস্থলেও কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত হয় নাই। তিনি আসন্নমৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়াও কেমন স্থির, কেমন দৃঢ়সঙ্কল্প। এরূপ একটা বাহ্যশক্তি তাঁহার প্রকৃতির উপর কিছুই প্রভুত্ব করিতে পারিল না, বরং প্রভুত্ব করিতে গিয়া নিজেই শাসিত হইল। এইরূপ মহান চরিত্রই প্রকৃত নাটকের চরিত্র। ধর্ম্ম সংশ্লিষ্ট বলিয়াই এই চিত্রের এত সৌন্দর্য্য।

যখন সকলের সকল চেষ্টা বৃথা হইল, নিষ্ঠুর সাইলক কিছুতেই ক্ষান্ত হইল না, যখন এণ্টনিওর জন্য আমাদের প্রাণ কাঁদিতেছে, যখন তাহার জীবন রক্ষার আর কোন আশাই নাই, যখন এণ্টনিওর দণ্ডাজ্ঞা আমরা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করিতেছি, তখন সেই শেষ মুহূর্ত্তে কবি কেমন কৌশলে ধীরে ধীরে পোরসিয়াকে সেই বিচারস্থলে আনিলেন। আমরাও সেই সময় একটু নিশ্বাস

ফেলিবার অবকাশ পাইলাম, হৃদয়েও ধীরে ধীরে আশার সঞ্চার হইতে লাগিল। কিন্তু পোরসিয়া আসিয়াই এণ্টনিওর জীবন রক্ষা করিতে পারিল না, অনেক চেষ্টা করিল, কিছুতেই কিছু হইল না, আমাদের হৃদয়েও যে আশার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা পুনবার লীন হইয়া গেল। পুনরায় আমাদের প্রাণ এণ্টনিওর জন্য কাঁদিতে লাগিল। পুনরায় শেষ মূহুর্ত্ত আসিল, আমরাও পুনরায় রুদ্ধশ্বাসে দণ্ডাজ্ঞার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। পোরসিয়া যখন বলিলেন—

> For the intent and purpose of the law
> Haith full relation to the penality,
> Which here appeareth due upon the bond &c.

তখন আমরা একবারেই হতাশ। কিন্তু তখনও একথা সেকথা কহিয়া পোরসিয়া দেরি করিতেছিলেন, এণ্টনিওর পর্য্যন্ত তখন আর দেরি সহ্য হইতেছিল না। এইরূপ সময় পোরসিয়া খতের সত্ব বজায় রাখিয়া এক বিচার কৌশল দেখাইল, তাহাতে সকলে বিস্ময়ান্বিত হইল। যে এণ্টনিওকে এতক্ষণ মৃত মনুষ্যের মধ্যে আমরা গণ্য করিয়াছিলাম, সেই এণ্টনিওর জীবন রক্ষা হইল। আমরাও যেন ফাঁসি ছিঁড়িয়া পড়িলাম। নাটককারের কি আশ্চর্য্য কৌশল! এইরূপ Art দেখাইতে কয়জন সক্ষম হন? আমাদের হৃদয়ে এতক্ষণ ধরিয়া যে একটী আঘাত হইতেছিল, এইবার তাহার প্রত্যাঘাত আরম্ভ হইল। এইরূপ কৌশলেই নাটকের উৎপত্তি হয়।

তাহার পরই আবার ছদ্মবেশী পোরসিয়া আর জেসিকা তাহাদের স্বামীদ্বয়ের নিকট হইতে দুইটী অঙ্গুরী লইয়া কেমন একটী রহস্য দেখাইল। এতক্ষণ ধরিয়া এণ্টনিওর জন্য কাঁদিয়া তাহার পরেই এই অঙ্গুরী-রহস্য কত আমোদজনক কেমন হৃদয় স্নিগ্ধকারক! অনেকক্ষণ ধরিয়া করুণরসে যখন আমাদের মন আর্দ্র হইয়া যায়, তাহার পর হাস্যরসের অবতারণার বিশেষ আবশ্যক। ইহা না থাকিলে নাটকের নাটকত্ব থাকে না।

কিন্তু সেক্সপিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা গুণপনা দেখাইয়াছেন, দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন রসের, বিভিন্ন চরিত্রের এবং বিভিন্ন ঘটনার গল্প একত্রিত করিয়া। Jewর গল্প আর Casketএর গল্পে কোন সম্বন্ধই নাই; কিন্তু ধন্য কবির কল্পনা! যে কৌশলে একসূত্রে এই দুইটি গল্পকে গ্রথিত করিয়াছেন, সে কৌশল অসাধারণ!

আমরা যে দুইখানি নাটক অবলম্বন করিয়াছি, সেই দুই খানিই নাটকেত্ব পরিপূর্ণ। সকল স্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার স্থান আমাদের নাই। বারান্তরে এই সম্বন্ধে আরো কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

আমরা সংক্ষিপ্ত সমালোচনার সম্পূর্ণ বিপক্ষ, সেই কারণ এই পত্রিকায় প্রায়ই সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রকাশিত হয় না। তবে যে মধ্যে মধ্যে প্রকাশ করিতে হয়, সে কেবল দায়ে পড়িয়া। গ্রন্থকারগণ পুস্তক পাঠাইয়া সমালোচনা দেখিতে না পাইলে বড়ই বিরক্ত হন, এমন কি গালিমন্দ পর্য্যন্ত দিয়াও থাকেন। এদিকে সমালোচনার্থ যে সকল পুস্তক উপস্থিত হয়, সকল পুস্তকের বিস্তৃর্ণ সমালোচনার স্থান আমাদের নাই। আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইলেও আমরা এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম, কিন্তু তত্রাচ একাবারেই যে সমস্ত পুস্তকেরই সমালোচনা প্রকাশ করিব, সে স্থান, ও সে সময় আমাদের নাই। অতএব গ্রন্থকারগণ অনুগ্রহ করিয়া ব্যস্ত না হইয়া একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করিবেন।

নিরাশ প্রণয়। 'মোহিনী প্রতিমা বা সরলা" প্রভৃতি রচয়িতা প্রণীত ও শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। ইহা একখানি সামাজিক উপন্যাস। সামাজিক উপন্যাস লেখা সহজ নহে, গ্রন্থকার যে কতক অংশে ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ইহা তাঁহার প্রশংসার বিষয় বটে। তাঁহার বর্ণনাশক্তি বিলক্ষণ আছে, কিন্তু স্থানে স্থানে সেই শক্তির পরিচয়টী কিছু অতিরিক্ত হইয়াছে। মোটের উপর উপন্যাস খানি মন্দ হয় নাই, গ্রন্থকার চেষ্টা করিলে ভবিষ্যতে ভাল উপন্যাস লিখিতে পারিবেন।

অদ্ভুত ডাকাত। শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত। ইহার গল্পাংশ অতি আশ্চর্য্য ও কৌতূহলোদ্দীপক; একবার পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না! ইহার ভাষাও বেশ রসাল, সে ভাষাতে কবিত্বের স্ফূর্ত্তি ও বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজীতে যাহাকে Romantic tale বলে, ইহা সেই রমকের গল্প মাত্র, সেই কারণ আমরা ইহাকে উপন্যাস

আখ্যা দিতে পারি না।• তবে আরব্যোপন্যাস যে শ্রেণীর উপন্যাস, ইহাকেও সেই শ্রেণীর উপন্যাস বলা যাইতে পারে।

জ্যোতির্ম্ময়ী। সামাজিক উপন্যাস। ইহাও রাজকৃষ্ণ বাবুর রচিত। এই উপন্যাস খানি নাকি কোন সত্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। সত্যই হউক, আর মিথ্যাই হউক, ইহারও গল্পটী বিলক্ষণ কৌতুকজনক। ইহার প্রথমাংশ আমাদের তত ভাল লাগে নাই, কিন্তু ইহার শেষাংশ পড়িয়া আমরা অশ্রুসংবরণ করিতে পারি নাই। তবে রাজকৃষ্ণ বাবুর ন্যায় একজন সুলেখক ইচ্ছা করিলে ইহাতে চরিত্রচিত্রন সম্বন্ধে আরো অধিক গুণপনা প্রকাশ করিতে পারিতেন।

মণিহারী। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রফুল্ল বাবু একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক। তাহার সকল লেখাতেই চিন্তাশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। এই পুস্তকখানিতেও লেখকের গভীর চিন্তাশক্তি ও গবেষণার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়—এই বাঙ্গালায় এরূপ পুস্তকের আদর নাই। ইহা বাঙ্গালির বড়ই কলঙ্কের কথা। এ কলঙ্ক কতদিনে মোচন হইবে তাহা বলা যায় না। আমরা প্রফুল্লবাবুর অন্য সকল বিষয়েই প্রশংসা করি, কিন্তু তাঁহার ভাষার প্রশংসা করিতে পারি না। তিনি ভাষাটীর প্রতি একটু মনোযোগী না হইলে তাঁহার পুস্তকের পাঠক জুটিবে না।

থিয়েটার। প্রসিদ্ধ নাটককার শ্রীযুক্ত বাবু মনমোহন বসু মহাশয় এমারেল্ড থিয়েটারের ডাইক্টের হইয়াছেন দেখিয়া আমরা বড়ই সুখী হইলাম। এখন বাঙ্গালায় দুই একখানা আরো ভাল নাটক যে হইবে তাহার আশা হইয়াছে। মনমোহন বসুর নিকট নাটক সম্বন্ধে আমাদের অনেক আশা আছে। শীঘ্রই তাঁহার নূতন নাটক "রাসলীলা" খোলা হইবে। ষ্টার থিয়েটারে "প্রফুল্ল" নামক আর একখানি নূতন সামাজিক নাটক বিশেষ প্রশংসার সহিত অভিনয় হইতেছে। ষ্টার কোম্পানি যদি "হরিবোলের" স্রোতটা ফিরাইতে পারেন, তবে তাঁহাদের বিশেষ বাহাদুরী আছে। বেঙ্গল থিয়েটার সেইরূপ পূর্ব্বের ন্যায়ই চলিতেছে।

ক'নে বউ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বেলা একটার সময় শ্যামকুমার বাটীর প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ডাকিল—"মা, মা, ওমা।"

জননীর তখন ক্রন্দন থামিয়া গিয়াছিল, তিনি আপাদ মস্তক লেপ ঢাকিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। রামকুমার তখন বিষণ্ণমনে আপনার শয়নগৃহের মধ্যে বসিয়াছিলেন। শ্যামকুমার কোন উত্তর পাইল না—সকলেই নিরুত্তর। পুনরায় শ্যামকুমার ডাকিল—"বউ, বউ—কেউ কি বাড়ীতে নাই!"

তখন ধীরে ধীরে রামকুমার ঘরের বাহিরে আসিয়া বলিল—"শ্যাম, এই দিকে আয়।"

শ্যামকুমার তখন রামকুমারের বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া আগ্রহের সহিত বলিল—"দাদা, কাহাকেও দেখ্‌তে পাই না যে?"

রাম। মা ঘরের মধ্যেই আছেন, আর বড়বউ রাগ করে নগেন্ খগেন্‌কে নিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে।

শ্যাম। মার সঙ্গে ঝগড়া হ'য়েছে বুঝি?

রাম। তার বিলক্ষণ।

শ্যাম। বউ গেল কোথায়?

রাম। চুলোয় গিয়েছে।

শ্যামকুমার আর কথা কহিল না, ধীরে ধীরে সদর বাড়ীর দিকে চলিল। তখন রামকুমার বলিল—"কোথায় যাও?"

শ্যাম। একবার খোঁজ নিতে হবে তো।

রাম। এখন সে আবশ্যক নাই, অনেক বেলা হ'য়েছে, আগে তুমি আহার কর, মারও আহার হয় নাই—তাঁহাকে খাওয়াও, তারপর তখন খোঁজ নিও।

শ্যাম। ছেলে দুটো সঙ্গে আছে। একবার—

রামকুমার সে কথায় বাধা দিয়া বলিল—"সেই জন্যইত ব'ল্‌ছি, কতদূর যাবে? বড়জোর এই গোপালে ছুতরের বাড়ী।"

শ্যামকুমার তখন ধীরে ধীরে যে গৃহে জননী শয়ন করিয়াছিলেন, সেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়াই বুঝিতে পারিল যে, আজ জননীর রাগ সামান্য নহে। তখন শ্যামকুমার ধীরে ধীরে জননীর শয্যার উপর বসিয়া পদসেবা আরম্ভ করিল। জননী কিন্তু সে সেবায় কোন মতে সন্তুষ্ট নহেন, পা ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এদিকে শ্যামকুমারও কোন মতে ছাড়ে না। অনেকক্ষণ পরে জননী বলিলেন—"তুই দূর হ, আমি তোর্ মুখ দেখ্‌তে চাই না। তোর্ জ্বালায় আমার হাড়মাস জ্বলে গেলো। আমি আর এ সংসারে থাক্‌তে চাই না। মরণ হ'লে বাঁচি।"

শ্যামকুমার সে কথায় দুঃখিত না হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"মা, এতখানি বেলা হ'লো, এখন কিছুই খাই নাই, বড় ক্ষিদে পেয়েছে, চাট্টি ভাত দেনা মা।"

জননী তখন পুনরায় রাগত হইয়া বলিলেন—"তোর ভাত খেতে লজ্জা হয় না, ভাত আসে কোথা থেকে? তোর এক কড়ার মুরোদ নাই, কেবল খাবার রাক্ষস। এতখানি বেলা ছিলি কোথায়? কা'র কায ক'র্‌ছিলি? এমন অদৃষ্ট ক'রেছিলুম, যে একটা ছেলেও মানুষ হ'লো না!"

জননী এইরূপ এবং ইহা অপেক্ষাও অনেক গুরুতর ভর্ৎসনা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু শ্যামকুমারের এই সকল অঙ্গের আভরণ হইয়া পড়িয়াছিল। প্রতিদিনই এইরূপ ভর্ৎসনা না খাইলে আর শ্যামকুমারের পেটে অন্ন পড়ে না; সুতরাং শ্যামকুমার অম্লানবদনে এই সকল সহ্য করিয়া পুনরায় হাসিতে হাসিতে বলিল—"মা, আমিত তোর কু-সন্তানই আছি, তা চাট্টি খেতে দিয়ে তা'র পর যত পারিস্ ভর্ৎসনা কর্ না। আমার যে বড় ক্ষিদে পেয়েছে মা।"

হাজার হউক, মার প্রাণ—কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারে? জননী তখন গজর্ গজর্ বকিতে বকিতে পাকশালা হইতে অন্ন ব্যঞ্জন আনিয়া শ্যামকুমারের সম্মুখে ধরিয়া দিয়া বলিলেন "এই নাও পিণ্ডি খাও!"

শ্যামকুমার হাসিতে হাসিতে বলিল—"আগে তোমার পিণ্ডিদান ক'র্‌বো, তার পর আমি পিণ্ডি খাব। মা, তোমার ভাত বাড়।"

জননী এইবার পুনরায় কান্না আরম্ভ করিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"আমি তোদের ভাত আর খা'ব না। ভিক্ষে মেগে খা'ব, সেও

ভাল, তবু তোদের ভাত আর খাব না। এত মুখনাড়ার ভাত আমার দরকার নাই। ব্যাটার বউ হ'য়ে, যা মুখে আসে, আমায় তাই ব'লবে? এত ভয় ক'রে চলি, তবু মুখনাড়া খেতে খেতে আমার প্রাণটা গেল। এমন অদৃষ্টও ক'রেছিলাম।"

শ্যামকুমার বলিল—"এ ভাত ত আর আমরা তোমায় খাওয়াই না, তুমিই আমাদের খাওয়াও, আর বড় ব'য়ের কথা যা ব'লছো, তা কি ক'রবে বল? সংসার-ধর্ম্ম ক'রতে গেলে, একটু সহ্য ক'রে থাকতে হয়। বড় বউ তোমায় মন্দ কথা বলে, সেটি তাঁ'র ভারি দোষ, সেই জন্য গ্রামশুদ্ধ লোকে তাঁকে নিন্দে করে।"

পুত্রের মিষ্ট কথায় জননীর রাগ ক্রমে পড়িয়া আসিল, আর বিশেষতঃ শ্যামকুমারের উপর তাঁহার গায়ের ঝাল মিটান হইয়াছিল; সুতরাং জননী তখন পাকশালায় গিয়া আহার করিতে বসিলেন। জননীর রোগের মধ্যে যখন বড় রাগ হয়, তখন কাহাকে না বকিলে আর সে রাগ পড়ে না,। শ্যামকুমারই তাঁহার এই রোগের মহৌষধ।

তাড়াতাড়ি আহার শেষ করিয়া জননী বলিলেন—"ও শ্যাম, আমার নগু খগু কোথায় গেল, একবার দেখ না বাবা।"

জননী এখন আর সে জননী নয়!

জননীর সে আজ্ঞা পালন করিতে শ্যামকুমারের কিছু বিলম্ব হইল, কারণ শ্যামকুমার আহারান্তে এক ছিলিম গাঁজা, আর দুই ছিলিম তামাকু না সেবন করিয়া গৃহের বাহির হইতে পারিত না।

* * * * * *

বৈকালে রামকুমারের বাড়ীতে বড়ই একটা গোলযোগ উঠিল। শ্যামকুমার সমস্ত গ্রাম অনুসন্ধান করিয়া বড় বউয়ের কোন সন্ধানই আনিতে পারিল না, রামকুমার বড়ই চিন্তিত হইল, তাহার জননীও ভীতা হইলেন। এমন সময় গণেশের মা আসিয়া সংবাদ দিল যে, তাঁহার বধূমাতা পশ্চিম পাড়ার বাগ্দীবউকে সঙ্গে লইয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছে। এই সংবাদটা সর্ব্বাপেক্ষা রামকুমার-জননীর প্রাণে বড়ই আঘাত করিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। ইতিপূর্ব্বে গণেশের মা এই সংবাদ পাড়ায় পাড়ায় দিয়া আসিয়াছিল, সুতরাং এখন দলে দলে গ্রামের প্রতিবেশিনীরা রাম-

কুমারের বাড়ীতে আসিতে আরম্ভ করিল; রামকুমার জননীর চক্ষের জলের সহিত কেহ অনেক কষ্টে আপনার দুই এক ফোঁটা চক্ষের জল মিশাইল, কেহ বা কেবল দুই একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়াই বসিয়া পড়িল, কেহ বড় বউয়ের আস্পর্দ্ধার কথা তুলিল, কেহ তাহাকে জব্দ করিবার পরামর্শ দিল, কেহ ছেলের দোষ দিল, কেহ বা বধূর পিতৃকুলের নানারূপ দোষ দেখাইয়া গৃহে চলিয়া গেল। কিন্তু কেহই রামকুমারের জননীকে সান্ত্বনা করিতে পারিল না। তিনি পুত্রবধূর ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, ক্রমে পুত্রবধূ ও নপ্তৃ, শ্বশুর জন্য অধীরা হইয়া পড়িলেন। বৃদ্ধা মুখে যাহাকে যাহাই বলুন না কেন, কিন্তু অন্তরে তাঁহার কাহারও প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষ ভাব ছিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার পর ঝিমাইতে ঝিমাইতে শ্যামকুমার বলিল—"দাদা, এখন উপায় কি?" রামকুমার একটু বিরক্তভাবে বলিল—"উপায় আর কি? গেছে ভালই হ'য়েছে। এজন্মে আর সে স্ত্রীর মুখ দেখ্‌বো না।"

শ্যাম। কিন্তু মাকে স্থির ক'র্‌বে কিরূপে?

রাম। কোন্দল কর্‌বার জন্য কাহাকেও আবশ্যক হইলে পাড়ার অনেক লোকই আছে।

এই সময় শ্যামকুমার অহিফেনের প্রসাদে দাদার প্রথম কথা ভালরূপ শুনিতে পাইল না, শেষের দুই তিনটী কথা শুনিয়া বলিল—"পাড়ায় অনেক লোক আছে বটে, কিন্তু মার মন তা'তে স্থির হবে কেন?"

রামকুমার এইবার একটু চিন্তিত হইল, অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল—"দেখ শ্যাম, আমাদের এখন যেরূপ অবস্থা, তা'তে এ ঘটনা ভালই হ'য়েছে।"

এই সময় তাহাদের জননী কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহের বাহিরে আসিয়া বলিলেন—"কি ভাল হ'য়েছে বাবা? এতে আমার মুখ উজ্জ্বল হবে—না কুটুমের ঘরে আমার মাথা হেঁট হবে? বাবা, গরীব্ ব'লে কি আর মান অপমানের ভয় নাই? তোমার এখন দেখ্‌ছি, শ্বশুর বাড়ীর দিকেই টান,

তা, বেশত বাবা, তোমরা দু'জনে শ্বশুরবাড়ী চ'লে যাও। আমার ত আর নাবালক ছেলে কি আইবুড়ো মেয়ে নাই ?—একটা পেট বই ত নয়, আমি ভিক্ষে মেগে খা'ব।"

পুনরায় জননীর চক্ষে জল দেখা দিল। সে চক্ষের জল দেখিয়া পুত্রদ্বয়ও বিশেষ দুঃখিত হইল। শ্যামকুমার কিছুক্ষণ বিষণ্ণমনে বসিয়া থাকিয়া ঝিমাইতে আরম্ভ করিল। রামকুমার মনে মনে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল—"মা, এখন কি ক'র্‌লে ভাল হয় বল।"

জননী চক্ষের জল মুছিয়া সন্তোষচিত্তে আগ্রহের সহিত বলিলেন—"বাবা, কালই আমার বউকে আর ছেলেদের আন। আমি তা'দের একদণ্ড না দেখ্‌তে পেলে, ঘর-সংসার অন্ধকার দেখি। আমি বাবা, আর বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া ক'র্‌বো না। এবার বউ ধ'রে মেলেও আমি কথা কব না। লক্ষ্মী বাবা আমার, কালই বসন্তপুরে যাও।"

বসন্তপুরে রামকুমারের শ্বশুর বাড়ী। রামকুমার কিন্তু শ্বশুরালয়ে যাইতে প্রথমে কোনক্রমেই রাজি হইল না। শ্যামকুমার বলিল—"দাদা, মা যখন এতদূর জেদ ক'র্‌ছেন তখন তোমার যাওয়াই কর্ত্তব্য।"

রাম। শ্যাম্, তবে তুই যা।

শ্যাম। আমায় ভাই ক্ষমা কর। যে কয় দিন তোমার বিলম্ব হবে, আমি বরং কোথাও না গিয়ে সংসারের কাজকর্ম্ম দেখ্‌তে রাজি আছি, কিন্তু বসন্তপুরের চক্রবর্ত্তীর বাড়ী মাথা গলাতে পা'র্‌বো না।

শ্যামকুমার আজীবন পরের কর্ম্ম করিয়াই বেড়াইত, নিজের সংসারের কর্ম্ম কখনই দেখে নাই। আজ তাহার মুখে এইরূপ অসম্ভব কথা শুনিয়া রামকুমার আশ্চর্য্য হইল, এবং কি মনে করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"ভাই, যদি তুমি সংসারের কাজকর্ম্ম দেখ, তবে বসন্তপুর কেন, আমি যমের বাড়ী পর্য্যন্ত যেতে প্রস্তুত আছি।"

পরদিন অতি প্রত্যূষে রামকুমার বসন্তপুর যাত্রা করিল। জননী চক্ষের জলের সহিত বিনীতভাবে বধূমাতাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া পাঠাইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রামকুমার গৃহ হইতে বহির্গত হইলে পর গদার মা অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ডাকিল—"দিই-ঠাকুরোণ, ও দিই-ঠাক্‌রোণ বলি এহনো ওঠোনিকি ?"

গৃহের মধ্য হইতে রামকুমারের জননী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন—"কেলা—বাগ্‌দি বউ। তা তোর এতবড় আস্পর্দ্ধা—তুই আমার ঘরের বউ চুরী করে নিয়ে যাস্। আমি তোকে ভাল মানুষ ব'লে জান্‌তুম, তোর পেটে এতদূর বুদ্ধি।"

গদার মা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"না দিই-ঠাক্‌রোণ, বউ মা ঠাক্‌রোণ যে গোসা ক'রে বাপের বাড়ী চ'লে গেলেন, তা আমি জান্‌তাম না। আমায় ব'ল্লেন কি—"বাবার বড় ব্যামো লেগেছে, তাই যাচ্ছি, আয় গদার মা সঙ্গে আয়!" তা দিই-ঠাক্‌রোণ, তোমার কাছে আর বল্‌বো কি—দোক্‌তার কৌটাও সঙ্গে নিতে পারিনি—অমনি চলে গেলুম। ভদ্দরঘরের মেয়ে এমন মিথ্যে কথা যে ব'ল্‌তে পারে, তা আমি জান্‌তেম না।"

রামকুমারের জননী তখন পুনরায় রাগত ভাবে বলিলেন—"হাঁলা—তোর তিনকাল গেছে, এককাল ঠেকেছে। বুড়ো হয়ে মর্‌তে যাস্, আজও জানিস্ না যে, বউয়ের বাপের ব্যামো হয়েছে বলেই, আমার বউ ছেলে-দুটোর হাত ধরে হেঁটে বাপের বাড়ী চলে যাবে! মাগি, তুই কি আমায় বোকা বুঝুতে এয়েছিস্ না কি?"

গদার মার চক্ষে এইবার জল দেখা দিল, গদার মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"দিই-ঠাক্‌রোণ, তোমার পায়ে হাত দিয়ে বল্‌ছি—(ক্রন্দন) গদার মাথায় হাত দিয়েও দিব্যি বল্‌তে পারি, আমি এর ভালমন্দ কিছুই জানিনে। তোমাদের পাতের ভাত খাইয়ে গদারে মানুষ করেছি। মিন্সে যৎদিন ছিলো, মুখুয্যে বাড়ী বই, আর কারু বাড়ী পাত পাড়েনি। আহা! দাদা'ঠাকুর 'কালাচাঁদ' বলতে অজ্ঞান হতেন্। তা দিই-ঠাক্‌রোণ, আমি কি তোমাদের দুস্‌মোন হ'তে পারি গা? ধর্ম্ম কি পিত্থিবীতে নাই গা? আজো যে সুয্যি আকাশে উঠচে গো।"

গদার মা পুনরায় ক্রন্দন আরম্ভ করিল। সে কান্না দেখিয়া এবার রামকুমার জননীর মনে দয়ার উদয় হইল। তখন তিনি একটু শান্তভাবে

বলিলেন—"গদার মা, তোর যদি বুদ্ধি থাক্‌বে, তবে তুই আমার কাছে একবার এসে জেনে যেতে পার্‌তিস্‌। দুক্রোশ পাঁচক্রোশ পথ নয় ত?"

গদার মার চক্ষে আর জল নাই, গদার মা তখন একটু প্রফুল্লচিত্তে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"হাঁ দিই-ঠাক্‌রোণ, তখন আমার এ বুদ্ধিটা আসেনি—এইবার কিন্তু আর আমায় কেউ আঁট্‌তে পার্‌বে না। এইবার আমি বেশ বুঝেছি, দিই-ঠাক্‌রোণ বেশ বুঝেছি।"

রামকুমার-জননী বলিলেন—"আচ্ছা গদার মা, তোদের দেখে সেখানকার সকলে কি বল্লে?"

গদার মা। কি আর বল্‌বে দিই-ঠাক্‌রোণ? সেখানকার লোকে একবারে আশ্চর্য্যি হয়ে গেল। বাকুলময় পাড়ার লোক জড় হয়ে পড়লো। তার পর দিই-ঠাক্‌রোণ, তোমার বউ বল্লে কি জান, "আমি আর শ্বশুর-ঘর করবো না, আর জন্মে কাপড়পুড়ে মুখ দেখাবো না, আমার শাশুড়ী পেটে খেতে দেয় না, তার ওপর কেবল মুখনাড়া আর যন্ত্রণা দেয়!" এমন ধারা আরো কত কথা বেনিয়ে বেনিয়ে বল্লে দিই-ঠাক্‌রোণ, তা, আমার ছাই মনে পড়্‌চে না।

গদার মার কথা থামিল, কিন্তু সে কথা শুনিয়া রামকুমারের জননী রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—"ব—টে, ব—টে, এতবড় আস্পর্দ্ধা! তাকে কি আর এঘর কর্‌তে আস্‌তে হবে না? আচ্ছা, তখন এ কথার বোঝাপড়া!"

গদার মা। তা দিই-ঠাক্‌রোণ, তোমার বেয়ান ঠাক্‌রোণ ব'লেছেন, যে তেনার মেয়েকে—এই আমাদের বউঠাক্‌রোণকে—তিনি আর শ্বশুর ঘর ক'র্‌তে দেবেন না। আর আমাদের ক'নে বউ ঠাক্‌রোণকেও যে তেনার বাপেরা আর পাঠাবে না, এ কথাও বউঠাক্‌রোণ সেখানে পের্‌কাশ ক'রে দিয়েছে। কুটুমের ঘরের সকল লোকই ছি ছি ক'র্‌তে লাগলো, দিই-ঠাক্‌রোণ।

গদার মার এই কথা শুনিয়া রামকুমার জননীর ক্রোধ আরো বৃদ্ধি হইল। তিনি রাগে গর্‌ গর্‌ ক'রিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ চক্ষের জলের সহিত অনেক আবোল তাবোল বকিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন "তা এমন জান্‌লে আমি রামকে বসন্তপুরে পাঠাতেম না।

দ্যাখ্ গদার মা, তুই বোন এ কথা কাকেও বলিস্ না, দেখিস্ গ্রামের কেউ যেন এ কথা শোনে না।"

গদার মা তখন শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—"হাঁ দিই-ঠাক্রোণ, এ কথা কি কাকেও বল্বার কথা গা?"

এই বলিয়া গদার মা রামকুমার জননীকে দুই চারি কথায় সান্ত্বনা করিয়া বিদায় হইল, বাড়ীর বাহির হইয়াই তাহার মনের মধ্যে কথাটা বড়ই তোলপাড় করিতে লাগিল। তাহাকে যে এই কথাটা প্রকাশ করিতে বারণ করা হইয়াছে, সেই কারণ গদার মা যতক্ষণ না কাহারও নিকট কথাটা প্রকাশ করিতে পাইতেছে, ততক্ষণ তাহার মন আর কোন মতেই স্থির হইতেছিল না। রাস্তায় বাহির হইযাই গদার মা কাহাকে এই কথা বলিবে, তাহার জন্য ব্যস্ত হইল। কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্যক্রমে রাস্তায় কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইল না; তখন গদার মার আর বিলম্ব সহ্য হইল না, রাস্তার ধারে কর্ম্মকারদের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া ডাকিল—"বলি ও কামার বউ, একটা কথা শোন্।"

কামার বউ তখন রন্ধনশালায় গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত ছিল, তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া নথ নাড়িয়া বলিল—"কি কথা দিদি?"

গদার মা ইতস্ততঃ দেখিয়া চুপি চুপি মুখুয্যেদের বড়বউ সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া শেষে বলিল—"দিইঠাক্রোণ আমায় এ কথা পেব্কাশ কর্তে মানা করেছেন, তা বোন্ আমার পেব্কাশ কর্বার দরকার কি? আমরা হলুম্ গরীব নোক্, ওনাদের খেয়েই মানুষ—আমরা কি ওনাদের নিন্দের কথা পেব্কাশ কর্তে পারি? তুমি কি বল দিদি?"

কর্ম্মকার পত্নী তখন ঈষৎ মুচকিয়া হাসিয়া পুনরায় নথ নাড়িয়া উত্তর করিল—"তা বই কি বোন!"

এইরূপে গদার মা সম্মুখে গ্রামের যাহাকে পাইল, সকলকেই এই কথা এই রূপেই শুনাইল। তাহার পর যাহার সহিত গদার মার একটু প্রণয় ছিল, সে নিদ্রিত থাকিলেও তাহার ঘুম ভাঙ্গাইয়াও তাহাকে এইরূপে এই কথা শুনাইয়া দিল। তখন দুই প্রহরের মধ্যে গ্রামময় এই অপূর্ব্ব কাহিনী রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

মান।

ধাতু ধরিয়া শাব্দিক যাহাই ইহার অর্থ করুন, এই মান কথাটা সংসারের ভিতর বড়ই গোলযোগ বাধাইয়াছে। মহাবলপরাক্রান্ত মুকুটশীর্ষ রাজাধিরাজ হইতে চীরধারী পথের ভিখারী পর্য্যন্ত সবাই এই মানের জন্য উন্মত্ত। যিনি সম্রাটের সম্রাট তিনি যেমন তাঁহার মানের জন্য লালায়িত, আবার যে কড়ার কাঙাল সেও তেমনি তাহার মানের জন্য ব্যতিব্যস্ত। মানের সহিত ঐশ্বর্য্য সম্পদের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু উভয়ে ঠিক্ একই জিনিষ নয়। দেখিয়াছি লোক সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, তথাপি যাহাতে আপনার মান বজায় থাকে, তাহার জন্য সাধ্যের অতীত চেষ্টারও ক্রটী করে নাই। টাকা কড়িতো ছার সামগ্রী, প্রাণের সহিত তুলনায়ও মানের গুরুত্ব এবং মহত্ত্ব যারপর নাই অধিক। "যাক্ প্রাণ, থাক্ মান"—কথাটা লোকে মুখে মুখে বলিয়া থাকে, কিন্তু কথাটার ভিতর অর্থ অনেক। প্রাণ হইতেও প্রিয়তর এ জগতে আর কিছু আছে কি? অথচ, সেই প্রাণ অপেক্ষা এত গুণ যে শ্রেষ্ঠ সে কোন্ অপার্থিব সামগ্রী?

ছোট বড় মানের অনেক গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু দোষও বিস্তর। মান লোককে মাতাইয়া তুলে, অহমিকা আনে, কখন কখন তাহাকে অন্ধ করিয়া দেয়। মানে অপরিণামদর্শিতা লইয়া আসে, আপনার ভবিষ্যতের প্রতি ক্ষীণদৃষ্টি করে, সময়ে আপনারেই আপনার মৃত্যুর কারণ করিয়া তুলে। মানের জন্য নির্ম্মম হিংস্র, অত্যাচারী, পরপীড়ক ও মনুষ্যস্বভাববর্জ্জিত হইতে অনেককে দেখিয়াছি। অতি মানের পরিণাম কদাচিৎ ভাল হইতে দেখা গিয়াছে। "অতি মানেচ কৌরবাঃ"—ইহার একটা জ্বলন্ত উদাহরণ। আরও উদাহরণ পুরাণে, ইতিহাসে, কাহিনীতে, আমাদের দৈনিক ঘরকন্নায় অনেক মিলে। বলিরাজা আপনা হইতেই ত্রিবিক্রম কর্ত্তৃক পাতালে নিবদ্ধ হইয়াছিলেন কেন? সে কি কেবল দাতা বলিয়া যে মস্ত মান সেই মান অক্ষুন্ন রাখিবার জন্যই নহে? দক্ষরাজ কৈলাশনাথকে কি চিনিত না? কিন্তু চিনিয়াও তবে অমন অবিমৃষ্যকারীর ন্যায় কেন শিবহীন যজ্ঞে প্রবৃত্ত

হইল—কেন আপনার মৃত্যু আপনি ডাকিয়া আনিল? সে কি কেবল আপনার মানের জন্যই নহে? আর সেই যে হলহলাময় পণ্যবীথিকাপূর্ণ সুখভোগাসম্পদের বিলাসভূমি শ্রীশ্বরাজনগরী ট্রয় ছারে খারে গেল? সে কি কেবল মানের দায়ে নহে? একিলিস্ অপমানিত হইয়াছিলেন, তাইতো দুর্জ্জয় ক্রোধাগ্নি জ্বালিয়া সোণার রাজ্য ভস্মীভূত করিলেন। রাজপুতেরা মানের ভয়ে জহরব্রত অনুষ্ঠান করিত—সে ব্রত ভাল কি মন্দ তাহার বিচার করিতেছি না—কিন্তু সে দৃশ্য কি ভীষণ কি রোমহর্ষ, যে যাহাই বলুক, বুঝি এই অমানুষিক রীতির জন্যই রাজপুতের রাজ্য থাকিল না। রাণা প্রতাপ যে অত্যুচ্চ মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা বোধ হয় কখনই ক্ষুণ্ণ হইত না, যদি তিনি মানান্ধ হইয়া মানসিংহের প্রতি কুব্যবহার না করিতেন।

বড় মানে কি হয় তাহার আরও একটা দৃষ্টান্ত দেখ। বল্লাল মান বাড়াইয়াই এক শ্রেণীর মাথা খাইয়াছেন। সমাজে তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ ছিল না, কুরূপ হইলেও সে রূপের শেখর, দুঃখী হইলেও সে ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, সভায় মাল্যচন্দনের দাওয়া আগে তাহার, পংক্তিভোজনে বৃহৎ মৎস্যমুণ্ড অগ্রে তাহারই প্রাপ্য—কিন্তু সেই মানের পরিণাম আজ কি হইয়াছে? আজ যত আচারভ্রষ্ট উঞ্ছবৃত্তিপরায়ণ, কদাকার মহামূর্খ সেই বংশধর হইয়া সমাজকে উৎসন্ন দিতেছে। আর কুলীন কুলমান রাখিতে গিয়া আপনার কন্যা লইয়া কি বিষম অবস্থায় পড়িতেছে, কতবা মহা অনর্থ ঘটিতেছে—তাহা আর বলিব কি?

আর চৌধুরীবংশ—পূর্ব্বে ইহাদের প্রতাপে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খাইত, ঐশ্বর্য্যের অবধি ছিল না, দোল দুর্গোৎসব কোন ক্রিয়া ফাঁক যাইত না, কিন্তু আজ সে পূর্ব্ব গৌরব নষ্ট হইয়াছে। কেবল অতীতের খিন্ন স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ আগেকার প্রকাণ্ড বাড়ীখানা জীর্ণ অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। বৃদ্ধ হরদয়াল তাহারই একটী ভগ্ন প্রকোষ্ঠে ছিন্ন কন্থা বিছাইয়া আপনার পুরাতন সাবেক সট্‌কাটী পাড়িয়া বৈঠক করিয়া বসিয়া আছে। গত বৎসরও যো শো করিয়া বাড়ীতে পূজা হইয়াছিল। এবার পূজা আসিয়া পড়িল, বৃদ্ধ কি করিবে ভাবিয়া আকুল হইয়াছে. তাহার বিশ্বাস দালান যদি খালি থাকে, আর দূরদূরান্তর হইতে লোকজন প্রতিমা দেখিতে আসিয়া যদি অমনি ফিরিয়া যায়, তাহা হইলে পৈতৃক মান নিশ্চয় ডুবিবে, সে মান নষ্ট অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে

শ্রেয়স্কর। বৃদ্ধ 'দুর্গা দুর্গা' করিয়া অনেক ডাকিল, শেষ বাড়ীখানি বন্ধক দিয়া সে বৎসর পূজা করিল। পর বৎসর আর তাহাকে কিছুই করিতে হইল না। দুই মাস না যাইতেই বৃদ্ধ একখানি সামান্য কুঁড়ে ঘরে থাকিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

আবার দেখ, রামের ছেলে যদুর ছেলের সঙ্গে খেলাইতে খেলাইতে তাহাকে একটা চড় মারিয়াছিল। যদু রামের অপেক্ষা মানে বড়। যদুর তাহা সহিবে কেন? সে রামকে খুব কড়া কড়া শুনাইয়া দিল। রামও আপনার মান বড় কম বিবেচনা করে না, সেও মান তুড়িয়া তাহার যথোপযুক্ত উত্তর দিল। তখন মানে মানে সংঘর্ষ হইয়া তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইল। মিথ্যাসাক্ষ্য, জাল, মারপিট, মামলা মোকদ্দমা নানা রকমে দুইজনে পশুর সমান হইয়া আপনা আপনি উৎসন্ন যাইতে বসিল। দেশে ঘরে দশ টাকা খরচ করিয়া ক্রিয়া কলাপ করিলে বেশ মান পাওয়া যায়,—কালীর সে সঙ্গতি নাই, চাকুরি করিয়া মাসে যাহা পায়, তাহা খাইতেই কুলায় না। অগত্যা কালী মনিবের তহবিল ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইল। সেবার খুব ঘটা করিয়া শ্যালীপোর অন্নপ্রাশন দিল। দেশে ঢিটি পড়িয়া গেল। তিন মাস না যাইতে সবাই শুনিল-কালীর হাতে হাতকড়ি পড়িয়াছে, সে এখন শ্রীঘরে বাস করিতেছে। আর কত দৃষ্টান্ত দেখাইব? প্রতিবেশী আপনার মান বাড়াইবার জন্য প্রতিবেশীর প্রতি অত্যাচার করিতেছে, জমিদার খয়রাত করিয়া গভর্ণমেণ্টে মান পাইবার জন্য প্রজার রক্ত শোষণ করিতেছে, মানী লেখক পাছে অপর কোন লেখক তাহার সমকক্ষ হইয়া উঠে, এই জন্য যেমন করিয়া পারে তেমনি করিয়া তাহাকে দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে; স্ত্রী দুইখানা গহনা পরিয়া মান পাইবে বলিয়া স্বামীকে দেনার জ্বালায় দেশত্যাগী করিয়া তুলিতেছে—সে সব কত কথা কত বলিব?

দেখা গেল, মানের সকল দোষ অপেক্ষা তাহার মোহান্ধকারিতাই বড় ভয়ানক। অন্য কথায় বলিতে হইলে বলা যায় যে, মানের পূর্ব্বে উপসর্গ ব্যবহার করিয়া যত কিছু শব্দ নিষ্পাদিত হইতে পারে, সেই সকল সোপসর্গ শব্দের মধ্যে অভিমান কথাটাই যত অনর্থের মূল। অনেকে মানের সহিত অভিমানের তুল্যার্থবোধকত্ব নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত "মান ভঞ্জন।" অবশ্য, রাইকিশোরী যে গুরুমানে মানিনী, সে কথা আমরা অস্বী-

কার করি না, কিন্তু মান অপেক্ষা বাইচাঁদকে তখন যে অভিমান-রাহুতে বেশী ঘেরিয়াছিল সে কথাও আমরা এক দিনের জন্য অমান্য করিতে পারিব না। সেই অভিমানের ফল যাহা ফলিল, তাহা আজ গোবিন্দ অধিকারীর গুণে বাঙ্গালায় কাহারও জানিতে বাকি নাই। কৃষ্ণ আসিয়া যাহা না করিবার তাহা করিলেন। "দেহি পদপল্লব মুদারম্" বলিয়া পায়ে ধরিয়া পর্য্যন্ত সাধিলেন। রাধিকার দুর্জ্জয় অভিমান ভাঙ্গিল না। তারপর কৃষ্ণ নিরাশ হইয়া চলিয়া গেলেন। তখন রাজকুমারীর চেতনা হইল। হায় হায় করিয়া "হা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ' করিতে করিতে বৃন্দা, বিশাখা প্রভৃতি দূতীদিগের করে ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন অভিমানিনী আপনাকে যেরূপ তিরস্কার করিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিলে বুঝা যায়, অভিমান কিরূপ ধিক্কারের সামগ্রী। অভিমানের আর আর দৃষ্টান্তের কথা ততটা উল্লেখ-যোগ্য মনে করি না।

যদি সোপসর্গ মানের কথা পাড়িলাম তবে 'অনুমান' শব্দ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। যাঁহারা বানান অশুদ্ধ করিয়া ন'র মাত্রাটা দিতে ভুলিয়া যান, তাঁহারা ইহার মর্য্যাদা বোধে সম্পূর্ণ অশক্ত,—অনুমানকে অণ্ বলিয়া উল্লেখ করা কম অর্ব্বাচীনতার কার্য্য নহে। কিন্তু 'ন'র মাত্রাটী ফুটন্ত করিয়া টানিয়া দেওয়া যাঁহাদের অভ্যাস আছে, তাঁহারা বেশ জানেন, মান বংশের মধ্যে অনুমান মহাশয় বড় একটা ছোট খাট লোক নহেন। অনুমানও নিজে নিজ বংশমর্য্যাদা রক্ষা করিতে বড় যত্নশীল, নানা রকমে তিনি তাঁহার আদিপুরুষ মানের পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন। কে গুরু, কে লঘু, কার মান কতটা হওয়া উচিত তাহা প্রথম দর্শনেই ঠিক্ করিবার ক্ষমতা অনুমানের বিলক্ষণ আছে। দর্শনশাস্ত্রেও বুঝি এই জন্য অনুমানের প্রশংসা এত অধিক। দার্শনিক কোন প্রতিপাদ্যের মীমাংসা করিতে গেলে, তাঁহাকে দুইটী বিষয়ের উপর নির্ভর করিতে হয়—প্রত্যক্ষ, আর অনুমান। প্রত্যক্ষ বহিরিন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত, অনুমান পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতীত। সুতরাং তুমি যাহাকে প্রত্যক্ষ-গোচরে দুর্দ্দান্ত, অত্যাচারী, পরস্বাপহারক দস্যু বলিয়া ডরাইতেছ, অনুমান মহাশয় যে তাহাকে শীঘ্রই রাজা বাহাদুর করিয়া মহামানের দোলায় দোলাইবেন তাহা বড় বিচিত্র নহে। অনুমানের আর একটা বিশেষ গুণ, সে ফাঁকাফাঁকিতে বড় মজবুত। এই জন্যই বোধ হয় শব্দশাস্ত্রে সুপণ্ডিত কোন

কোন মহাত্মা ইহার সহিত 'হনুমান' কথাটার বিশেষ সাদৃশ্য দেখিয়া থাকেন। এরূপ যুক্তি নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়াও বোধ হয় না। বর্ণগত কিঞ্চিৎ ভেদ থাকিলেও লক্ষগত কোন ভেদ দেখা যায় না। হনুমান যেমন প্রয়োজন বোধে আপনার দেহ ও লাঙ্গুল শতযোজন পর্য্যন্ত বিস্তার করিয়া সৃষ্টিছাড়া লাফ দিতেন, অনুমান তাহার অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে। আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানেও দুইজনের কেহই বড কম নয়। রামচন্দ্র মুক্তারমালা দিয়া অত মান বাড়াইলেও হনুমান তাহা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন; আর অনুমানের মীমাংসার বিরুদ্ধে তোমার সহস্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকিলেও অনুমান তৎক্ষণাৎ তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া দিবেন। স্পেন্সরপ্রমুখ দার্শনিকেরা বলিয়া থাকেন, কেহই কোন বিষয় বিশেষের আবিষ্কর্ত্তা নহে; লুথার না জন্মিলেও যে কালে প্রোটেষ্টাণ্টিসম্ ধর্ম্ম প্রচারিত হইত এবং নিউটনের অবর্ত্তমানেও যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার হইত, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কথাটা যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে, আজ কাল মাত্র টোল ছাড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে, রাজদরবারে, ডিবেটে, এসোসিয়েশনে, কৌন্সিল হাউসে, কাগজে, বজেটে, কথায় কথায় লেখায় লেখায় যেরূপ অনুমানের উপর লাফালাফি চলিয়াছে, তাহা ধরিয়া স্পষ্ট বলা যাইতে পারে ডারুইন মহাত্মা জন্মগ্রহণ না করিলেও তাঁহার সুমহৎ তত্ত্ব অনাবিষ্কৃত থাকিত না।

এতদ্ভিন্ন সোপসর্গ মানের মধ্যে প্রমাণ, পরিমাণ প্রভৃতি আরও অনেক শব্দ আছে; কিন্তু যখন মূল মানেরই প্রমাণ পরিমাণ আজিও কিছুই বুঝা গেল না, তখন সে সব বিষয়ের অধিক আলোচনা না করাই ভাল।

মান নিতান্ত অস্বাভাবিক পদার্থ হইলেও একটা বিষয়ে তাহার স্বাভাবিকত্বের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। সে মাথা পাতিয়া বা হাতে ভর করিয়া কখন চলিয়া বেড়ায় না। পদের উপর ভর না দিলে খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। পদের লঘুত্ব গুরুত্ব অনুসারেই মানের লঘুত্ব গুরুত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। তাহার সাক্ষ্য—যাহার ছয় খানি পা সে চিরকালই জগতের আদরের বস্তু। স্বয়ং মন্মথ তাহাকে আপনার পারিষদ্ করিয়াছেন; কবিমহল ষট্‌পদের গুণ গুণ ধ্বনির গুণ গাহিয়া আজিও ফুরাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তার পর, চতুষ্পদদিগের মধ্যে যাহাঁর পায়া কিছু

ভারি তাহারই মানের ভারিত্ব অধিক। হস্তীর ন্যায় গুরুপদবিশিষ্ট আর কেহ নাই সিংহ, শার্দ্দূল বলবিক্রান্ত হইলেও মানে হস্তীর সমকক্ষ নহে। সাগরমন্থনে লক্ষ্মী উঠিয়াছিলেন চন্দ্র উঠিয়াছিলেন, সুধা উঠিয়াছিল, আর উঠিয়াছিল—ঐরাবত। দ্বিপদ পক্ষীদিগের মধ্যে ও অষ্ট্রিচের ন্যায় মান আর কাহারও নাই, কেন না, অষ্ট্রিচের ন্যায় সুদীর্ঘ পদপ্রাপ্তি কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। আর, মানুষ? মানুষ তো পদ পদ করিয়া সারা হইল। মানুষ যেমন পদের মাহাত্ম্য বুঝিতে, এমন বুঝিতে আর কেহই নহে। হেথায় পদহীনের বড়ই বিপদ। সে সংসারে নগণ্য মাত্র। তাহার অমন সুন্দর হৃদয় ও সুন্দর মস্তক থাকিতেও পদ নাই বলিয়া কেহই একটীবারের জন্যও তাহার প্রতি তাকাইল না। তাই লোকে আপন আপন পদবৃদ্ধির জন্য লালায়িত। যিনি হাকিম তিনি সদরালা হইবার পন্থা খুঁজিতেছেন, যিনি সদরালা তিনি হাইকোর্টের আসনে বসিবার সুযোগ ঠাহরিতেছেন; যিনি রায় বাহাদুর তিনি রাজা বাহাদুর হইবার চেষ্টায় নানা ফন্দি দেখিতেছেন, যিনি আবার রাজা বাহাদুর তিনি মহারাজ বাহাদুর হইবার অভিলাষে প্রাণপাত করিতেছেন। পৃথিবী শুদ্ধ লোকটা পদ পদ করিয়া এতই আকুল হইয়া পড়িয়াছে যে, বোধ হয় এখানে পদই ধর্ম্ম, পদই অর্থ, পদই কাম, পদই মোক্ষ। পদ ভিন্ন পরম পদার্থ আর কিছুই নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় মানুষ এত করিয়াও চতুষ্পদ হইয়া উঠিতে পারিতেছে না। কেহ কেহ আশা করেন, যেরূপ ধারাবাহিক অক্লান্ত চেষ্টা ও অবিশ্রান্ত উন্নতি চলিয়াছে, তাহাতে মানুষ যে অল্প দিনের মধ্যেই হস্তী প্রভৃতির সমকক্ষ হইতে না পারুক পদে গোরাসভাদির ন্যায় ও হইতে পারিবে, সে বিষয়ে বিশেষ ভরসা আছে।

এখন কথা হইতেছে, পদের প্রতি দৃষ্টি করিতে গেলে সহজেই দৃষ্টিটা আপনা হইতেই জুতার উপর গিয়া পড়ে. সুতরাং সাধারণ লোকে অনেক সময়ে মানের মূল্য কষিতে গিয়া জুতার মূল্যটাই কষিয়া দেখে। এই জুতার চাক্‌চিক্যে কত মহামূর্খ যে উচ্চদর ও উচ্চ মান প্রাপ্ত হইতেছে, আর খালি পায়ে থাকিয়া বা ছেঁড়া জুতা পায়ে দিয়া কত মাথার মণি মহাপুরুষ যে হতাদরে অপমানে দিন কাটাইতেছেন, তাহা কে নির্ণয় করিবে? বাগেশ্বর তর্কচূড়ামণি পথ চলিতে চলিতে একদিন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন যে,

যে দোকানী একদিন তাঁহার ছেঁড়া চটী ও ফাটা পা দেখিয়া দোকানে বসিতে চাহিলেও ভাল করিয়া কথা কহে নাই, সেই আজ তাঁহাদের পাড়ার বিখ্যাত বখাটে রামধোনা ছোঁড়াটার পায়ে বার্ণিসকরা বুট দেখিয়া মহাসম্ভ্রমে কড়িবাঁধা হুকায় তামাকু সাজিয়া অভ্যর্থনায় ব্যস্ত হইয়াছে। চূড়ামণি মহাশয় আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন; কিন্তু আশ্চর্য্য হইবার ইহাতে কিছু দেখা যায় না। দোকানী পাকাশিতো সামান্য লোক, চটী বুটের ভেদাভেদ আজ কাল সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বিশেষ বড়মানুষের বাড়ীতেতো আরও মহা বিপদ। প্রবেশ করিতে গেলেই দরোয়ান গুলা সিদ্ধিঘোর বড় বড় ভাঁটার ন্যায় চোখদুটা পাকাইয়া আগে জুতার প্রতি লক্ষ্য করে। বেচারী চটীর অধিকারী মহা কুণ্ঠিত হইয়া শশব্যস্তে সেখান হইতে শত হস্ত দূরে পলাইয়া তবে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন; যেন কি কঠিন অপরাধই করিয়াছেন। তা, অন্য পরে কা কথা, এসিয়াটিক সোসাইটী পণ্ডিতদিগের বৈঠক বলিয়া বিখ্যাত, সেই সোসাইটীতে সকলের বরেণ্য পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয় চটী পায়ে দিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া প্রবেশ করিতে পারেন নাই। নবাবী আমলেও জুতাকে মানদণ্ড করিবার প্রথাটা বড়ই প্রচলিত ছিল। যে সে লোক জুতা পায়ে দিয়া নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিত না। খালি পায়ে নবাবের নিকট উপস্থিত না হইলে নাকি তাঁহাকে অবমাননা করা হইত। নবাবীর সেদিন গিয়াছে, কিন্তু আজকালের হালি নবাব মফঃস্বলের অনেক হাকিমও নাকি জুতা না খুলিয়া এজলাসে প্রবেশ করিলে মহা অপমান বোধ করেন। বলা বাহুল্য, চটী, নাগরা, বুট প্রভৃতি যেমন জুতার নানা রূপান্তর দেখা গিয়া থাকে, তেমনি জুতাভেদ যে মানেরও ভেদ হইবে সে বিষয়ে কোন বিচিত্রতা আছে বলিয়া বোধ হয় না।

মানের একটা বিশেষ দোষ, সে বড় ভঙ্গপ্রবণ। একটু মাত্র ত্রুটীতে এমন করিয়া টুটিতে আর কোন জিনিষ দেখা যায় না। একটা কথার আঘাত যাহার সহে না, তাহার ন্যায় ভঙ্গুর জিনিষ আর আছে কি? এই জন্য মানকে খুব যত্ন করিয়া রাখা বড় দরকার, এবং এই জন্য যিনি মানী বলিয়া আপনাকে ঠাহরাইতে শিখিয়াছেন, তাঁহাকে সদাই অতি সন্তর্পণে থাকিতে হয়, কিল খাইয়া কিল চুরি না করিলে তাঁহার চলে না। একটা চলতি কথা আছে "যার মান তার ঠাই।" কথাটা মোটা হইলেও মানের

হাটে ইহার দর খুব। কথাটী কেবল আমাদের দেশের জন্যই হয় নাই। বৈদেশিকেরাও ভাষান্তরে বলিয়া থাকেন—'Honor is due to them, who honor themselves.' আমি যাঁহাকে প্রথম সম্ভাষণে "আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিলাম, তিনি যদি প্রত্যুত্তরে ঠিক তাহার বক্তুকজু মিলাইয়া আমাকে "আপনি" বলিয়া না ডাকিয়া "তুমি" বলিয়া সম্বোধন করিলেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তিনি তাঁহার নিজের মান রক্ষা করিতে সক্ষম নহেন। তার কারণ, আমি দ্বিতীয়বার আর তাঁহাকে "আপনি" না বলিয়া "তুমি" বলিয়াই সম্বোধন করিব। যার বাড়া নাই জন্মদাতা পিতা যদি "প্রাপ্তেতু ষোড়শবর্ষে পুত্রে মিত্রবদাচরেৎ" এই নীতিবাক্যের মর্ম্মগ্রহ করিয়া উপযুক্ত পুত্রের সহিত যথাবৎ ব্যবহার করিতে না পারিলেন, তাহা হইলে সেই পুত্রের নিকট তাঁহারই মান থাকা ভার হইয়া উঠে। এই মানের দায়ে পিতা পুত্রের সহিত কথা কহিতে জড়সড় হন; জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের কাছে অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া সকল কথা বলিতে পারেন না; প্রভু ভৃত্যকে আদেশ করিবার সময় না বুঝিয়া সুঝিয়া সব কথা বলিতে সাহস করেন না। বলিতে কি, মান না থাকা যেমন দায়, মান থাকাও তেমনি দায়—বরং তদপেক্ষা অধিক দায়। যার নাই তার এক জ্বালা, যার আছে তার শতেক জ্বালা।

জিজ্ঞাসা করি, মান না থাকা ভাল, কি মান লইয়া এমনি করিয়া সসর্প-গৃহবাসের ন্যায় থাকা ভাল? এই মান বাড়াইবার জন্য এত প্রাণান্তিক চেষ্টাই বা পড়িয়াছে কেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। "মান" বলিয়া এক প্রকার দেশজবৃক্ষ আছে, তাহাকে বাড়াইতে হইলে তাহার গোড়ায় ছাই দিতে হয়। আমার মতে এই মানের পক্ষেও সেই ব্যবস্থা শ্রেয়স্কর। যদি কিছু মাত্র কাহারও মান থাকে, আর সেই মান বৃদ্ধির ইচ্ছা নিতান্ত বলবতী হয়, তবে তাহাকে ছাই চাপা দেওয়াই প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া বোধ হয়। সব দেবতার বাস দিব্যধামে, আর শিবের বাস শ্মশানে, সকলের গায়ে চন্দন, আর শিবের গায়ে ভস্মলেপ, শিব ভিন্ন কোন দেবতাই মহাদেব আখ্যা প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। সকল রাজা রাজড়াই এক এক জন বিদূষক রাখিতেন, বিদূষকদিগকে কাজ কর্ম্ম বড় কিছু করিতে হইত না, অথচ তাহারা রাজ সরকারে পোষিত হইত। রাজ কার্য্যে থাকিয়া প্রধান মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য প্রজা পর্য্যন্ত সকলের নিকট

সমস্ত দিন রাজসম্মান কুড়াইতে কুড়াইতে ঝালাপালা হইয়া সন্ধ্যার সময় রাজা বিদূষককে লইয়া মানের দম-আটকান পোশাক খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া খোলা প্রাণে খোলা কথায় আমোদ আহ্লাদ করিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতেন। মন্ত্রী প্রভৃতি সকলেই তো যুক্তকরে প্রতিনিয়ত অঞ্জলি অঞ্জলি করিয়া এত সম্মানের ডালি পায়ের উপর ঢালিয়া দিত, কিন্তু সেই যে ন্যালা-খ্যাপা ব্রাহ্মণ মানের কোন ধার না ধারিয়া খোলা হৃদয়ে যা আসিত তাহাই বলিত, সে ভিন্ন রাজার বয়স্য নামে অভিহিত হইতে কেহই পারিত না। স্বীকার কর বা না কর, এমন সময় অনেক আসে, যখন মানের গোড়ায় ছাই ঢাকা দিতে পারিলেই প্রাণটা জুড়াইয়া যায়।

মহাজন কবি একস্থানে লিখিয়াছেন—"রাধিকার বেড়ি ভাঙ এ মম মিনতি।" এ বেড়ি কিসের? মানের। তখন ছেলে মানুষ ছিলাম, বুঝিতাম না, কবি মানকে বেড়ি বলিয়া কেন উল্লেখ করিলেন। কিন্তু এখন বিলক্ষণ জানিতে পারিতেছি—এরূপ কঠিন বেড়ি বুঝি আর নাই। যে বেড়ি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভাঙ্গিতে পারেন নাই, সাধ করিয়া সেই বেড়ি পরিবার জন্য কেন লোকে এত আনটান, এত যথাসর্ব্বস্ব পণ করে, সে রহস্য ভেদ করা বড়ই শক্ত কথা।

রাগ করিও না, আমার মতে এ সংসারে মানহীনেরই জয়। যাহাকে মাপিতেই পারিলাম, তাহার আবার বড়ত্ব রহিল কোথায়? যার মান নাই, এই অর্থজ্ঞাপক একটা শব্দ আছে—বিমান। বল দেখি, বিমানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে? কোথায় আদি, কোথায় অন্ত, ইহার ব্যাসই বা কত, আর পরিধিই বা কত বর্গযোজন কিছুই ঠিকানা নাই। ইহার গোড়ায় কি আছে, শেষেই বা কি থাকিতে পারে, তোমার সহস্র বৈজ্ঞানিক যুগযুগান্তর ধরিয়া আজিও তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে নাই। মান নাই বলিয়া কাহাকেও অবজ্ঞা করিও না। একজন ফকির গাহিয়াছিল—

"আমার মন মনুয়া শোন্‌রে কথা,
ওরে আস্‌মান যোড়া ফকির তার জমিন যোড়া কাঁথা;
এ ফকির মর্‌লে পরে গোর হবে তার কোথা।"

কথাটা সকলেরই তলাইয়া বুঝা উচিত।

পাপের বিচার।

যে সমস্ত পাপের বিচার ধর্ম্মাধিকরণে হইয়া থাকে, তাহা উল্লেখ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। যে সমস্ত পাপের সামাজিক প্রতিবিধান হওয়া উচিত, সেই গুলিই আলোচনা করা অভিপ্রেত।

সাধারণতঃ মনুষ্যের দ্বিবিধ চরিত্র দৃষ্ট হয়। সমাজ মধ্যে একরূপ এবং পরিবার মধ্যে অন্য প্রকার। হয়ত কোন ব্যক্তি সাধারণের নিকট অতিশয় আদরণীয়, শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র, আবার সেই ব্যক্তিই পরিবার মধ্যে সকলেরই বিরাগভাজন, সকলের নিতান্ত অপ্রিয়। তিনি সাধারণের নিকটে আদৃত, তাঁহার সাধারণ হিতজনক কার্য্য কলাপে অথবা ভদ্রোচিত ব্যবহারে। তিনি পরিবার মধ্যে অপ্রিয়, ইহাও তাঁহার কার্য্য অনুসারে। সাধারণ কার্য্য করিতে হইলে তাঁহাকে সাবধান হইয়া করিতে হয়, কারণ সেই কার্য্যের সমালোচক আছে। সেই সমালোচকদিগকে ভয় করিয়া তাঁহাকে কার্য্য করিতে হয়। পারিবারিক কার্য্যে যাঁহারা সমালোচক, তাঁহারা কোনরূপে তাঁহাকে শাসন করিতে পারে না—ইহা তাঁহার বিশ্বাস। অর্থাৎ সাধারণ চরিত্রের সমালোচক আছে, ভয় আছে, অপ্রকাশ্য চরিত্রের (private character) সে ভয় নাই। এজন্য অপ্রকাশ্য চরিত্রে তিনি স্বেচ্ছাচারী। তিনি গোপনে গোপনে সুরাপান করেন, তিনি বেশ্যাসক্ত, তাহার প্রকৃতি অতি কুৎসিৎ।

যে কার্য্যে পরিদর্শকের ভয় নাই, সমালোচকের তাড়না নাই, সে কার্য্যে নানা প্রকার ব্যভিচার ঘটিয়া থাকে। এ দোষ মানবের প্রকৃতিগত। মনুষ্য কাহার অভিশপ্ত বলিতে পারি না, কিন্তু প্রকৃতস্বভাববিশিষ্ট মনুষ্য অতি বিরল। জীবনে আমার কখন ভুল হয় নাই, ইহা কেহই বলিতে পারে না। জীবনের কার্য্যের জন্য অনুতাপ করেন নাই, এমন লোক নাই। তাপই পাপ। পাপের রেখা মস্তিকে অঙ্কিত হইলেই মস্তিষ্কের সেই অংশ বিকৃত হইল। এক-জন কবি লিখিয়াছেন "Errors in the life breed errors in the brain, and these reciprocally those again." জীবনে ভুলচুক হইলে মস্তিষ্কে

বিকার হয়, মস্তিকবিকারে আবার ভুল হইতে থাকে। বংশানুক্রমে এইরূপ কত ভুল হইয়াছে—কত হইতেছে। পিতা মাতা, পিতামহ মাতামহ, ইহাদের জীবনের সুখ দুঃখ, পাপ তাপ, পুত্র পৌত্রাদিতে অর্শাইয়া থাকে। আমরা শরীর ও মন দুইটাই পূর্ব্ব পুরুষ হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকি। দেখা গিয়াছে, এক এক প্রকার রোগ বংশপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। সেই বংশের সকলকেই অল্লাধিক পরিমাণে আক্রমণ করিতেছে। আমার শরীরের উপাদান পাইয়াছি, পিতৃপিতামহাদির শরীর হইতে। সেখানে যে সমস্ত আধিব্যাধি বীজভাবে রক্ত মধ্যে নিহিত ছিল, সেই বীজ রক্তের সহিত আমার শরীরেও আসিয়াছে। সময়ে সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়, পরে রোগ আক্রমণ করে। মন-সম্বন্ধে ও এইরূপ। যখন মনুষ্য এইরূপ বিকৃত মন লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তখন যদি তাহার ব্যভিচার হয়, তবে পাপের স্রোত বহিতে থাকে। এজন্য অভিভাবকের আবশ্যক।

সংসার সম্বন্ধে যেমন, সাহিত্যসম্বন্ধে ও সেই একই কথা। যে সাহিত্যে গ্রন্থকার সমালোচকের তাড়নায় ভীত নহেন, সে সাহিত্যে স্বাস্থ্য থাকে না। উপস্থিত বাঙ্গালা সাহিত্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে এ-সত্য বিলক্ষণ উপলব্ধি হইবে। নানা প্রকারের কবি, উপন্যাসলেখক, প্রবন্ধ লেখক, ইতিহাসবিদ্, বিজ্ঞানবিদ্ বাঙ্গালা সাহিত্যের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন। এ অতি সুখের কথা। কিন্তু এই সাহিত্য উদ্যানে নানা প্রকার গাছড়াও বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে। এই লেখকগণ বলেন—তাঁহাদের "গীতি," তাহাদের "কাব্য," তাহাদের "মত" কালে দেশে আবালবৃদ্ধ বনিতার মত হইয়া দাঁড়াইবে। কবি অনন্ত আশায় সেই দিনের অপেক্ষা করিতেছেন, যখন বিধবা আর ব্রহ্মচর্য্য করিবে না।—ভারতেশ্বরী বিধবার আবেদন গ্রাহ্য করিয়া দেশে আর বিধবা রাখিবেন না। হায়। সেই দিন কবে আসিবে, যখন পৌত্তলিকতা দূরে যাইবে, সমাজের ভিত্তি ভাঙ্গিয়া পড়িবে, কবির ইচ্ছার বিরুদ্ধে সামাজিক কঠোর নিয়ম সকল আসিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। সেদিন কবে আসিবে, যখন কুসংস্কারাপন্ন হিন্দু রমণী অবগুণ্ঠন মধ্যে আর থাকিতে চাহিবে না, যখন স্ত্রীলোক বস্ত্রাবৃত হইয়া কবির—রমণীর-সর্ব্ব-অঙ্গ-দর্শন-সঞ্জাত কবিতার অন্তরায় হইবে না। সেই মুহূর্ত্তেই হিন্দু-সমাজ চরমোৎকর্ষে উপনীত হইবে! তখন 'বেদ বৃষকের গীতি' এই নূতন সত্য মানব মনে

প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয়ে সুধা ঢালিয়া দিবে। সত্য ধর্ম্ম, সত্য শিক্ষা, সত্য বিবাহ, সত্য প্রেম অনন্ত শাখায় হিন্দু মনে প্রবেশ করিয়া নূতন সঞ্জীবনী শক্তিতে মৃত জাতিকে জীবিত করিয়া তুলিবে, আর স্বর্গচ্যুত হিন্দু জাতিকে আবার অমরাবতীতে পৌঁছিয়া দিয়া আসিবে।

স্বীকার করা যায় মনুষ্য দুর্ব্বলহৃদয়; হৃদয়-দৌর্ব্বল্য বশতঃ মনুষ্য ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত অতিশয় ক্লেশকর এবং অসাধ্য বলিয়া মনে করে। কিন্তু জগতে সম্পূর্ণ মনুষ্য কোথায়ও নাই। আদর্শ মত না হইতে পারে, কিন্তু আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া নিষ্কামভাবে নিজের কর্ত্তব্য পালন করাই মনুষ্যত্ব। আদর্শের সম্মুখীন হইতে মনুষ্য যত চেষ্টা করে, ততই তাহার হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ঘুচিয়া যায়, ততই সে পূর্ণতার পথে অগ্রসর হইতে থাকে। বিশেষ না দেখিয়া না চেষ্টা করিয়া উচ্চ আদর্শ দেখিয়াই যদি বলা যায় দুর্ব্বলহৃদয় মানুষের পক্ষে ইহা অসাধ্য, অতএব দুর্ব্বলতার উপর দৃষ্টি রাখিয়া চল, তবে কোন দিন বিধবাকে নিশীথে অশ্রুত্যাগ করিতে দেখিয়া তুমি মর্ম্মে মর্ম্মে পীড়িত হইবে, তাহার দুঃখ দূর করিবার জন্য তোমার হৃদয় নাচিয়া উঠিবে। অসাধ্য ব্রহ্মচর্য্য কর্ম্মনাশার জলে ভাসাইয়া দিয়া তুমি বিধবার বিবাহ দিবে। কিন্তু গুরুতর বিচার্য্য বিষয় এই—প্রবৃত্তিসন্তোষের জন্য বিবাহ দিলে কি বিধবার দুঃখ ঘুচিল? প্রবৃত্তি সন্তোষ কি মানুষের মনুষ্যত্ব? মানুষ দুর্ব্বল হৃদয়, তজ্জন্য আদর্শ কত দূর বিনাশ করা উচিত, ইহার মীমাংসা করিতে গেলে দুই পক্ষে নানা গুরুতর প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। এই সম্বন্ধে ভিক্টার হিউগোর মন্তব্যটি বোধ হয় এস্থলে অসংলগ্ন হইবে না। হিউগো বলেন—

The ideal alone is incorruptible. No weakness should be a plea to corrupt it.'

Mathew Arnold বলেন—

'We know that we fall conspicuously short of an ideal, yet this is no reason why should we give up our ideals."

ইহারা বাস্তবিক আদর্শ কিনা এতদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে নানা প্রকার তর্ক উঠিয়া থাকে। আগে মীমাংসা করিয়া স্থির কর—সকলকে বুঝাইয়া দাও যে ব্রহ্মচর্য্য মন্দ, ইহা আদর্শ নহে, অথবা মনুষ্য ইহা পালনে অসমর্থ, তবে ঐ সমস্ত চিন্তা সমাজ মধ্যে চালাইতে চেষ্টা করা উচিত। কারণ যদি

গ্রন্থকারের ভুল বিশ্বাস হয়, সেই ভুল বিশ্বাসমত কার্য্য করিলে সমাজের অত্যন্ত বিপদ। মনুষ্য জীবন লইয়া গ্রন্থকার ক্রীড়া করেন। যদি তাঁহার বুদ্ধি বা জ্ঞানে কিছু দোষ থাকে, আর তজ্জন্য সমাজের অনিষ্ট হয়, তবে গ্রন্থকার সে জন্য দায়ী। জুবেয়ার বলেন—

"Ignorance which in matters of morals extenuates the crime, is itself in intellectual matter a crime of the first order."

অন্ততঃ যতদিন এই সমস্ত না মীমাংসা হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এই সমস্ত চিন্তার প্রচার, (কার্য্যত পরের কথা) কোন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন লেখকের উচিত নহে।

Mathew Arnold দেখাইয়াছেন—

"How dangerous it is to propagate the view, that things must be settএরূপ est and understood afterwards. This will produce monsteিগর মধেhfusion"

সমাজে আজ যাং ত আরম্ভ হইয়াছে, তাহা কি তর্ক যুক্তি মীমাংসা দ্বারা সিদ্ধান্তীকৃত হইয়া গিয়াছে?

মানুষ শরীরগৃহে কাম ক্রোধাদি অনেক গুলি পশু পুষিয়া রাখিয়াছে। কিরূপে এই পশুগুলি স্ববশে রাখিতে হয়, লেখক ইহা যেন বিস্মৃত না হন। এই সকল দমন করিতে হইলে জ্ঞান বুদ্ধির উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। যতদিন লোকে জ্ঞানালোক ঘৃণা করে, ততদিন রিপুর দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতে হয়, এই সমস্ত ব্যক্তি কিরূপ ঘৃণার পাত্র ইত্যাদি। ইহাই লেখকের উদ্দেশ্য। ইহা লেখক যখন বিস্মৃত হন—যখন তাঁহার লেখায় পাপের সহিত সহানুভূতি ঘটে, তখন তিনি অজ্ঞাতসারে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ অর্জ্জন করেন। আমরা বাঙ্গালা উপন্যাসে দেখিতে পাই, আমাদের রিপুসমূহ যে পরিমাণে উত্তেজিত হয়, দয়া, ভ. ক্ত, কর্ত্তব্য জ্ঞান তাহার শতাংশের একাংশ পরিমাণেও জাগিয়া উঠে না। Bain সাহেব এই সমালোচনা সম্বন্ধে এক অতি সারগর্ভ উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলেন—

"The best way to criticise a fiction or a drama is to see whether the high art or the grosser element is most influential. The proper aim of the act of education and culture is to

enable us to feel those higher artistic effects, at the best possible expenditure of gross and grovelling passion."

যেখানে রিপুর উত্তেজনা নাই, পাপে সহানুভূতি নাই, অথচ উচ্চপ্রবৃত্তি জাগ্রত হইতেছে, সেইখানেই নাটক উপন্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

পাপ স্বভাবতঃ অতি ভীষণ। যাঁহারা ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পারেন, তাঁহারা পাপকে সর্ব্বদাই ঘৃণা করিয়া থাকেন। পাপের উপরে যে চাকচিক্যময় আবরণ দেখা যায়, তাহা প্রকৃতির কৌশল। প্রকৃতি কুৎসিত দেখিতে পারে না। এজন্য পাপকেও আবরণ দিয়া সুন্দর করিয়া রাখে। সাধারণের মত গ্রন্থকার যদি পাপের উপরে দৃষ্টি করিয়াই সর্ব্বসমক্ষে ঐ চিত্র অঙ্কিত করেন, তবে তিনি গ্রন্থকারের কর্ত্তব্য বুঝেন না—ইহাই অনুমিত হয়। পাপ পাপের মত আঁকিতে না পারিলে তাহা হইতে ভয়ানক অনিষ্ট সাধিত হয়।

Dowden সাহেব বলেন—A faithful pres[illegible]n of the facts of the world does not leave us indiffer[illegible] good and evil, but rather rouses within us an inextinguisha[illegible]le loyalty to good. It is any *falsifying of those facts* whether the falsification be that of the sensualist or of the purist, whether it be a lie told to seduce us to vice or to bribe us to virtue, it is this which 'may possibly lead us aside from directness, simplicity and uprightness of action"

গ্রন্থকার পুস্তক লিখিয়া যদি পাপের প্রশ্রয় দেন, তবে তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও মিথ্যাবাদী বৈ কি? "Rightness of action" কিছুতেই হইতে পারে না। তিনি আপন দোষে সমাজের অনিষ্ট সাধন করেন! কবি স্পেন্সার ডুয়েসার (Duessa) চরিত্রে পাপের পূর্ণ চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। Una এক। Duessa দুই। পাপের মূর্ত্তি দুটী। ডুয়েসা নানাপ্রকার অলঙ্কার পরিয়া, সুন্দর সুন্দর মনভুলান কথা কহিয়া Una অপেক্ষা Redcross knightকে বশীভূত করিল—পরে কবি যখন আবরণ খুলিয়া দেখাইলেন—ডুয়েসার প্রকৃতরূপ কি, তখন তাঁহার পূর্ব্বকার সৌন্দর্য্য, পূর্ব্বকার প্রলোভন পাঠকের চক্ষে ঘৃণার উপাদান হইয়া পড়িল। পাপ দূর হইতে যতই মনোহর হউক না কেন ভিতর

খুলিয়া দেখাইলে ইহার উপর লোকের অবশ্যই ঘৃণা জন্মিবে। নহিলে পৃথিবী এতদিন থাকিত না। সেক্সপিয়ার কখন রূপ বর্ণনা করিতে ভাল বাসিতেন না। হোমার যেমন পাঠকদিগের নিকট মানিয়া লইয়াছিলেন Helen সুন্দরী, পরে বৃদ্ধ দমিতপ্রবৃত্তি প্রায়ামের (উত্তেজিত যুবকের মুখে নহে) মুখে হেলেনের সৌন্দর্য্যের দুই একটী কথা বলিয়াই যেমন বর্ণনা অপেক্ষা পাঠকের কল্পনার সৌন্দর্য্য অধিক প্রস্ফুটিত করিয়া দিয়াছেন, সেক্সপিয়ার ও প্রায় সেইরূপ করিয়াছেন। সেক্সপিয়ার পাপীর চিত্রের উপরটা কোথাও দেখান নাই। সেক্সপিয়ার দেখিতেন—অন্তরের বস্তু। কোথাও প্রকৃতি তাঁহাকে প্রতারিত করিতে পারে নাই।

বৃদ্ধ হোমার পাপ চরিত্রে অন্যবিধ কৌশল দেখাইয়াছেন। সকলে পাপকে ঘৃণা করিতেছে, কিন্তু পাপীকে ক্ষমা করিতেছে। অধিক ক্ষমতা না থাকিলে গ্রন্থকার এরূপ কৌশল দেখাইতে অক্ষম। এই ক্ষমতা আমাদিগের বড় বড় লেখকদিগের মধ্যেও অভাব দেখিয়া আমরা সময়ে সময়ে বড় ব্যথিত হই।

কবি আদর্শ চরিত্র সকল মাঝে মাঝে আনিয়া সাধারণ মানব সমক্ষে ধরেন। সকল সাহিত্যেই এরূপ আদর্শ চরিত্র একটা না একটা আছে। আমাদের বাঙ্গালায় ও আজকাল আদর্শ চরিত্র চিত্র করিবার চেষ্টা হইয়াছে। প্রথম চেষ্টা প্রফুল্ল। যে জন্য প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতি আদর্শ গুলি, গল্পচ্ছলে লিখিত প্রফুল্ল তাহাই। বেদব্যাস যে ভাবে গল্প করিয়াছেন, তাহাতে প্রহ্লাদ কল্পিতike চরিত্র বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু বঙ্কিম বাবু প্রফুল্লকে যে ভাবে সাজাইয়াছেন, তাহাতে প্রফুল্ল 'নিষ্কাম ধর্ম্ম' হইলেও প্রফুল্ল জীবিত। প্রকৃত ঘটনার সহিত, সামাজিক ক্রিয়া কলাপের সামঞ্জস্য রাখিয়া ধর্ম্মের প্রকৃতি মনুষ্যাকারে সজীবভাবে চিত্রিত করা অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক।

আমরা সর্ব্বশেষে যাঁহারা সামাজিক চিত্র অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করেন, জর্জ্জ ইলিয়টের একটি কথা তাঁহাদিগকে শুনাইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে অরাজকতার ইতি করিব।

George Eliot বলিতেছেন—

"Realism is the basis of all art and its antethesis is not

idealism but falsism. To misrepresent the forms of ordinary life is no less an offence, than to misrepresent the forms of ideal life; a pugnosed Apollo or a Jupiter in great coat would not be more *truly shocking to an artistic mind than are those* senseless falsifications of nature. Either give us true peasants or leave them untouched; either paint no drapery at all or paint it with utmost fidelity; either keep your people silent or make them speak the idiom of their class."

যাহা দেখিয়াছি, যাহা শুনিয়াছি, তাহাই অঙ্কিত করা কিরূপ দুরূহ, তাহা জার্ম্মান কবি সিলরের বাক্যে প্রতীয়মান হইবে—Schiller বলেন—

"The teacher, physician, historian and judge have daily occasion to observe how little men are accustomed to describe the simple fact and how very much they mix up in the statement (unconsciously or unintentionally) their own opinion and interest.

It is inconceivably hard, I had almost said impossible, to describe what has been seen or heard wholly and exactly as it has been seen and heard. We often introduce our own feelings, without anticipating it and although we have the strongest and purest love of truth."

এইরূপ যেখানে সমালোচকের অভাব, যেখানে সমালোচক ক্ষমতা-হীন, সেখানেই মানব স্বভাবের ব্যভিচার।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই, যদি সমালোচক না থাকিলে অধিকাংশ কার্য্যে বিকৃতি হইবার সম্ভাবনা, তবে যাঁহারা দায়িত্ব বুঝেন না তাঁহাদের অপ্রকাশ্য চরিত্রে সমালোচক না থাকে কেন? তাঁহাদের গোপনীয় দোষ সমূহ সাধারণের নিকট প্রকাশে সামাজিক ক্ষতি না লাভ হইতে পারে?

জীবন অত্যন্ত দুরূহ। এখানে অন্য সম্পর্করহিত হইয়া কোন কার্য্য করা যায় না। এক জনের কার্য্যে তাহার নিজের ও আর পাঁচ জনের ইষ্টা-

নিষ্ট হইয়া থাকে। যাহারা চিন্তা করিতে জানে না, যাহারা তর্ক বুঝে না, তাহারা কোন উদ্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তির দোহাই দিয়া মন্দ কার্য্য করে। এমন কি কোন উপদেশ দিতে গেলে, তাহারা আগে বলিয়া বসিবে, আর পাঁচ জনেও ত এইরূপ করিয়া থাকে। ইহাদিগকে কোনরূপেই বুঝান যায় না। তবেই দেখা গেল, অলক্ষিতভাবে যাহারা অন্যের আদর্শস্থলীয় তাহাদের অপ্রকাশ্য চরিত্রে দোষ থাকিলে উহা সামাজিক কলঙ্ক কতদূর বর্দ্ধিত করে। এতভিন্ন প্রত্যক্ষ দোষত নানা প্রকার ঘটে।

আর এক কথা—যদি আমার পাপের জন্য বংশপরম্পরায় অনিষ্ট হয়, তবে আমার দ্বারা সমগ্র মানব জাতীর কত অপকার সাধিত হইল? এইরূপ শত সহস্র প্রকারে প্রমাণ করা যায় যে, অপ্রকাশ্য চরিত্রের দোষ গোপন করিলে সমাজের নানা প্রকার অনিষ্ট হয়। Tennyson এ সম্বন্ধে অতি সুন্দর বিচার করিয়াছেনঃ—যে সকল লোক স্ত্রী দুশ্চরিত্রা জানিয়াও তাহার উপর সংসারের ভার দেন, কবি তাঁহাদিগের সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"I hold that man the worst of public foes
Who either for his own or children's sake,
To save his blood from scandal, lets the wife
Whom he knows false, abide and rule the house
For being through his cowardice allowed
Her station, taken every where for pure
She like a new disease, unknown to men
Creeps, no precaution used, among the crowd
Makes wicked lightenings of her eyes and saps
The fealty of our friends and stirs the pulse
With devil s leaps, and poisons half the young

স্ত্রী সম্বন্ধেও যেরূপ নষ্ট পুরুষ সম্বন্ধেও সেই কথা। কবি ইহাতে সমাজের অনিষ্ট দেখাইয়া দিয়াছেন মাত্র, কিন্তু কি উপায়ে ইহার প্রতিবিধান করা যাইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করেন নাই, আর তাহাও দুঃসাধ্য নহে। এখন কথা হইতেছে—মন্দ চরিত্র পুরুষ নিজের চরিত্র উন্নত না করিলে সমাজ ইহাদের উপর কত টুকু জোর প্রকাশ করিতে পারে?

ইহা মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ধনবান ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদিগকে শাসন করিবে কে? কর্ত্তব্য দেখাইয়া দিবে কে? কারণ অর্থবলে ইহারা উপকারকেরও নানাপ্রকার অনিষ্ট করিতে পারেন।

এ স্থলে আমাদের একমাত্র বক্তব্য এই যে, অপ্রকাশ্য চরিত্রের কথা সাধারণের গোচর করাই ইহার সম্পূর্ণ প্রতিবিধান। ইহাদ্বারা দুশ্চরিত্র ব্যক্তি সকলের নিকট ঘৃণিত হন। বিশেষতঃ সকল সম্প্রদায়েই ভাল মন্দ লোক আছেন। যিনি সব জজ নামের কলঙ্ক, শিক্ষক নামের কলঙ্ক, জমীদার নামের কলঙ্ক—ইহাদিগকে শাসন করিবার জন্য আর পাঁচজন সচ্চরিত্র সবজজ মহাশয়, সচ্চরিত্র শিক্ষক, সচ্চরিত্র জমীদার নিজ নিজ সম্প্রদায়ের দোষ দূরকরণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলে এই বিষয়ের প্রতিবিধান হইতে পারে। এরূপ চেষ্টাও প্রশংসার্হ।

কিন্তু আবার অপ্রকাশ্য চরিত্র সমালোচনার বিরুদ্ধেও নানা কথা বলা যাইতে পারে—পরের দোষ প্রকাশ করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি না ইহা মীমাংসা করিবে কে? আজ আমি ইহার ফলাফল বিচার করিয়া অঙ্ক পাড়িয়া যাহা ঠিক্ করিলাম, তাহাতে নানা প্রকার দোষও স্পর্শ করিতে পারে। যদি ধর্ম্মনীতির এমন কোন বিধান দেখাইতে পার, যাহাতে লোকের প্রকৃত দোষ প্রকাশ করা উচিত ধার্য্য হয়, তবে লোকে উহা কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে। Ten commandmentsএর অথবা মনুর ত্রিবিধ পাপের মধ্যে কোথাও এই কর্ত্তব্যের উল্লেখ নাই। বরং খৃষ্ট ধর্ম্মের এক স্থানে খৃষ্ট নিজে বলিতেছেন Judge not অর্থাৎ কাহারও বিচার করিও না। মনু বলেন—সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ মাব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং। কারণ মনুষ্য নিজের কার্য্য কলাপের জন্য অতি অল্পই দায়ী। নানাপ্রকারে তাহার চরিত্র গঠিত হয় ইত্যাদি। হিন্দুধর্ম্মে আরও আছে—তুমি বিচার করিবার কে? যখন মনুষ্য নিজ নিজ কর্ম্ম ফলের জন্য দায়ী, তখন তুমি অন্যের দোষ দেখাইবার কে? তোমার অনধিকার চর্চ্চা কেন? তুমি দেখিতেছ না—ইহাতে অন্যরূপে কত অনিষ্ট হইতে পারে। প্রথমতঃ মনে কর, কোন গ্রন্থকার গ্রন্থ লিখিয়া সমাজের উপকার করিতেছেন—কিন্তু তাঁহার অপ্রকাশ্য চরিত্রে নানা প্রকার দোষ আছে। তুমি যদি ঐ সমস্ত দোষের কথা সাধারণে প্রকাশ কর, তবে তাঁহার উপদেশের ফল বিনাশ করা হইল, কাজেই সেই পরিমাণে সমাজের ক্ষতি করা হইল না কি?

ইহার মীমাংসাস্থলে আমরা স্বভাব বা প্রকৃতি (nature) যাহা বিচার করিয়া দেন, তাহার উপর নির্ভর করিব। কবি অথবা গ্রন্থকার সমাজের সর্ব্বত্র আদরণীয়, কিন্তু যদি তাঁহার চরিত্রে দোষ থাকে, প্রকৃতি তাহা উপেক্ষা করেন না। তাহার গ্রামে অনুসন্ধান কর, সেখানকার লোকে গ্রন্থকারের উপর বিরক্ত। কেহই তাহার কথায় বিশ্বাস করেন না। কারণ তাহার অপ্রকাশ্য চরিত্রে নানা প্রকার দোষ। প্রকৃতি যখন পাপ গোপন রাখেন না, তখন আমরা সেই পথ অনুসরণ না করি কেন? সকল কার্য্যেই প্রকৃতির সহায় লইতে হয়— মনুষ্য শারিরীক নিয়ম লঙ্ঘন করে, প্রকৃতি অল্পে অল্পে তাহা সংশোধন করিয়া দেন; কিন্তু এখানে যেরূপ স্বভাবকে সাহায্য করিবার জন্য ঔষধ পত্রাদির আবশ্যক হয়, ওখানেও সেইরূপ প্রকৃতির কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য সাধারণের নিকট ঐ সমস্ত দোষের সমালোচনা আবশ্যক—ইহাতে ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট হইবে না। আপাততঃ যাহাদের দ্বারা সমাজে অনিষ্ট হইতেছে, তাহারাই অপ্রিয় হইতেছে, পরে তাহাদেরই দৃষ্টান্তে সমাজের অনেকের বহুল উপকার হইবে। শেষে গীতার একটী শ্লোকদ্বারা ঐ বিচারের মীমাংসা করিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

পাপীর দণ্ড দিতে ভগবান নিজে জন্মগ্রহণ করেন :—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্যগ্লানি র্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্ম সংরক্ষণার্থায় সম্ভাবামি যুগে যুগে।"

লোক হিতের জন্য ভগবান যে কার্য্য করেন, লোক হিতের জন্য আমি তাঁহার পন্থানুসরণ করিব ইহাই আমার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। ইহাতেই ভগবানের ইচ্ছামত কার্য্য করা হইল।

কর্ত্তব্য বিহীন, দায়িত্বশূন্য জীবকে ভগবান নিজেই কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। যেমন নিজের রক্ষা প্রাকৃতিক নিয়ম, সেইরূপ যাহারা self pres[illegible]ation এর ব্যাঘাত দেয় তাহাদের দমন ও কর্ত্তব্য; এজন্য মানুষের দ্বিবিধ [illegible]র্ত্তব্যই গুরুতর—নিজ রক্ষা ও শত্রু দমন উভয়ই চাই। ইহা না করিলে [illegible] নানা প্রকার পাপ আইসে।

আজ পুরাণ [illegible] হিন্দুজাতি যে পাপে পরিপূর্ণ হইতেছে, তাহার এই একটি

গুরুতর কারণ।—যখন লোকে দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য বিমুখ হয়, তখন সমাজে নানাবিধ অধর্ম্মাচরণ হইতে থাকে। গীতা বলেনঃ—

অধর্ম্মাভিভবাৎকৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণ সঙ্করঃ
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্যচ
পতন্তি পিতরোহ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদক ক্রিয়াঃ।
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতঃ।

আজ দেশ উৎসন্ন যাইতেছে কিনা চিন্তাশীল পাঠক মাত্রেই তাহা হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করিতেছেন।

রমণী।

১

কাফি, পোস্তা।

বুঝ্‌তে নারি নারী কি চায়!
হাস্‌তে হাস্‌তে কেঁদে কেন
আস্‌তে কাছে ফিরে যায়!
মাঝ্-খানে ছেদ, কইতে কথা,
চাইতে চাইতে মোদে পাতা,
কি এমন তার প্রাণের ব্যথা
আভাস দিতে চমকায়।

২

বারোঁয়া, খেম্‌টা।

হাসি-টুকু দেখ্‌তে চাই,
তাই কি চেয়ে দেখ না?
চোখে চোখে রাখ্‌তে চাই,
তাই কি কাছে থাক না?

ছুটো কথা শুন্‌বে আমার,'
আজো সময় হ'লোনা তার—
তুল্‌লে কথা—নুইয়ে মাথা,
কথা যেন মাথ না।

৩

কালাংড়া, আড়্‌খেম্‌টা।

কোমল নারী।
ততোধিক সুকোমল হৃদি তাহারি।
তা চেয়ে কোমল কত,
সে হৃদি-বাসনা যত!
সহে না সে হৃদি-ফুলে নয়ন-বারি।
নিশীথ-নন্দন-বনে,
কেবল বিহ্বল মনে,
দাঁড়ায়ে রব কি দূরে, রাখি ফুল ঝারি?

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

বাঙ্গালার উপন্যাস লেখক।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

[চন্দ্রশেখর ও রজনী]

বঙ্কিম বাবুর পঞ্চম উপন্যাস চন্দ্রশেখর। ইহাও দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতির ন্যায় একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস, কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনা অপেক্ষা ইহাতে সাংসারিক চিত্রেরই প্রাধান্য অধিক। দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক ঘটনা পরিপূ[illegible] গল্প একত্র করিয়া এই উপন্যাস রচিত হইয়াছে। ১ম গল্প চন্দ্রশেখর, শৈ[illegible]নী এবং প্রতাপকে লইয়া এবং ২য় গল্প নবাব মীরকাসেম, দলনী এবং গুর[illegible]ক লইয়া। রাজ্যলোভী ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর চতুর ইংরাজ কর্ম্মচারী[illegible] মধ্যে আসিয়া এই দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন ঘটনামূলক গল্পকে একত্রিত করি[illegible]হ। ইহা গল্পাংশে বঙ্কিম বাবুর অন্যান্য উপন্যাস অপেক্ষা নিকৃষ্ট

হইলেও চরিত্র অঙ্কনে ইহা কাহার অপেক্ষা ন্যূন নহে। পুরুষ চরিত্রের মধ্যে চন্দ্রশেখর ও প্রতাপই প্রধান, এবং স্ত্রী চরিত্রের মধ্যে শৈবলিনী ও দলনী এই স্থলে উল্লেখ যোগ্য।

প্রথম চন্দ্রশেখর। চন্দ্রশেখরই এই উপন্যাসের নায়ক। এই চরিত্র যেরূপ উচ্চদরের, গ্রন্থকার সেরূপ উজ্জ্বল বর্ণে ইহাকে চিত্রিত করেন নাই। কিন্তু আমরা স্থানে স্থানে এই মহান চরিত্রের যে আভাস মাত্র পাইয়াছি, তাহাতেই আমরা এই মহান চরিত্রের মহত্ত্বের পরিচয়ও পাইয়াছি। বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই দেশের কবি না হইলে এরূপ চরিত্রের কল্পনা অসম্ভব হইত। চন্দ্রশেখর অন্য দেশে দুর্লভ হইলেও ভারতে ইহা দুর্লভ নহে।

চন্দ্রশেখরের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য—জ্ঞানোপার্জ্জন। দার পরিগ্রহে জ্ঞানোপার্জ্জনের বিঘ্ন হয় বলিয়া তিনি দ্বাত্রিংশ বৎসর অতিক্রম করিয়াও বিবাহ করেন নাই। পরে যে বিবাহ করিলেন, সেও জ্ঞানোপার্জ্জনের সৌকার্য্যার্থে।

আমরা চন্দ্রশেখরের প্রথম কার্য্য কি দেখিলাম—না তিনি প্রতাপকে জলমগ্ন হইতে দেখিয়া নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়াও প্রতাপের জীবন রক্ষা করিলেন। এই প্রথম কার্য্যের দ্বারাই চন্দ্রশেখর কি ধাতুতে নির্ম্মিত, আমরা তাহার আভাস পাইলাম। জ্ঞানোপার্জ্জন চন্দ্রশেখরের জীবনের প্রধান ব্রত হইলেও শৈবলিনীর প্রতি তাঁহার ভালবাসা অসীম ছিল। শৈবলিনী গৃহত্যাগিনী হইয়া গেলে, যখন চন্দ্রশেখর তৈজস, বস্ত্র প্রভৃতি সমস্ত গৃহস্থ দ্রব্য জাত দরিদ্র প্রতিবাসীদিগকে বিতরণ করিয়া দিলেন আর আপনার শোণিত তুল্য প্রিয় সমস্ত গ্রন্থরাশিতে অগ্নি জ্বালিয়া দিয়া ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন —সেই অগ্নিকাণ্ডেই শৈবলিনীর প্রতি তাঁহার অগাধ ভালবাসার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। সুন্দরী শৈবলিনীকে যথার্থই বলিয়াছিল—"যে স্বামীর মত স্বামী জগতে দুর্লভ, তাঁহার স্নেহে তোমার মন উঠে না। কি না, বালক যেমন খেলাঘরের পুতুলকে আদর করে, তিনি স্ত্রীকে সেরূপ আদর [illegible]ত জানেন না। কি না, বিধাতা তাঁকে সং গড়িয়া রাঙতা দিয়া সা[illegible]ই, মানুষ গড়িয়াছেন। তিনি ধর্ম্মাত্মা, পণ্ডিত, তুমি পাপিষ্ঠা, তাঁহা[illegible] মনে ধরিবে কেন? তুমি অন্ধের অধিক অন্ধ, তাই বুঝিতে পা[illegible], যে

তোমার স্বামী তোমায় যেরূপ ভাল বাসেন, নারীজন্মে সেরূপ ভালবাসা দুর্লভ—অনেক পুণ্য ফলে এমন স্বামীর কাছে তুমি এমন ভালবাসা পেয়েছিলে।"

তাহার পর চন্দ্রশেখর কিরূপ পরোপকারী আমরা তাহারও বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়াছি। তাঁহার পরোপকার নিস্বার্থ পরোপকার, সে পরোপকার ব্রতে জাতি, ধর্ম্ম প্রভৃতিও তাঁহার বিবেচ্য নহে। আর তাঁহার ক্ষমাগুণের পরিচয় আমরা আর কি দিব? যে ফষ্টর তাঁহার সমস্ত বিপদের মূল, প্রতাপকে তাহার বধার্থে গমন করিতে দেখিয়া চন্দ্রশেখর বলিতেছেন—"ফষ্টরের বধে কাজ কি ভাই? যে দুষ্ট, ভগবান তাহার দণ্ডবিধান করিবেন, তুমি আমি কি দণ্ডের কর্ত্তা? যে অধম সেই শত্রুর প্রতি হিংসা করে—যে উত্তম সে শত্রুকে ক্ষমা করে।"

তাঁহার জ্ঞানোপার্জ্জনের পরিচয় আর ইহা অপেক্ষা কি অধিক হইতে পারে? শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের পর তাহাকে পুনঃ গ্রহণ করিয়াও চন্দ্রশেখর তাঁহার হৃদয়ের মহত্বতা বিলক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন। বড় দুঃখের বিষয় এই যে, এরূপ ধার্ম্মিক ও মহাপুরুষ সংসারে সুখী হইতে পারেন নাই। তাহার কারণ, তাঁহার পত্নী শৈবলিনী হিন্দুপত্নী ছিল না। চন্দ্রশেখর যদি শৈবলিনীর রূপে মুগ্ধ না হইয়া অন্য কোন হিন্দু পরিবারের কন্যা বিবাহ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সংসার সুখের সংসার হইত।

চন্দ্রশেখরের পর প্রতাপ। এই প্রতাপ চরিত্র চন্দ্রশেখর চরিত্র অপেক্ষা উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত। আমরা প্রতাপকে যেখানে দেখিয়াছি, সেই খানেই তাঁহার মহৎ চরিত্রের পরিচয় পাইয়াছি। "প্রতাপের ন্যায় কৃতজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয় পুরুষ এ সংসারে দুর্লভ। তিনি হৃদয়ের বলে যেরূপ বলবান, শারিরীক বলে ও সেইরূপ বলবান। আবার তাঁহার শারিরীক বল ও যেরূপ, সাহস ও তদনুরূপ। বাস্তবিক প্রতাপ চরিত্রে বঙ্কিমবাবু বিশেষ গুণপনা প্রকাশ করিয়াছেন।

অতি শৈশবকাল হইতে প্রতাপ ও শৈবলিনীর ভালবাসা জন্মিয়া ছিল। ক্রমে যখন উভয়ে বুঝিল যে, তাহাদের এই ভালবাসার ফল শুভ হইবে না, তখন উভয়ে পরামর্শ করিয়া গঙ্গায় সাঁতার দিতে গেল। অনেক দূর গিয়া প্রতাপ বলিল—"শৈবলিনী, এই আমাদের বিয়ে!"

শৈবলিনী বলিল—"আর কেন—এই থানেই।" প্রতাপ ডুবিল, কিন্তু শৈবলিনী ডুবিল না। আমরা ইহাই প্রতাপের প্রথম কার্য্য দেখিলাম, ইহা সম্পূর্ণ প্রতাপের চরিত্রানুযায়ী কার্য্য। যে প্রণয় আত্ম বিসর্জ্জন শিক্ষা দেয়, প্রতাপ সেইরূপ উচ্চদরের প্রণয়ী। কিন্তু শৈবলিনীর প্রণয় এখন তত উচ্চে উঠে নাই, সেই কারণ শৈবলিনীর ডুবিতে ভয় করিল, সে সন্তরণ করিয়া কূলে ফিরিয়া আসিল।

তাহার পর শৈবলিনীর সহিত চন্দ্রশেখরের বিবাহ হইয়া গেল। প্রতাপ জন্মের মত শৈবলিনীকে হারাইল। তখন শৈবলিনীকে ভুলিবার জন্য প্রতাপ বেদগ্রাম ত্যাগ করিল, আর সুন্দরীর ভগিনী রূপসীকে বিবাহ করিল। প্রতাপের এই বিবাহ কার্য্যটি কেহ কেহ অনুমোদন করেন না তাঁহারা বলেন যে শৈবলিনীর প্রতি যদি প্রতাপের ভালবাসা সমভাবেই রহিল, তবে আবার তাঁহার রূপসী কেন? এই বিবাহে প্রতাপের চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ করিয়াছে। আমরা কিন্তু এ কথা স্বীকার করি না, এই বিবাহ কার্য্যেতেই তাঁহার চরিত্রানুযায়ী কার্য্য করা হইয়াছে। প্রতাপ সেরূপ মৃদু প্রকৃতির লোক নহে, যে প্রণয়ে নিরাশ হইয়া আজীবন বিবাহ করিবে না। এই বিবাহও তাঁহার অন্য একটী আত্মবিসর্জ্জনের দৃষ্টান্ত। তবে প্রতাপের চরিত্রে কলঙ্কস্পর্শ করিত, যদি রূপসীর দুঃখে আমাদের সহানুভূতি জন্মাইত, গ্রন্থকার সেই কারণ কৌশল করিয়া রূপসীকে তফাতে রাখিয়াছেন।

প্রতাপ সুন্দরীর মুখে শৈবলিনীর গৃহত্যাগের সংবাদ শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। চন্দ্রশেখরের নিকট তিনি অনেক বিষয়ে ঋণী, সুতরাং তাঁহার বিপদের সংবাদ শুনিয়া কি তিনি স্থির থাকিতে পারেন? মুঙ্গেরে আসিয়া শৈবলিনীকে ফষ্টারের হাত হইতে রক্ষা করিলেন। এইখানে প্রতাপের একটী ভয়ানক পরীক্ষা হইয়া গেল, সেই পরীক্ষায় প্রতাপ সম্পূর্ণ জয়ী হইল। প্রতাপের ভৃত্য রামচরণ তাঁহার অজ্ঞাতে তাঁহারই শয়নগৃহে শৈবলিনীকে আনিয়া রাখিয়াছিল। সেই রাত্রে শৈবলিনী হঠাৎ প্রতাপকে দেখিয়াই মূর্চ্ছা গেল, মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর প্রতাপ ও শৈবলিনীর যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহাতেই আমরা প্রতাপের হৃদয়ের বলের পরিচয় পাইয়াছি। এবং গ্রন্থকারের চরিত্র চিত্রনের সুন্দর কৌশল দেখিয়া তাঁহাকে শতসহস্র ধন্যবাদ দিয়াছি। এইখানে আমরা শৈবলিনীর গৃহত্যাগের কারণ বুঝিতে

পারিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম, এবং প্রতাপের দেবদুর্লভ চরিত্র ও আমাদের সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হইল। গ্রন্থকার এই স্থান বড়ই সুন্দর বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। তাহার পর প্রতাপ ও শৈবলিনীর সেই 'অগাধ জলে সাঁতারের' দৃশ্য আমরা জীবনে কখন ভুলিতে পারিব না। এইখানে প্রতাপ চরিত্র সাধারণ মানব চরিত্র হইতে কত উচ্চদরের তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। এই দুই স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার আমাদের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ আমরা তাহা পারিলাম না। পাঠকগণ এই দুই স্থল একবার মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেই প্রতাপ চরিত্র বুঝিতে পারিবেন। পরিশেষে প্রতাপের মৃত্যু গ্রন্থকার প্রতাপ চরিত্রের উপযুক্তরূপে ঘটাইয়াছেন। প্রতাপের মৃত্যু ঘটনাতেও প্রতাপ চরিত্রের রং বেশ ফুটিয়াছে। এ স্থলেও গ্রন্থকার বিশেষ গুণপনা দেখাইয়াছেন।

প্রতাপের পর শৈবলিনী। কেহ কেহ বলেন এই শৈবলিনী চরিত্র অঙ্কিত করিয়া বঙ্কিম বাবু অজ্ঞাতসারে আমাদের হিন্দু সমাজের কতকটা অনিষ্ট সাধন চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এরূপ কলঙ্কিনীর চিত্র হিন্দু সমাজের সম্মুখে না আনিলেই ভাল হইত। তাহারা আরো বলিয়া থাকেন—এখন বঙ্কিম বাবু আমাদের শিক্ষিত সমাজের একজন প্রধান শিক্ষক। এ দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা এখন তাঁহার উপন্যাস পাঠ করিয়া থাকেন, বিশেষতঃ শিক্ষিত স্ত্রীলোকদিগের চরিত্রগঠন অনেকটা তাঁহারই দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে, কারণ তাঁহার ঔপন্যাসিক চরিত্রই তাহাদের আদর্শ চরিত্র। সুতরাং তাঁহার কাল্পনিক চরিত্রগুলি এরূপ ভাবে চিত্রিত করা উচিত, যাহাতে সুশিক্ষা ভিন্ন কুশিক্ষা না থাকে, এবং যাহা পাঠ করিয়া লোকের মনে কুপ্রবৃত্তির উদ্রেক না হয়। এই সকল অনুযোগের যে কিছুই কারণ নাই, আমরাও একথা স্বীকার করি না। এই চরিত্রে যে দোষটুকু স্পর্শ করিয়াছে, তাহা দেখাইতেছি।

শৈবলিনী চরিত্র যে একজন কুলকলঙ্কিনী রমণীর চরিত্র এ কথা আর আমাদিগকে প্রমাণ করিতে হইবে না। আমাদের পাঠকগণই বলুন, আর স্বয়ং গ্রন্থকারই বলুন শৈবলিনীর ন্যায় অন্য পুরুষাসক্ত স্ত্রীলোক কেহই ইচ্ছা করেন না, এবং সেটা নিতান্ত দুর্ভাগ্য ভিন্ন সৌভাগ্যও নহে। পুণ্যের চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখান গ্রন্থকারের যেরূপ কর্তব্য, পাপের চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখান ও সেইরূপ কর্তব্য। তাহা না করিলে পাপ ও পুণ্যের প্রভেদ বুঝা যাইবে কি করিয়া? কিন্তু পুণ্যের চিত্র অঙ্কিত করা যত সহজ, পাপের চিত্র অঙ্কিত করা তত সহজ নহে। এ স্থলে পাপকে এরূপ ভাবে চিত্রিত করিতে হইবে, যাহাতে দেখিবামাত্র সকলের পাপের প্রতি ঘৃণা জন্মায়। এখন এই কলঙ্কিনী শৈবলিনী চিত্র কিরূপ ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, দেখা যাউক।

শৈবলিনী পাপের চিত্র হইলেও গ্রন্থকার যেরূপ ঘটনার বশবর্ত্তী করিয়া এই পাপের চিত্র আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন, তাহাতে শৈবলিনীর প্রতি আমাদের ঘৃণা না হইয়া বরং সহানুভূতি হয়। পাপের প্রতি সহানুভূতি উত্তেজনা করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য না হইলেও শৈবলিনী চরিত্রে এই দোষ যে স্পর্শ করিয়াছে, তাহা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য। আমরা বহুবার শৈবলিনীকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলাম, কিন্তু তত্রাচ তাহার প্রতি আমাদের ঘৃণা হইল না, বরং তাহার দুরদৃষ্টের কথা স্মরণ করিয়া আমরাও ব্যথিত হইলাম। তাহার কারণ প্রতাপ ও শৈবলিনীর প্রগাঢ় বাল্যপ্রণয়ের সুন্দর দৃশ্য আমাদের স্মৃতিপথে রহিয়াছে, আর আমরাও সে প্রণয়ের সে সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া উভয়ের মিলনের জন্য নিতান্ত ইচ্ছুক। এদিকে সমাজ কিন্তু সে মিলনের প্রতিবন্ধক। কাজেই প্রথম হইতেই আমরা স্বভাবগুণে দুর্ব্বলা শৈবলিনীর পক্ষ হইয়া পড়ি, এমন সময় চন্দ্রশেখর আমাদের প্রতাপকে ঠেলিয়া ফেলিয়া শৈবলিনীরত্ন (জ্ঞান ও রত্ন) লাভ করিল। এই ঘটনায় শৈবলিনীর প্রতি আমাদের সহানুভূতি একটু একটু করিয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহার পর চন্দ্রশেখর আপনার জ্ঞানোপার্জ্জনেই নিরত, গ্রন্থকার স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, কেবল জ্ঞানোপার্জ্জনে বিঘ্ন ঘটিবে বলিয়াই চন্দ্রশেখর বিবাহ করিতে রাজী। চন্দ্রশেখরও বিবাহের পর শৈবলিনীর প্রতি বাহ্যিক ব্যবহার ভাল করে নাই, ইহাতে শৈবলিনীর প্রতি আমাদের সহানুভূতি এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল, যে ফষ্টরের সহিত গৃহত্যাগেও আমাদের তাহার প্রতি ঘৃণা হয় না, আমরা কেবল বিস্মিত হইয়া থাকি। সুন্দরী যখন চন্দ্রশেখরের গুণের কথা পাড়িয়া শৈবলিনীকে ভর্ৎসনা করিল, সে ভর্ৎসনাও যেন সেই সহানুভূতির স্রোতে ভাসিয়া গেল।

পরে যখন আমরা দেখিলাম, যে শৈবলিনী প্রতাপের জন্য গৃহত্যাগিনী, আর সেই প্রতাপই তাহাকে সেই জন্য ভর্ৎসনা করিতেছে। তখন শৈবলিনীর প্রতি আমাদের সহানুভূতি পূর্ণ মাত্রায় উঠিল। পরিশেষে সেই জ্যোৎস্নালোকে গঙ্গাবক্ষে শৈবলিনী ও প্রতাপের সন্তরণকালে যে ঘটনা ঘটে, কি জানি কেন তাহাতেও আমরা শৈবলিনীর জন্যই দুঃখিত।

স্বীকার করি, শৈবলিনীর জীবন নাটকের শেষ অঙ্ক গ্রন্থকার যেরূপ দক্ষতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে অনেক শিক্ষা আছে। তাহার সেই প্রায়শ্চিত্তের দৃশ্য দেখিয়া কাহার না পাপের প্রতি ঘৃণা জন্মায়? শৈবলিনী এতদূর কুপথে অগ্রসর হইয়া আবার কিরূপে ধীরে ধীরে সুপথ অবলম্বন করিল, ইহা দেখাইতে কবি যেরূপ কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, কে না সে শক্তির প্রশংসা করিবে? শৈবলিনীর পাপের প্রায়শ্চিত্তের দৃশ্য অতি সুন্দর হইয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু এই সময় যদি তাহার পাপের পরিমাণ আমাদের হৃদয়ে ভালরূপ অঙ্কিত থাকিত, তাহা হইলে তাহার এই প্রায়শ্চিত্ত দেখিয়া

তাহার পাপের প্রতি আমাদের যে ঘৃণা জন্মিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ ঘৃণা জন্মাইত। শৈবলিনীর প্রতি আমাদের সহানুভূতি এতদূরে গিয়া পড়িয়াছে যে, তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেখিয়া, তাহার প্রতি আমাদের যতদূর ঘৃণা হওয়া উচিত, ততদূর ঘৃণা কিন্তু তখন হয় না। তখনও যেন আমাদের হৃদয়ে তাহার প্রতি একটু আধটু সহানুভূতি লুকান থাকে।

এই সকল অনুকূল ঘটনা শৈবলিনীর স্বাপক্ষে থাকায়, শৈবলিনী কলঙ্কিনী হইলেও তাহার প্রতি আমাদের সহানুভূতি জন্মায়। আমাদের মতে শৈবলিনীর প্রতি চন্দ্রশেখরের ভালবাসা অত প্রচ্ছন্নভাবে না রাখিয়া গ্রন্থকার যদি একটু উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিতেন, তাহা হইলে শৈবলিনীর প্রতি আমাদের এতদূর সহানুভূতি না হইয়া বরং ঘৃণাই হইত। আর তাহা হইলে শৈবলিনী যেরূপ কলঙ্কিনী, আমরাও তাহাকে সেইরূপ কলঙ্কিনীভাবেই দেখিতে পারিতাম।

বাধা পাইলে কামিনীহৃদয়নিহিত প্রণয়-আবেগ কত দুর্দমনীয় হয়, এবং সেই বাধা অতিক্রম করিবার জন্য কিরূপ সাহস ও বল প্রকাশ করিতে পারে, ইহা চিত্রিত করাই কবির শৈবলিনী চরিত্রের উদ্দেশ্য। আর ইহার পার্শ্বে সেই প্রেমময়ী দলনীর চিত্র আনিয়া কবি উভয়ে চিত্রেরই সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। যে দলনী শত সহস্র বেগমের মধ্যে থাকিয়াও নবাবের মনোমুগ্ধ করিয়াছিল, কে দলনীরে দেখিয়া কেনা মুগ্ধ হইবে? শৈবলিনীর প্রণয়-স্রোত আপনার মনোমত সাগরের সহিত মিলিবার জন্য প্রবলবেগে প্রবাহিত, দলনীর প্রণয়-স্রোত কিন্তু মনোমত সাগরে মিলিত হইয়াও দৈব দুর্ঘটনা বশত বিচ্ছিন্ন, সুতরাং সেই সাগরের উদ্দেশেই কেবল আছাডকাছাড খাইয়া শুকাইয়া গিয়াছে। একজন নিরাশপ্রণয়ে সন্তাপিত, অন্যজন বিরহে জর্জ্জরিত। একজন নিরপরাধিনী হইয়াও কলঙ্কিনী, অন্যজন অপরাধিনী হইয়াও পবিত্রা। কিন্তু উভয়ে সমান দুর্ভাগ্যবতী হইলেও উভয়ের প্রতি আমাদের সমান সহানুভূতি হইতে পারে না।

রজনী বঙ্কিমবাবুর ষষ্ঠ উপন্যাস। চন্দ্রশেখরের পর রজনী বড়ই উপযুক্ত হইয়াছে। কারণ রজনী চন্দ্রশেখরের শৈবলিনী চরিত্রের রূপান্তর মাত্র। শৈবলিনী যে যে বিষয়ে অসম্পূর্ণ ছিল, রজনী ও লবঙ্গলতাতে সেই সেই বিষয়ের সম্পূর্ণতা দেখান হইয়াছে। শৈবলিনী যে সাহস ও হৃদয়ের বলের অভাবে সংসার ছারখারে দিল, অন্ধ রজনী সেই সাহস ও হৃদয়ের বল দেখাইয়া কেমন সোণার সংসার গড়িয়া লইল। শৈবলিনী যদি সংসারে প্রবেশ করিবার সময় রজনীর ন্যায় হৃদয়ের বল দেখাইতে পারিত, তাহা হইলে তাহাকে আর প্রণয়নৈরাশ্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না। যে হৃদয়-বলের অভাবে শৈবলিনী পতিত, সেই হৃদয়ের বলে বলবতী হইয়া রজনী

সামান্য অবস্থা হইতে উন্নত। শৈবলিনীর জীবনের প্রথম ভুল, রজনীর জীবনে সংশোধিত হইয়াছে। শৈবলিনীর প্রথম শিক্ষক রজনী।

শৈবলিনীর জীবনের দ্বিতীয় অভাব—চিত্তসংযমে অক্ষমতা। যদি এই সময় শৈবলিনী লবঙ্গলতা হইতে পারিত তাহা হইলে আর তাহাকে কলঙ্কিনী হইতে হইত না। লবঙ্গলতা বৃদ্ধ স্বামী পাইয়াও চিত্তসংযমে সক্ষম হইয়াছিল, কিন্তু শৈবলিনী ধার্ম্মিক যুবা স্বামী পাইয়াও চিত্তসংযমে সক্ষম হইতে পারে নাই। শৈবলিনী পূর্ব্বানুরাগ বিস্মৃত হইতে না পারিয়া ধর্ম্মে পতিতা হইল, কিন্তু লবঙ্গলতা পূর্ব্বানুরাগ বিস্মিত না হইলেও ধর্ম্মে পতিতা হয় নাই। প্রতাপ পুরুষ হইয়া যাহা করিয়াছে লবঙ্গ স্ত্রীলোক হইয়াও তাহাই করিয়াছে। শৈবলিনী জীবনের দ্বিতীয় ভুল লবঙ্গতে সংশোধিত হইয়াছে—শৈবলিনীর দ্বিতীয় শিক্ষক লবঙ্গ। আমরা সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, চন্দ্রশেখরের পর রজনী বড়ই উপযুক্ত হইয়াছে।

আর চন্দ্রশেখরের প্রতাপের সহিত রজনীর অমরনাথেরও বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। কিন্তু একজন প্রণয়ে নিরাশ হইয়া চিত্তসংযমের অসাধারণ দৃষ্টান্ত দেখাইল, অন্যজন কিন্তু প্রণয়ে নিরাশ হইয়া সংসারত্যাগী হইল। একজনের জীবন সংগ্রামে পরিপূর্ণ, অন্যের জীবন কিন্তু শান্তিময়। দুই জনের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ, বলিয়াই একই ঘটনা দুইজনে দুইটি ভিন্ন ফল প্রদর্শন করিয়াছে।

এই অন্ধ রজনী চরিত্রে লর্ডলিটনের সুপ্রসিদ্ধ "Last days of Pompeii" নামক উপন্যাসের Blind flower girl Nydia চরিত্রের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। অন্ধ নায়িকা না হইলে যে সকল মানসিক বা নৈতিকতত্ত্ব প্রদর্শন করা অসম্ভব, অন্ধ নায়িকা লইয়া এই উভয় গ্রন্থেই তাহা সুন্দররূপে দেখান হইয়াছে। কিন্তু অন্ধ Nydiaর প্রণয়ে আমরা যে সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই, অন্ধ রজনীর প্রণয়ে সে সৌন্দর্য্য নাই। রজনী অন্ধ হইয়াও রূপবতী ও পরে বংশমর্য্যাদায় ও ধনসম্পত্তিতেও গৌরবান্বিতা হইয়াছিল। অন্ধ Nydiaর কিন্তু সেই প্রণয়-ভরা সৌন্দর্য্যময় হৃদয়খানি ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। সেই কারণ অন্ধ Nydiaর প্রতি আমাদের যতদূর সহানুভূতি হয়, অন্ধ রজনীর প্রতি ততদূর সহানুভূতি হয় না। আবার Nydiaর Glaucus Ioneএর প্রণয়ে আবদ্ধ, রজনীর শচীন্দ্র কিন্তু অন্যের প্রণয়াবদ্ধ ছিল না। অন্ধ Nydiaর গুণরাশি চক্ষুষ্মান পৃথিবীর কাহার চক্ষে পড়ে নাই, কিন্তু অন্ধ রজনীর গুণরাশি অমরনাথের চক্ষে পড়িয়াছিল। এই সকল কারণে লর্ড লিটন তাঁহার Nydia চরিত্রে যে সৌন্দর্য্যরাশির সৃষ্টি করিয়াছেন, বঙ্কিমবাবু কিন্তু রজনীর চরিত্রে সে সৌন্দর্য্যরাশির সৃষ্টি করিতে পারেন নাই।

বংশাবলি---পঞ্চম প্রস্তাব।

৫৯ জন মুখ্যকুলীন, গৌণকুলীন, ও শ্রোত্রিয়ের মধ্যে শাণ্ডিল্য গোত্রের ১৬ জন ঐ তিন শ্রেণীর কোন্ কোন্ শ্রেণীতে বিভক্ত, তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

১। মুখ্যকুলীন——১ জন——— ১ আদি বরাহ।

২। গৌণকুলীন——৫ জন
- ১ রাম
- ২ নীপ
- ৩ বাটু
- ৪ গুঁই
- ৫ মহামতি

৩। শ্রোত্রিয়——১০ জন
- ১ লাল (নান)
- ২ গুণমণি
- ৩ শাও (সাহ)
- ৪ গণপতি (বুড়)
- ৫ বিকর্ত্তন (মহামতি)
- ৬ নীল (বিক)
- ৭ মধুসূদন
- ৮ কোয় (নিক্রো)
- ৯ বাস্থ (শুভ, কাম)
- ১০ মাধব

সর্ব্বসমেত ১৬ জন।

"ধরাশূর, কি পরীক্ষাতে রাঢদেশবাসী ব্রাহ্মণগণকে মুখ্যকুলীন, গৌণকুলীন এবং শ্রোত্রিয় এই তিন ভাগে বিভক্ত করেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না।" (১১)

বৈতনের, সুবুদ্ধি ও সুভিক্ষ।

আদি বরাহের পুত্র বৈতনের, তৎপুত্র সুবুদ্ধি প্রভৃতি অধস্তন পুরুষেরা

---

(১১) গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ৮২ পৃষ্ঠা।

"বন্দ্যঘটী" গ্রামেই বসতি করিতেন। আদিবরাহের এক সন্তান গোবিন্দ সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও তদীয় জ্ঞাতিগণের পূর্ব্বপুরুষ। সুবুদ্ধির পৌত্র সুভিক্ষ। সুভিক্ষের অধস্তন ২০ বিংশ পুরুষ বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ভরদ্বাজ গোত্রেয় শ্রীহর্ষের অধস্তন বিংশ পুরুষ শ্রীনন্দন চট্টোপাধ্যায় ও কাশ্যপ গোত্রীয় দক্ষের বিংশ পুরুষ মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগে "ত্রিকুল" সম্প্রদায় স্থাপন করেন। দেবীবরের বৃত্তান্ত বর্ণনার অব্যবহিত পরে ত্রিকুলের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা রহিল।

পশুপতি (পহশো, সুহাস)।

"আদিবরাহের অধস্তন ৮ম অষ্টম পুরুষ পশুপতি। তাঁহার পিতার নাম গঙ্গাধর। ভগীরথ, গঙ্গাধরের অগ্রজ। এই ভগীরথ, স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গাধরের অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ প্রসিদ্ধ ভগীরথ অপেক্ষা কোন রূপেই গুণবান্ ছিলেন না। গ্রন্থান্তরে পশুপতির পহশো ও সুহাস এই দুই আখ্যা পাওয়া যাইতেছে। তাহার শকুনি, কিতো ও বিঠোক তিন সন্তান। প্রবাদ শুনা যায়, বিঠোক হইতে ঠাকুর উপাধিধারী যোড়াসাঁকোর পিরালী ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি।

জাহ্লন। ১০৩৬ শক।

শকুনির ২ দুই পুত্র, জাহ্লন ও মহেশ্বর। ইঁহারা উভয়েই অত্যন্ত প্রসিদ্ধ নবগুণ সম্পন্ন কুলীন। জাহ্লন, গোবৰ্দ্ধন পূতিতুণ্ড, বহুরূপ ও হলধর চট্টোপাধ্যায়, এবং আয়িত মুখোপাধ্যায়ের সহিত বৈবাহিক আদান প্রদান করেন। তৎসুত জয়পাণিও একজন প্রধান কুলীন।

মহেশ্বর। ঐ শক।

মহেশ্বর অতি বিখ্যাত লোক। তিনি কৃতবিদ্য ও মহাবিজ্ঞ, গুচ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। রাজা লক্ষ্মণসেনের সভায় তিনি তিলক স্বরূপ। প্রথমতঃ সমাজ মধ্যে তাঁহার প্রভুতা হ্রাস হইয়াছিল। গৌণ কুলীন অতিরূপ পিপ্পলী এবং রুদ্র চৌৎখণ্ডীর সহিত পরিবর্ত্ত করিয়া মহেশ্বর খর্ব্ব হন। যথা,—

"অতি রূপ পিপ্পলী ক্ষেমোক দোষাৎ, তুল্যোন গুচিনা সহিতর্ত্তিভবাৎ।

চৌৎখণ্ডী-কস্য সুতাঞ্চ লব্ধা, দত্তাত্মজাং ধর্ম্মো মহেশ্বরোঽভবৎ ॥"

—[এরুমিশ্র]

তৎপরে তিনি অবদান-পরম্পরা দ্বারা যে প্রতিপন্ন হন, তাহার প্রমাণ এই—

"মহেশ্বরো মহাবিজ্ঞঃ শুচ-চট্ট-সুতাপতিঃ, বাজ্ঞো লক্ষ্মণসেনস্য সভায়াং তিলকবঃ কৃতী। পিপ্পলীযাতিরূপেণ বিজ্ঞেন গুণশালিনা, চৌৎখণ্ডীকদকেন পরিবর্ত্তঃ সহাকবোৎ ॥

—[ধ্রুবানন্দ মিশ্রগ্রন্থ]

রাজা বল্লালসেন যে নিয়মে কুলীন ও অকুলীন নির্ব্বাচন করেন, তাহা এই,—

"কৌলীন্যমর্য্যাদা-ব্যবস্থাপনের দিন স্থির করিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে নিত্য-ক্রিয়া-সমাপনান্তে রাজসভায় উপস্থিত হইতে আদেশ করেন। তাহাতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ এক প্রহরের সময়, কতকগুলি দেড় প্রহরের সময় আর কতকগুলি আড়াই প্রহরের সময় উপস্থিত হন। যাঁহারা আড়াই প্রহরের সময় উপস্থিত হন, তাঁহারা কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন, যাঁহারা দেড় প্রহরের সময় তাঁহারা শ্রোত্রিয়, আর যাঁহারা এক প্রহরের সময় তাঁহারা গৌণকুলীন হইলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই, প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্যক্রিয়া করিতে অধিক সময় লাগে, সুতরাং যাঁহারা আড়াই প্রহরের সময় আসিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে নিত্যক্রিয়া করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা রাজা তাঁহাদিগকে সদাচার-পূত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, এজন্য তাঁহাদিগকে প্রধান মর্য্যাদা প্রদান করিলেন। দেড় প্রহরের সময় আগতেরা আচারাংশে ন্যূন ছিলেন, এজন্য তাঁহারা ন্যূন মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন; আর এক প্রহরের সময় আগতেরা আচার-ভ্রষ্ট বলিয়া অবধারিত হইলেন, এজন্য রাজা তাঁহাদিগকে হেয়জ্ঞান করিয়া অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত করিলেন। এইরূপে কৌলীন্যমর্য্যাদা ব্যবস্থাপিত হয়। তৎসঙ্গে সঙ্গে এই একটী নিয়ম হইল, কুলীন কুলীনের সহিত আদান প্রদান নির্ব্বাহ করিবেন; শ্রোত্রিয়ের কন্যাগ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্তু শ্রোত্রিয়কে কন্যাদান করিতে পারিবেন না, করিলে কুলভ্রষ্ট ও বংশজভাবাপন্ন হইবেন। (১২) আর

(১২) "শ্রোত্রিয়াস সুতাং দত্ত্বা কুলীনো বংশজো ভবেৎ।"

গৌণকুলীনের কন্যাগ্রহণ করিলে এককালে কুলক্ষয় হইবেক, এই নিমিত্ত গৌণকুলীনেরা অরি অর্থাৎ কুলের শত্রু বলিয়া প্রসিদ্ধ ও পরিগণিত হইলেন। (১৩)

"বল্লালসেন গুণ বিচার করিয়া কৌলীন্যমর্য্যাদা স্থাপন করার প্রমাণ পাওয়া যায়। সাধারণতঃ প্রবাদ এই যে, বল্লালসেন, কৌলীন্যমর্য্যাদা স্থাপনের দিনাবধারণ করিয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করেন, তদনুসারে ব্রাহ্মণেরাও রাজধানীতে উপস্থিত হন। যাঁহারা কৃতস্নান ও কৃতাহ্নিক হইয়া বল্লালের সভাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কুলীন, যাঁহারা প্রাতঃকৃত্য সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাধা করিয়া সভাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সিদ্ধ শ্রোত্রিয়। যাঁহারা কৌলীনমর্য্যাদা লাভের প্রত্যাশাতে অতি প্রত্যূষে সন্ধ্যাবন্দনাদি না করিয়াই বল্লালসেনের সভাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কষ্ট শ্রোত্রিয় হইয়াছিলেন। এই প্রবাদের প্রতি বিশ্বাস করা কঠিন। বল্লালসেন বুদ্ধিমান্ স্বাধীন রাজা ছিলেন, তাঁহার সভাতে বিদ্বান্ মন্ত্রী সকলও ছিল। তৎকর্তৃক এইরূপ অসার পরীক্ষা দ্বারা কুলীন-শ্রোত্রিয়-বিভাগকরণ সম্ভব নহে, আর ব্রাহ্মণেরাই কেন, এইরূপ ক্ষণিক ও অসার পরীক্ষাতে সম্মত হইবেন? যে কৌলীন্যপ্রথা পুরুষানুক্রমিক হইবে, তাহা এইরূপ অসার ও ক্ষণিক পরীক্ষাতে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে।" (১৪)

গ্রন্থকার মহাশয় যাহাকে অসার পরীক্ষা বলিতেছেন, তাহা অসার কি সারযুক্ত, একটু গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিলেই বোধগম্য হইতে পারে। তৎকালে ধর্ম্মচর্চ্চাই লোকের আদরণীয় ছিল। ধর্ম্মের পরীক্ষাই প্রধান পরীক্ষা বলিয়া বিবেচিত হইত। বল্লালসেন "স্বাধীন রাজা ছিলেন" বলার সার্থকতা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি ধারণা করিতে পারিল না। এখনকার মত তখন সকলেই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে শিক্ষা করেন নাই, এইটি স্মরণ করিলে গ্রন্থকর্ত্তা মহাশয় জানিতে পারিতেন, ব্রাহ্মণেরা রাজার প্রস্তাবে

---

(১৩) ঐ মতের বিরুদ্ধে গৌড়ে ব্রাহ্মণ প্রণেতা কহেন, সম্বন্ধনির্ণয়, ২২৪—২২৭ পৃষ্ঠা।

(১৪) গৌড়ে ব্রাহ্মণ ৮২ ও ৮৩ পৃষ্ঠা।

কেন সম্মত হইয়াছিলেন। যে সকল ব্রাহ্মণ দীঘ সভায় আগমন করেন, তাঁহারা যে ভ্রষ্টাচারী, তাহা রাজা, মন্ত্রী বা রাজসভাস্থ কেহ না কেহ, জ্ঞাত ছিলেন, ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

মহাদেব।

মহেশ্বরের একমাত্র পুত্র মহাদেব। কিতো চট্টোপাধ্যায়, উদ্ধব মুখোপাধ্যায়, উদ্ধবণ পূতিতুণ্ড, লৌলিক মুখোপাধ্যায় ও হলধর গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বৈবাহিক আদান প্রদান হয়। মহাদেবের ত্রিবিক্রম, পুরাই, দুর্ব্বলি তিন পুত্র জন্মে।

ত্রিবিক্রম, দুর্ব্বলি, পুরাই।

দুর্ব্বলি অগ্রজ, দুই ভ্রাতা অপেক্ষা প্রসিদ্ধ লোক। জনকের আদেশানুসারে হলধর গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যার পাণিপীড়ন করেন। আয়িত, সর্ব্বেশ্বর অবসথী, দাকর, গুণাকর ও শ্রীকর চট্টোপাধ্যায়ের, বিকর্ত্তন ও শিয়ো মুখোপাধ্যায় এবং আযু গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত তদীয় বিবাহ সংক্রান্ত আদান প্রদান চলিয়াছিল। তাঁহার ৫ পাঁচ সন্তান। যথা,—অনন্ত, সঙ্কেত, হরি, নারায়ণ ও ভাস্কর।

অনন্ত, সঙ্কেত, নারায়ণ ও ভাস্কর।

সঙ্কেত মহাশয় যার পর নাই আতিথেয় ছিলেন। তেকড়ি অবসথী, সর্ব্বেশ্বর অবসথী, আভো ও মনো চট্টোপাধ্যায়, জন কাঞ্জিলাল, পশু ঘোষাল, রাম পূতিতুণ্ডের সহিত তাঁহার বৈবাহিক আদান প্রদান হইয়াছিল।

তিনি বৃহৎবাঙ্গালপাশ গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার উর্দ্ধতন পুরুষেরা—"বন্দ্যঘটী" নামক স্থানেই বসতি করিতেন। তিনি কি কারণে পৈতৃক বাসভূমি পরিত্যাগ করেন, অদ্যাপি তাহার হেতু নির্ণীত হয় নাই। তাঁহার অগ্রজ অনন্ত, গয়ঘড় গ্রামে বসতি করিতেন, তৃতীয় ভ্রাতা হরি সাগরদিয়া, ৪র্থ নারায়ণ স্বল্পবাঙ্গালপাশ গ্রামে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। তাঁহারা প্রত্যেকে স্ব স্ব গ্রামানুসারে পরিচিত কুলীন। সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভাস্কর অকুলীন ছিলেন। তিনি পৈতৃক বসতি স্থলে অবস্থিতি করিতেন।

হরি, বিষ্ণুমিশ্র ধ্রুবানন্দ মিশ্র।

হরির ৪ চারি পুত্র। জ্যেষ্ঠ সন্তান উদয়নেরও ৭ সাত পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে প্রথম তনয় মাধবের বিষ্ণুমিশ্র নামে এক মাত্র সুত বিশেষ বিদ্বান। "মিশ্র" উপনামেই তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় রহিয়াছে। তাঁহার সাত সন্তানের মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ ধ্রুবানন্দ যারপর নাই ক্ষমতাবান্ বিদ্বান্ ও কবি। তিনিও পিতৃবৎ "মিশ্র' উপাধি-মণ্ডিত পণ্ডিত ব্যক্তি। উত্তর কালে তিনি কুলীনগণের দোষ গুণের ব্যাখ্যা করেন। দেবীবর তাঁহারই প্রদর্শিত পথে পদাঙ্ক নিক্ষেপ করিয়া যশস্বী ও স্বীয় সঙ্কল্পে কৃতকার্য্য হন। কেহ বা কহেন, দেবীবরের মতানুসারে ধ্রুবানন্দ 'মহাবংশাবলি" প্রস্তুত করেন।

উৎসাহ।

সঙ্কেতের ২ দুই পুত্র। উৎসাহ ও বৎস। উৎসাহের বিষয় লিখিত হইতেছে।

উৎসাহের ১০ দশ সন্তান। আনো, কনো, বিশু, রঘু, শ্রীরঙ্গ, মার্কণ্ডেয়, গুণ, ভীম, সারঙ্গ ও বাসু। জ্যেষ্ঠ সুত আনো, ৪র্থ রঘু, ৫ম শ্রীরঙ্গ, এই তিন জনের বংশ-বিবরণ পাওয়া যায়। 'আনো" সম্ভবতঃ "অনন্দ' বা অনন্ত নামের অপভ্রংশ। কনো, বিশু বোধ হয়, কানাই ও বিশ্বম্ভর শব্দের সংক্ষিপ্ত আকারে বিকৃত হইয়া থাকিবে। গুণ ও বাসু, নামার্দ্ধ। গুণানন্দ বা গুণমণি হইতে গুণ বাসুদেব হইতে "বাসু' হওয়া সঙ্গত। কাশ্যপ গোত্রে শ্রীহর্ষের দশম পুরুষ উৎসাহ চট্টোপাধ্যায় ও ইনি দুই ব্যক্তি স্বতন্ত্র।

সঙ্কেত পুত্র উৎসাহ ও বৎস উভয়েরই কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে যতটা পাওয়া যায়, তাহা ধরিয়া অগ্রে উৎসাহের বংশাবলী লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে। তাঁহার ২ পুত্র আনো ও রঘু।

সর্ব্বানন্দ ঘটক।

আনোর (আনন্দের) পুত্র লখাই। লখাই প্রকৃত নাম বলিয়া বোধ হয় না। বিশুদ্ধ নাম লক্ষ্মণ বা লক্ষ্মীনাথ হওয়া সম্ভব। তাঁহার একমাত্র তনয় সর্ব্বানন্দ ঘটক, অত্যন্ত মাননীয় পুরুষ। তৎ-সুত দেবীবর, পিতা অপেক্ষাও সুবিখ্যাত, সুতরাং সর্ব্বত্র সমাদৃত। এ স্থলে তাঁহার কীর্ত্তি কলাপ আদ্যোপান্ত বিবৃত হইল।

দেবীবর ঘটক ও যোগেশ্বর পণ্ডিত—পঞ্চদশ শতাব্দী।

শকাব্দের পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমে দেবীবর ভূমিষ্ঠ হন। তিনি পূর্ব্ব বাঙ্গালার অধিবাসী ছিলেন। যোগেশ্বর পণ্ডিত, তাঁহার মাস্তুতো ভাই। দেবীবর বংশজ ছিলেন। সর্ব্বানন্দ ঘটক মহাশয়ের সন্তানের প্রকৃত নাম কি, জানিবার উপায় নাই। "দেবীবর" শব্দের অর্থের প্রতি দৃষ্টি করিলেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে কামরূপের কামেশ্বরী দেবীর বর-প্রভাবে ক্ষমতা লাভ হয় বলিয়াই, উক্ত নাম প্রচলিত হয়। অনেকে মহারাজ বল্লালের স্কন্ধে যে যে দোষারোপ করেন, তাহা তাঁহার উপর প্রযুক্ত না হইয়া দেবীবরের প্রতি প্রয়োগ করাই উচিত। তিনিই সর্ব্বদ্বারী বিবাহ নিষেধ করেন। পশ্চাৎ তাঁহার যে বর্ণনা উদ্ধৃত হইতেছে, তদ্দৃষ্টে বিলক্ষণ জানা যাইবে। তিনি ক্রোধের বশীভূত হইয়াই কুলীনগণের মর্য্যাদার বিচার করেন। প্রাচীন ঘটকেরা দেবীবরের দোষ নির্দ্দেশ করিয়া বলেন,—

"এই কালে বাঢে বঙ্গ পড়ে গেল ধূম।
বড় বড় ঘর যত হইল নির্ধূম॥
কিছু পরে সঙ্কেতের * বংশে এক ছেলে।
নামে খ্যাত দেবীবর, লোকে যারে বলে॥
সেই ছোঁড়া মনে ক বে, কুলে করে ভাগ।
তদবধি কুলে আছে ছত্রিশের দাগ॥
দোষ দেখে কুল করে একি চমৎকার।
অজ্ঞান কুলীন পুত্র কুলে হয় সার॥"—[মেলমালা]

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

হৃদয়-সংগ্রাম।

১

কি ভীষণ চ'লেছে সংগ্রাম,
প্রিয়-জন সনে অবিরাম!
পূজ্য বৃদ্ধ পিতা মাতা, স্নেহের পুত্তলি ভ্রাতা,
সহোদরা—বালিকা সুঠাম,
তাহারাও জনে জনে মেতেছে বিভিন্ন রণে!
হা জীবন, হায় ধরাধাম।

---

* সঙ্কেত মহাশয়, দেবীবরের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ। ৩নং বংশতালিকা দেখ।

২

সখা সখী, আত্মীয় স্বজন,
তারাও যুঝিছে অনুক্ষণ।
প্রাণাধিক প্রাণেশ্বরী তারো সনে যুদ্ধ করি,
সে-ও শত্রু সেনা একজন।
শত তপস্যার ফল এই শিশু সুকোমল,
এ-ও এক যোদ্ধা-বিচক্ষণ!

৩

নর-জন্মে একি এ দুর্গতি,
একি রণ স্বজন-সংহতি।
একি অদৃষ্টের ফের কোথা শেষ এ রণের!
সন্ধিতে কাহারো নাহি মতি।
সবাই-সবারে চায় মিশাইতে আপনায়,
দিয়ে মায়া, দিয়ে স্তুতি নতি।

৪

হায় একি হৃদয়ের রণ
পরস্পরে করিতে আপন।
সবারি পৃথক গতি, অথচ সবারি মতি
ভাঙ্গিতে এ পার্থক্য-বন্ধন।
দেবে না থাকিতে দেহ, আপনে—সম্পূর্ণ কেহ
যাবে না-ও পথিক মতন।

৫

চলিবে—চলিবে অবিশ্রাম,
এ যে মহা মায়ার সংগ্রাম!
সবে যোঝে প্রাণ-পণে ; জয়ী হ'তে এই রণে,
পরাজয়ে—মরণ বিরাম!
পরস্পরে হাসি হাসি ক্ষেপে শ্বাস-অশ্রু-রাশি ;
ক্ষত হৃদি, তবু কি আরাম!

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

ক'নে বউ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বেলা আটটার সময় শ্যামকুমারের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তাহার পর প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিতেই নয়টা বাজিয়া গেল। এখন ও কিন্তু শ্যামকুমারের প্রাতঃকালীন মৌতাত্ শেষ হয় নাই, এমন সময় জননী শ্যামকুমারকে সংসারিক কার্য্যের জন্য ডাকিলেন। শ্যামকুমার তাড়াতাড়ি মৌতাত শেষ করিয়া জননীর আজ্ঞাপালনে প্রস্তুত হইল। আবশ্যকীয় যে সকল দ্রব্য আনিতে হইবে, তাহাও বুঝিয়া লইল, কিন্তু শ্যামকুমারের হাতেত পয়সা নাই। শ্যামকুমার যেখান হইতে যাহা কিছু পায়, সকলই মৌতাতে খরচ করিয়া ফেলে, যখন হাতে পয়সা না থাকে, তখন সমমৌতাতী কোন বন্ধুর শরণাগত হয়। শ্যামকুমার দেখিল, পয়সা না হইলে মৌতাত চলিতে পারে, কিন্তু সংসার এক দিনের জন্যও চলে না। অগত্যা জননী অনেক মুখনাড়া দিয়া নিজের পুঁজি ভাঙ্গিয়া চক্ষের জলের সহিত একটি সিকি বাহির করিয়া দিলেন। তখন শ্যামকুমার প্রফুল্ল মনে বাজারে চলিল।

শ্যামকুমার বাজারে প্রবেশ করিবামাত্র ঐ বাজারেরই একজন দোকানদার রামধন মদক শ্যামকে ডাকিয়া বলিল—"দাদা ঠাকুর, তামাক খেয়ে যাও গো।"

তখন শ্যামকুমারও প্রফুল্ল মনে তাহার দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইল। রামধন তাড়াতাড়ি একখানি আসন বসিতে দিল। তাহার পর ব্রাহ্মণের হুকায় একছিলিম তামাক সাজিয়া দিয়া বলিল— দাদা ঠাকুর, তামাক ইচ্ছে করুন।"

এই তামাকু খাইতে খাইতে নানা প্রকার গল্প চলিতে লাগিল, ক্রমে এক ছিলিম দুই ছিলিম করিয়া পাঁচ ছয় ছিলিম তামাকু পোড়ান হইল। শ্যামকুমারের আর বাজার করিবার কথা মনে নাই। গল্প তখন বেশ জমাট বাঁধিয়াছিল, দুই একজন করিয়া অনেক গুলি লোক ও সেইখানে জমা হইয়াছিল। যখন তাহাদের মধ্যে একজন স্নানাহারের কথা উত্থাপন করিল, তখন শ্যামকুমারের চমক্ ভাঙ্গিল, তিনি বাজার করিয়া লইয়া গেলে যে জননী

বন্ধন করিবেন, এতক্ষণের পর এইবার সে কথা শ্যামকুমারের মনে উদয় হইল। শ্যামকুমার তখন তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থান করিল।

শ্যামকুমার বাজার করিতে যাইবে, এমন সময় একটা ' বল হরি—হরিবোল" শব্দ চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। সকলের দৃষ্টি তখন রাস্তার দিকে আকৃষ্ট হইল। সকলে দেখিল—অতি কষ্টে তিন জনে একটি শব বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে, তাহাদের মুখ হইতেই সেই "বল হরি—হরিবোল' শব্দ নিনাদিত। শববাহকদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি শ্যামকুমারকে দেখিয়াই বলিল— বেশ লোক যা হ'ক তুমি, সৃষ্টি সংসার খুঁজে এলুম কোথাও দেখা পেলুম না। বাজারে কি কত্তে মত্তে এসেছ? আমরা তিনজনে এ মড়া কি আনতে পারি? শেষো, শিগ্‌গীর আয়।"

শ্যামকুমার অপ্রস্তুত হইয়া তাড়াতাড়ি শবের যেদিকে একজন মাত্র ছিল, সেই দিকে গিয়া কাঁধ দিল। অন্যান্য লোক সকলে অবাক্ হইয়া রহিল।

শ্যামকুমারের আর কোন কথাই মনে নাই, গৃহে জননী যে তাহার মুখ চাহিয়া বসিয়া আছেন, তিনি বাজার করিয়া লইয়া গেলে তবে যে হাঁড়ি চড়িবে—এ সকল কথা পর্য্যন্ত তাহার স্মরণ নাই! শ্যামকুমার সঙ্গীগণের সহিত যথাস্থানে শব আনিয়া উপস্থিত করিল। তাহার পর সেখানে আর কাহাকেও বড় কিছু করিতে হইল না, শ্যামকুমার একাকী সমস্ত কার্য্য শেষ করিল। শবদাহ শেষ করিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। তখন স্নানাদি কার্য্য শেষ করিয়া সকলে গৃহে চলিল। এই সময় শ্যামকুমারের বাজার করার কথা মনে হইল। তাহার জন্য যে সিকিটী জননী দিয়াছিলেন, তাহা পর্য্যন্ত শ্যামকুমার হারাইয়া ফেলিয়াছে! এখন শ্যামকুমারের মনে একটু ভয় হইল। যাহার শব দাহ করিতে আনা হইয়াছিল, সে একজন অনাথা বিধবা স্ত্রীলোক, তাহার আর কেহ নাই, সুতরাং অদ্য গৃহে গিয়াই তাহাকে আহার করিতে হইবে। শ্যামকুমার পথে নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। গৃহে আসিয়া দেখিল—জননীর কোন সাড়াশব্দ নাই, গৃহে আলো পর্য্যন্ত নাই। শ্যামকুমার ধীরে ধীরে ভীতিব্যঞ্জক স্বরে ডাকিল— "মা, মা, ওমা।"

কোন উত্তর নাই। আবার একটু উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল—"মা।' তখন অকস্মাৎ জননী গৃহমধ্য হইতেই তর্জ্জন গর্জ্জনের সহিত বলিয়া উঠিলেন—

"পোড়ার মুখো, এতক্ষণের পর তোমার ঘরে আসা হ'লো ? এই তোমার বাজার করা ! তুই মর্ মর্ মর্।"

জননীর এই আদর সম্ভাষণে শ্যামকুমারের দেহে প্রাণ আসিল। শ্যামকুমার মনে মনে বুঝিল, যখন জননী তাহাকে গালি দিয়াছেন, তখন এ ক্রোধাগ্নি শীঘ্রই নির্ব্বাণ হওয়া যাইবে। এই জন্য সাহস করিয়া বলিল—"মা ওপাড়ার কামিনী মাসি মরে গিয়েছে তাই তাকে পোড়াতে গিয়েছিলাম. গরিব ব'লে তার অসময়ে কেউ আসে না, তিন জনেই নিয়ে যাচ্ছিলো. বাজারে হরকালি দাদা আমায় দেখতে পেয়ে ডেকে নিয়ে গেলো। তা হাঁ মা, লোকের এমন বিপদের সময় কি চুপ করে থাকা যায় ?"

তখন জননী আরম্ভ করিলেন—"পোড়া লোকের জ্বালায় এ দেশে থাকা ভার, মড়া পোড়াবার আর লোক পায় না, আমার দুধের ছেলে—একে দিয়েই মড়া পোড়ান। আর তোর্ কি আক্কেল। বাজারটি করে দিয়ে না হয়, যে চুলোয় যেতে ইচ্ছা হয়, সেই চুলোয় যা। তা, নয়, শুন্‌লে মড়া পোড়াতে যেতে হবে—অমনি ছুট্‌লো। তুই কি মড়াইপোড়া বামুন, যে মড়া মরেছে শুন্‌লেই অমনি দৌড়িবি ! এতখানি বয়েস হলো, আজও ঘর সংসার কি করে কর্‌তে হয় জান্‌লি নে ? পোড়া লোকের মড়া মরে, কেবল আমায় জ্বালাতন কর্‌বার জন্য।"

গৃহিণী এইবার স্বভাবসুলভ কান্না আরম্ভ করিলেন। গৃহিণীর রাগ থামিলেই কান্না আসিত। কিছুক্ষণ কাঁদিয়া বলিলেন—"তোর খাওয়া দাওয়া হয়েছে ?" শ্যামকুমার বলিলেন—"না। এখন ও মুখে জল দিই নাই।" তখন পুনরায় গৃহিণীর রাগের চিহ্ন সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। রাগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণ ও কাঁদিয়া উঠিল। গৃহিণী একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন। তৎক্ষণাঃ চিৎকার করিয়া উঠিয়া বলিলেন—'লোকের আক্কেল্ দেখেছো ? আমার দুধের ছেলেকে দিয়ে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত মড়া পুড়িয়ে নিয়ে একটু জল ও খেতে দেয় নি।" শ্যামকুমার বলিল—"খেতে দেবে কে ? কামিনীদিদির আর কে আছে ?"

গৃহিণীর রাগ তৎক্ষণাৎ জল হইয়া গেল। মৃতা কামিনীর জন্য এখন অনেক শোক করিতে লাগিলেন, তাহার উদ্দেশেও দুই চারি ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিলেন। তাহার পর শ্যামের যে সমস্ত দিন আহার হয় নাই, সেই

কথা মনে হইল। তখন তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়া তিনি শ্যামকে বলিলেন—"বাবা, সেই সিকিটে দাও।"

শ্যামকুমারের মুখে আর কথা নাই। কি বলিবে কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। অনেক কষ্টে ভয়ে ভয়ে বলিল—"মা, আমি সেই সিকিটে নাইতে গিয়ে নদীতে হারিয়ে ফেলিছি।"

"বেশ করেছ বাবা! এখন শুকিয়ে থাক।" এই কথা বলিয়া গৃহিণী পুনরায় কান্না আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কান্না থামিয়া বলিলেন "তোর জ্বালায় আমার হাড় মাস জ্বলে গেল, তুই কি এমনি করে সংসার করবি ?"

শ্যামকুমার তখন একটু করুণস্বরে বলিল—"খিদে পেয়েছে মা, এখন কিছু খেতে দিয়ে যত পার বক।"

হাজার হউক মার প্রাণ—গৃহিণীর ক্রোধ অমনি জল হইয়া গেল। গৃহিণী তাড়াতাড়ি দুটি মুড়ি আনিয়া বলিল—"এখন আর আমি কোথায় কি পাব, এই দুটি মুড়ি আছে, খাও।"

শ্যামকুমার মহা আনন্দের সহিত মুড়ি চর্ব্বণে নিযুক্ত হইল। নিকটে জননী পা ছড়াইয়া বসিয়া পুনরায় নাকি সুরে আরম্ভ করিলেন "আহা। বাছা আমার সমস্ত দিন উপোস করে রইলো গা। দুটো ভাত ও আজ জুটলো না ? আমার মুখে আগুণ, আমি বাছাকে কত গালই দিয়েছি। হে মা মঙ্গলচণ্ডি। আমার বাছার মঙ্গল করো। হে মা কালিঘাটের কালি। আমি বুক চিরে তোমায় রক্ত দেবো মা, আমার গাল যেন আশীর্ব্বাদ হয়। আমার ছেলে দুটি, বউ দুটি আর নাতি ছটি রেখে আমি যেন শীগ্‌গীর মরি। কেন বাছাকে আমার গাল দিলুম।"

গৃহিণীর কান্নার সুর ক্রমে সপ্তমে উঠিতে লাগিল। শ্যামকুমার জলযোগ করিয়া একটু সুস্থির হইয়া বলিল—"মা, তুমি কেন কাঁদ্‌চ, তোমার গাল সেত আমার পক্ষে আশীর্ব্বাদ, তার জন্য এত ভাবচ কেন ?"

"না বাবা, আমি আর কখন তোমায় গাল দেবো না, তোমার কল্যাণে আমি ঠাকুরের পুজো দেবো।" বলিয়া জননী তাড়াতাড়ি পুনরায় গৃহের মধ্যে গেলেন, এবং বহু কালের একটি সন্দেশ তোলা ছিল আনিয়া শ্যামকুমারকে জল খাইতে দিলেন। তাহাতেই শ্যামকুমারের মহা আনন্দ, এই জলযোগের

পর দৈনিক মৌতাত শেষ করিয়া প্রফুল্ল মনে শয়ন করিল, এবং অচিরাৎ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল। কিন্তু জননী সে রাত্রি নিদ্রা যাইতে পারিলেন না, তাঁহার শ্যাম আজ অনাহারী এই চিন্তায় তিনি সমস্ত রাত্রি বিছানায় শুইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পর দিন অতি প্রত্যূষে গৃহিণী উঠিয়া তাড়াতাড়ি গৃহকার্য্য শেষ করিল। তাহার পর পুনরায় আপনার পুঁজি হইতে কিছু বাহির করিয়া আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য একজন প্রতিবাসীর উপর ভার দিল। সেই দিন হইতে শ্যামকুমারের উপর সাংসারিক কোন কার্য্যের ভার আর অর্পণ করা হইল না। এই পরিবার দরিদ্র হইলেও ইহারা ব্রাহ্মণবংশীয়, সুতরাং শূদ্র-জাতির পূজনীয়। সেই কারণ বেতনভোগী না হইলেও গৃহিণী যাহাকে যে কর্ম্ম করিতে বলিতেন, সে ব্রাহ্মণ কন্যার অনুরোধ আহ্লাদের সহিত রক্ষা করিত। সহরের লোকে এ কথায় আশ্চর্য্য বোধ করিতে পারেন, কিন্তু আমরা জানি, পল্লীগ্রামে এখনও এরীতি আছে, ব্রাহ্মণের এ সম্মান আরো কতদিন যে থাকিবে, তাহা বলিতে পারি না। হে ব্রাহ্মণ! তুমি কি তোমার এ সম্মান বজায় রাখিবে না?

বেলা দশটার সময় গৃহিণী অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া শ্যামকে আহার করিতে ডাকিলেন। শ্যামকুমার পরিতোষের সহিত আহার করিলেন বটে, কিন্তু অদ্য আহার করিতে বসিতে তাঁহার মনে একটু লজ্জা হইয়াছিল। আহারান্তে শ্যামকুমার বাহিরে চলিয়া গেলেন। গৃহিণী নিজের অন্ন ব্যঞ্জন লইয়া আহার করিতে বসিবেন, এমন সময় গণেশের মা ধীরে ধীরে আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া বলিল—"বলি হাঁ রামের মা, কথাটা কি সত্যি?"

রামের মার মুখ শুকাইয়া গেল, তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"কি কথা দিদি?"

গণেশের মা পুনরায় বলিল—"বড় বউমা নাকি এখানকার সব কথা পেরকাশ করে দিয়েছে?"

গৃহিণী একটু রাগান্বিত হইয়া বলিলেন "তা দিয়ে থাকে দিয়েছে, বড়

বউয়ের বাবা বড় মানুষ' বলেত আর আমার মাথাটা কেটে ফেলতে পারবে না?"

গণেশজননী বলিলেন—"তার সাধ্য কি? তুই ব্যাটার মা। তবে নাকি শুনছি—সত্যি মিথ্যে ভগবান জানেন—তোমার বড় বউকে আর তারা পাঠাবে না।"

রামকুমার জননী এবারও সেই স্বরে উত্তর করিলেন—"না পাঠায় আমি ফের ব্যাটার বিয়ে দেবো—আমার কুলীনের ছেলে।"

গণেশ জননী যে উদ্দেশে আসিয়াছিলেন, তাহার কোন সুবিধা না দেখিয়া মনে মনে কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেন। হায়। হায়! এত বড় একটা ঘটনা চুপি চুপি চলিয়া যাইবে, ইহা লইয়া একটা হুলস্থূল না বাধাইলে কি ভাল দেখায়। পুনরায় একবার চেষ্টা করিবার উদ্দেশে বলিলেন—'বলি, তোমার বউয়ের কি আক্কেল।"

রামকুমার জননী বলিলেন—"বউয়ের আক্কেল্ আমি অনেক দিন থেকেই জানি; সেত আর নূতন কথা কিছু নয়?"

হরি! হরি। গণেশজননীর এ কথাটা ও ভাসিয়া গেল। তখন আর কি করিবেন ক্ষুণ্ণ মনে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। তিনি প্রস্থান করিতে না করিতেই নিস্তারিণী ঠাকুরঝির শুভাগমন হইল। এবারেও রামকুমার জননীর আহারের বাধা পড়িল। ঠাকুরঝি একটু ব্যস্তভাবে বলিল—"বলি হাঁ বউ! তুমি নাকি বড় বউকে তাড়িয়ে দিয়েছ?"

রামকুমার জননী রাগিয়া বলিলেন—"কে তোকে এ কথা বল্লে লা?"

নিস্তারিণী ঠাকুরাণী তখন সুবিধা বুঝিয়া আরো একটু উচ্চ স্বরে বলিলেন—"কে আবার বলবে? গ্রামে যে ঢি ঢি হয়ে গেছে। এ কথা কি আবার ছাপা থাকে?"

রাম কুমার জননী এবার একটু নরম স্বরে বলিলেন—"তা দিদি আমার বউকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি, এতে গ্রামের লোকের এত মাথা ব্যথা কেন?"

ঐ যা। একি হইল! ঠাকুরঝিও বড় আশায় নৈরাশ হইল! ঠাকুরঝি এত নরম সুর গরম করিবার উপায় কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া "তাই বল্ছি—তাই বল্ছি" বলিতে বলিতে পাটি পাটি করিয়া সেখান হইতে

প্রস্থান করিলেন। গৃহিণী এই সুযোগে আহার করিতে বসিলেন। সবে মাত্র তিন চারি গ্রাস আহার করিয়াছেন, এমন সময় পশ্চিম পাড়ার রামমণি আসিয়া তাড়াতাড়ি উপস্থিত হইল। রামমণি একজন প্রসিদ্ধ কুঁদুলী, গ্রামশুদ্ধ লোকে তাহার গলার অথবা গালের ভয় করিত। রামমণি আসিয়াই আরম্ভ করিল—"ওমা! কি ঘেণ্যা, লজ্জায় বাঁচিনি। তুই নাকি বড় বউ আর ব্যাটাকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিস্?"

রামকুমার জননীর এইবার বড় রাগ হইল। এরূপ অন্যায় কথায় কার না রাগ হয়? তিনি রাগিয়া বলিলেন—"কোন্ ভালখাগি একথা বলে লা?"

তখন ধূলাপায়েই রামমণির অভিষ্ট সিদ্ধ হইল। আর তাহাকে পায় কে? রামমণি একবারে সপ্তমে উঠিয়া বলিল—"আমায় তুই ভাল খাগি বললি? আমি ভাল খাগি, না তুই ভাল খাগি। তুই ভাতার মাথা খা—তুই জোড়া ব্যাটার মাথা খা, ইত্যাদি ইত্যাদি।"

রামকুমার জননীও রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে মুখের গ্রাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখন উভয়ের মধ্যে এক অপূর্ব্ব ভাষায় অপূর্ব্ব ভঙ্গিমায় কায়দাদুরস্ত মতে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। হে কোন্দলেসর্ব্ব-জয়কারিণি—মুহূর্ত্তেপৃথিবীরসাতলদায়িনি বঙ্গীয়প্রৌঢ়াগণ। তোমাদের সে অপূর্ব্ব ভাষা ও ভঙ্গিমা বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। সুতরাং দূর হইতে নমস্কার করিয়াই আমি সে বর্ণনায় ক্ষান্ত হইলাম।

সংগ্রামের শেষ ফল হইল—রামকুমার জননীর সম্পূর্ণ পরাজয়। রামমণির মুখের তোড়ে কে দাঁড়াইতে পারে? রামমণি রণে জয়ী হইয়া চিৎকারে দিগদিগন্তর কম্পিত করিতে করিতে চলিয়া গেল। রামকুমার জননী ও এইবার সদর খিড়কী বন্ধ করিয়া দিয়া গায়ের জ্বালায় আছাড় খাইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন আরম্ভ করিল। গদার মা অতি গোপনে গোপনে যে অগ্নি চারিদিকে ধরাইয়া দিয়াছিল, তাহা এতক্ষণে জ্বলিয়া উঠিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রূপপুর একখানি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। গ্রামে মিউনিসিপালিটী, পুলিষ ষ্টেশন, দাতব্যচিকিৎসালয়, স্কুল প্রভৃতি সমস্তই আছে। গ্রামখানি ক্ষুদ্র নহে —দৈর্ঘে প্রায় দেড় ক্রোশ, আর প্রস্থেও প্রায় অর্দ্ধক্রোশ হইবে। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, সৎগোপ, জেলে, কৈবর্ত্ত, নাপিত, ধোবা, হাড়ি, কেওরা প্রভৃতি সকল জাতিই শ্রেণীবদ্ধ হইয়া এই গ্রামে বাস করিতেছে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণও কায়স্থের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। গ্রামে ঘর কতক মুসলমানেরও বাস আছে, কিন্তু সে গ্রামের এক প্রান্তভাগে। গ্রামখানি উত্তর দক্ষিণে লম্বা, হাট, বাজার, দোকান পসার দেখিলেই বোধ হইবে যে ইহা একখানি সামান্য পল্লীগ্রাম নহে। গ্রামবাসীলোকে যে সভ্যপদবাচ্য তাহার আরও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রামে দুই তিন খানি ইংরাজী বাঙ্গালা মদের দোকান আর একটা কুপল্লী পর্য্যন্ত আছে।

এই গ্রামের নব কুমার চক্রবর্ত্তী একজন সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি। ইনি পূর্ব্বে একজন কমিসরিএটের গোমস্তা ছিলেন, বিগত আফগান যুদ্ধে বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। এখন সে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গৃহে বসিয়া যোগাভ্যাসে মনোযোগী হইয়াছেন। ইহার প্রথম এক কন্যা জন্মে। কন্যার নাম রাখেন মোহিনী, মোহিনী বালবিধবা—পিতার সংসারের সর্ব্বময়ী গৃহিণী। তাহার পর রমণীমোহন ও রসিক মোহন নামে দুই পুত্র জন্মে। আজ তিন বৎসর হইল রমণীমোহনের মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার বিধবা পত্নী তারাসুন্দরী নাবালক পুত্রটিকে লইয়া পিত্রালয়েই বাস করেন। রসিক মোহনের প্রথম সহধর্ম্মিণীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, পত্নির নাম শরৎকুমারী। নবকুমারের শেষ সন্ততি একটি কন্যা, কন্যার নাম যামিনী, এই যামিনীর সহিত কাপড়পুর গ্রামের রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয়। ইনি আমাদের সেই বড় বধূ ঠাকুরাণী। তাহার পর আর কোন সন্তান সন্ততি হয় নাই, আজ সাত আট বৎসর হইল, নবকুমারের গৃহিণীরও মৃত্যু হইয়াছে, তিনি পুত্র কন্যার মুখ চাহিয়া অন্য দারপরিগ্রহ করেন নাই।

নবকুমারের বয়স এখন প্রায় ষাট বৎসর হইবে, কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে এত বয়স অনুমান হয় না। গ্রামে তাঁহার মান সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি বিলক্ষণ আছে। এখন তিনি বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একজন পরম যোগী হইয়া বসিয়াছেন। তন্ত্র, মন্ত্র তাঁহার অনেক জানা আছে, এমন কি অষ্টাঙ্গযোগ তাঁহার অভ্যস্ত। যখন পশ্চিমে কর্ম্ম করিতেন, তখন একজন পরম যোগী সাধুর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়, তাঁহারই নিকট তিনি দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া এই সকল যোগাভ্যাস আরম্ভ করেন। গুরু দেবের প্রতি তাঁহার ভক্তি অচলা, মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে গুরুর কৃপায় তাঁহার সকলই হইয়াছে। এখনও সেই গুরু মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়া থাকেন। নবকুমারের মুখে সর্ব্বদাই "গুরু আছেন—চিন্তা কি" "গুরুর কৃপায় সকলই হইতে পারে" ইত্যাদি শুনিতে পাওয়া যায়। নবকুমার এখন বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যোগসাধনে মনোনিবেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে দাওয়ানি ও ফৌজদারি মকদ্দমা সকল তাঁহার যোগের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে আমরা দেখিয়াছি। আর যাঁহাদিগের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না, তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে একজন সাধু পুরুষ বলিয়া জানিতেন, কিন্তু যাঁহারা কোন রকমে তাঁহার সম্পর্কে একবার আসিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে গোপনে নানা কথা আন্দোলন করিতেন। এরূপ জনরব যে গ্রামের প্রান্তভাগে তাঁহার এক ভৈরবী আছে, কিন্তু তিনি কেবল অন্ধকাররাত্রে অতি গোপনে তাঁহাকে দর্শন দিতেন। তাঁহার বাহ্যিক আকৃতি দেখিলে অনেকেরই ভক্তির উদ্রেক হইত, কারণ দেহ স্থূলাকার, বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়, পরিধানে গৈরিক বসন, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, আবার এই সকল ব্যতিত তিনি একজন প্রসিদ্ধ ধনবান। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে সোণায় সোহাগা বা মণিকাঞ্চনযোগ হইয়াছিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে গ্রামে বসিয়া অনেকগুলি শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় আর আমাদের প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে না।

পিতার এইরূপ ধর্ম্মাচরণে কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র রমণীমোহন বড়ই বিরক্ত হইতেন, ইহার জন্য সর্ব্বদাই পিতা পুত্রে কলহ হইত। নবকুমার রমণীমোহনের উপর ও বিশেষ বিরক্ত ছিলেন, কিন্তু রমণীমোহন কণ্ট্রাক্টারের কর্ম্ম করিয়া বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জ্জন করিতেন, সেই কারণ তিনি উপায়ক্ষম উপযুক্ত

পুত্রকে কোনরূপ শাসন করিতে সাহসী হইতেন না। শেষে রমণীমোহনের মৃত্যুতে তিনি নিষ্কণ্টক হইলেন, সে সময় পুত্রবিয়োগজনিত কোনরূপ বৈলক্ষণ্য তাঁহাতে লক্ষিত হয় নাই। তাহার এই অমানুষিক ব্যবহারে যাহারা ভিতরের সংবাদ জানিত, তাহারা তাঁহাকে মনে মনে গালি দিয়াছিল, আর যাহারা সে সংবাদ রাখিত না, তাহারা তাঁহাকে একজন মায়ামোহবিবর্জ্জিত সাধুপুরুষ বলিয়া শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিল।

কনিষ্ঠ পুত্র রসিকমোহন আজন্মকাল হইতেই পিতার নিতান্ত প্রিয় ছিলেন। জ্যেষ্ঠের মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার কণ্ট্রাক্টারের ব্যবসা চালাইতে আরম্ভ করিলেন। রসিকমোহন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সুশিক্ষিত যুবা, ইতিপূর্ব্বেই বি, এ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, এবং আইন পরীক্ষার জন্যও প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু রমণীমোহনের মৃত্যুর পর পিতার অনুমতিক্রমে সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া এই লাভজনক ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইলেন। রমণীমোহনের মৃত্যুর পর নবকুমার দুইটি কার্য্য করেন। তাঁহার প্রথম কার্য্য রমণীমোহনের ব্যবসা রসিকমোহনের নামে পরিবর্ত্তন করা, আর তাঁহার দ্বিতীয় কার্য্য বড় পুত্রবধূ তারাসুন্দরীকে পিত্রালয়ে প্রেরণ করা, তিনি সেই পর্য্যন্ত তারাসুন্দরী কিম্বা তাহার নাবালক পুত্রের আর কোন সংবাদ লইতেন না।

রসিকমোহন গোপনে যাহা করুন না কেন, প্রকাশ্যে সম্পূর্ণ পিতার মতানুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন। তিনি একজন ইয়ংবেঙ্গল প্রকৃতির লোক, কোন ধর্ম্মেই তাঁহার বিশ্বাস ছিল না, অথচ আপনাকে ধার্ম্মিক মনে করিতেন, আর অনেকগুলি হিন্দু আচার ব্যবহারও তিনি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। কিন্তু পিতার সম্মুখে কোনরূপ স্বাধীনমত প্রকাশ না করিয়া তাঁহার মতেরই সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেন। এই সকল কারণেই রসিকমোহন পিতার বড়ই প্রিয়পাত্র ছিলেন।

এখন এইস্থানে নবকুমারের জ্যেষ্ঠা কন্যা মোহিনীর কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বোধ হইতেছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মোহিনী বাল-বিধবা। সেই কারণ মোহিনীও পিতার বড়ই আদরের কন্যা। সে আদরের মাত্রা এতদূর উঠিয়াছিল যে মোহিনীর দর্পে পৃথিবী কম্পবান হইত এবং মোহিনীর গর্ব্বে পৃথিবী রসাতলে যাইত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মোহিনীচরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব মোহিনী কাহারো ভাল দেখিতে পারিত না। মোহিনী বাল-

বিধবা বলিয়া সে মনে মনে ঠাকুর দেবতার নিকট প্রার্থনা করিত যেন অচিরাৎ পৃথিবীর সমস্ত স্ত্রীলোক বিধবা হয়। কাহার বৈধব্যসংবাদ পাইলে মোহিনী বড়ই আহ্লাদিত হইত। যদি কেহ মূর্ত্তিমান্ হিংসা, দ্বেষ, দর্প, অহঙ্কার এবং অভিমান দেখিতে ইচ্ছা করেন, আমরা তাঁহাকে কেবল মোহিনীকে দেখাইব, তাহা হইলেই তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইবে।

আর নবকুমারের কনিষ্ঠা কন্যা যামিনীর নূতন পরিচয় আমরা কি দিব? তবে একটা কথা আমরা এইখানে বলিয়া রাখি যে যামিনী কামিনীরই কনিষ্ঠা ভগিনী, সুতরাং রূপে গুণে সকল বিষয়েই যামিনী কামিনীর কনিষ্ঠা।

আর এককথা আমরা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি সকল গ্রামের একটি মাত্র নাম থাকে, কিন্তু নবকুমারের যে গ্রামে বাস তাহার দুই নাম। প্রথম নাম রূপপুর, দ্বিতীয় নাম বসন্তপুর।

নবম পরিচ্ছেদ।

রামকুমার সেই দিন বৈকালে আসিয়া শ্বশুরালয়ে পৌঁছিলেন। বাটীর সম্মুখেই শ্বশুরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। শ্বশুর মহাশয় বিশেষ আদর অভ্যর্থনা কিছুই করিলেন না, রামকুমার তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, তিনি মাত্র কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া গেলেন। রামকুমার বৈঠক-খানায় গিয়া বসিলেন, একজন চাকর আসিয়া এক ছিলিম তামাক দিয়া গেল, তিনি তামাক খাইতেছেন, এমন সময় রসিক বাবু বৈকালিক বায়ু সেবনে বাহির হইতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন "আরে কেও রামকুমার বাবু যে, কি মনে করে?"

রামকুমার উত্তর করিলেন—"একবার আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি।"

রসিক। এত অনুগ্রহ! ভাল—ভাল। এখন আসল কথাটি কি বল দেখি।

রাম। তোমার ভগিনী রাগ করে এসেছে, তা'কে নিয়ে যেতে এসেছি।

রসিক। নিয়ে গিয়ে কি মেরে ফ্যালবার মতলব না কি?"

রাম। মেরে ফ্যাল্‌বার মতলব কি রকম?

রসিক। গলাটিপে না হউক, না খেতে দিয়ে শুকিয়ে মারা!

রামকুমার একটু রাগিয়া উঠিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে রাগ চাপিয়া রাখিয়া বলিলেন—"আমরা গরিব বলেই এ কথা বল্‌তে সাহস কর্‌লেন।'

রসিক। গরিব হলেই এরূপ ব্যবহার হয় না। তোমরা পেটে খেতে দেবে না, তার উপর বাক্য যন্ত্রণা দেবে, এতে মানুষ টিক্‌বে কেমন করে? বেশী অত্যাচার না হলে সেখান থেকে পালিয়ে আস্‌বে কেন?

রাম। আপনার ভগিনীকে আপ্‌নি যেরূপ মনে করেন, তারো স্বভাব সেরূপ নয়।

রসি। তার স্বভাব মন্দ বলে যদি তোমরা তাড়িয়ে দিয়ে থাক, ভগিনী প্রতিপালন কর্‌বার ক্ষমতা আমার আছে। তাকে আবার তবে তোমাদের নিয়ে যাবার দরকার কি? তুমি এসেছ তোমাকেও প্রতিপালন কর্‌তে আমরা রাজী আছি।

রাম। আমি সে প্রত্যাশায় আসিনি।

রসিক। আচ্ছা, সে সকল কথা পরে হবে, এখন আমি একবার বেড়িয়ে আসি।

এই বলিয়া রসিক বাবু বাহিরে চলিয়া গেলেন, রামকুমার বিষণ্নমনে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার দুই পুত্র নগেন্দ্র ও খগেন্দ্র আসিয়া মহাহ্লাদে একজন তাঁহার ক্রোড়ে আর একজন কাঁধে উঠিয়া বসিল। পুত্রদ্বয়ের মুখ দেখিয়া রামকুমার সমস্ত অপমান ভুলিয়া গেলেন, তাঁহার মন প্রফুল্ল হইল, হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। এই সময় একজন পরিচারিকা আসিয়া তাঁহাকে অন্দরে যাইতে বলিল। রামকুমার অন্দরে প্রবেশ করিলেন, পুত্রদ্বয় ও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আহারাদি শেষ করিয়া সন্ধ্যার সময় তিনি স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

সেই গৃহে তাঁহার কামিনী ঠাকুরঝিও ছিল, রামকুমার গৃহে প্রবেশ করিলেই কামিনী আরম্ভ করিল—"বলি ও মুখুয্যে মহাশয়, তোমার আর দুদিন দেরি সইলো না? সঙ্গে সঙ্গেই এসে উপস্থিত হলে! দেখ, এই দাঁত থাক্‌তে দাঁতের মর্য্যাদা কেউ বুঝ্‌তে পারে না। এখন কি মনে করে এসেছ, তা বল।"

রাম। যামিনীকে নিয়ে যেতে এসেছি।

কামিনী তখন যামিনীর প্রতি ঈষৎ বঙ্কিমকটাক্ষ করিয়া বলিল—"কি লো, কি বলিস্? তোর পিঠের বেদনা এখন আরাম হয়েছে কি?"

যামিনী তৎক্ষণাৎ মুখ ঘুরাইয়া নাক্ সিট্কাইয়া বলিল—"বল্‌বো আবার কি? নিয়ে যাবার কথা বল্‌তে লজ্জা করে না? কোন্ মুখ নিয়ে এখানে এলো আমি তাই ভাব্‌ছি।"

রামকুমার রাগিয়া বলিলেন—"তোমার মতন বজ্জাৎ স্ত্রীলোক আমি কখনও দেখিনি।"

যামিনী ব্যঙ্গস্বরে বলিল—"ও গো, তুমি লক্ষ্মী, তোমার মা লক্ষ্মী, তোমরা সকলই লক্ষ্মী, আর আমি বজ্জাৎ, আমরা সাতগুষ্টি বজ্জাৎ। তবে লক্ষ্মী বজ্জাতের কাছে কালামুখ নিয়ে আসে কেন?"

তাহার পর কামিনীর প্রতি চাহিয়া আরক্তমুখ গম্ভীর করিয়া বলিল—"দিদি, তোমাদের জামাই এসেছে, তোমরা নিয়ে আমোদ কর গিয়ে। আমার সুমুখে খবরদার যেন আসে না।"

কামিনী তখন হাত মুখ নাড়িয়া আরম্ভ করিল—"আমিত দেখে শুনে ভাই, অবাক্ হয়েছি। স্ত্রী রাগ করে এসেছে, কোথায় দুটো মিষ্টি কথা বলে ভুলোবে, না এসেই ঝগড়া আরম্ভ হলো। মুখুয্যে কি নেশাটেশা করে, এসেছ না কি?"

রামকুমার একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"হাঁ, নেশা করেই এসেছি, এরূপ অবস্থায় আসা অকর্ত্তব্য ছিল। আমি এখনি যাচ্ছি।"

রামকুমার অমনি গাত্রোত্থান করিলেন, তখন যামিনী একটু করুণস্বরে বলিল—"শুন্‌লি দিদি শুন্‌লি—তোরা যে বলিস্ ভালবাসে—তা ভালবাসাটা একবার দেখ্‌লি!"

দিদি কাজে কাজেই রামকুমারের হাত ধরিয়া বলিল—"ছি মুখুয্যে, রাগ কর্‌তে আছে, এখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে, এসময় কোথায় যাবে বলো? আজ্‌কের রাতটা থাকো, কাল সকালে তখন যেও।"

দিদির এরূপ আত্মীয়তায় ভগিনীর প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল বটে, কিন্তু স্বামীকে তৎক্ষণাৎ বসিতে দেখিয়া সে ব্যথার পরিচয় তখন আর কিছুই দিল না, কেবল দিদিকে মনে মনে গালি দিয়া ভাবিল—"আজকের রাতত থাকুক, তার পর কাল সকালে কিরূপে যায়, তখন দেখা যাবে।"

এই সময় এক অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যসম্পন্না চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা রূপের ছটায় ও বৈদ্যুতিক হাসির ঘটায় চারিদিক প্লাবিত করিয়া দ্রুতপদে রামকুমারের পার্শ্বে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"দাদা—দাদা—আমাদের—বাড়ীর সকলে ভাল আছেত?"

বালিকার মধুমাথা কথা কয়েকটী শেষ হইতে না হইতেই কামিনী তর্জ্জনগর্জ্জন করিতে করিতে অতি ভীষণ কর্কশস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল—"আ ম'লো যা, আহ্লাদে আটখানা হয়ে একবারে নন্দাইয়ের গায়ে ঢলে পড়া হলো যে! যে বাপমা সাত জন্মে খোঁজ নেয়না, তারা আবার কেমন আছে, জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে! আমি হলে অমন বাপ মার মুখে নুড়ো জেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকি। বউমানুষের কতদূর আস্পর্দ্ধা দেখ!"

বালিকা শরবিদ্ধকুরঙ্গিণীর ন্যায় ভয়বিহ্বলচিত্তে একবার এদিক ওদিক চাহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে ধীরে সেই গৃহের মেজের উপর বসিয়া পড়িল। তাহার ননদিনীরূপিনী যম যে তখন সেই গৃহে ছিল, বালিকা তাহা জানিত না। প্রজ্বলিত অগ্নিতে জল সেচন করিলে অগ্নি যেরূপ নিস্তেজ হইয়া পড়ে, বালিকাও সেইরূপ নিস্তেজ হইয়া বসিয়া পড়িল। বসিয়াই হেঁট মস্তকে নীরব—নিথর—নিস্পন্দ। রামকুমারও—অবাক্। এতক্ষণ তাঁহারও মুখে কথা নাই। অকস্মাৎ সম্মুখে বজ্রাঘাৎ হইলে লোকে যেরূপ অবাক্ হয়, রামকুমার সেইরূপ অবাক্! কিছুক্ষণ পরে তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন—"হঁা শরৎ, তোমাদের বাড়ীর সকলে ভাল আছেন।" কিন্তু সে কথা শরৎকুমারীর কর্ণে গিয়া তখন পৌছিল কি না, তাহা আমরা জানি না, কারণ তখন শরৎ মৃত্যুবৎ। বালিকা অন্য কেহ নহে, রামকুমারের জ্ঞাতি কন্যা, আর রসিকবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—শরৎকুমারী।

পুনরায় কামিনী আরম্ভ করিল—'ছি! ছি! ছি। আজ দু বৎসর এসেছে গা, তা এর মধ্যে একবার তত্ত্ব বল্লে না? অমন কালামুখো বাপের আবার খোঁজ নিতে আছে। হঁা এক জানতুম, সব মরে গেছে, তিনকুলে কেউ নেই, তা হলে বুঝতে পারতুম।"

এই সময় বাহিরে কাহার জুতার শব্দ হইল, যামিনী বলিল—"যা ছোট বউ—উঠে যা, দাদা এসেছেন তাঁকে খাবার দাবার দিগে যা।" বালিকা ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল, অমনি পুনরায় বজ্রাঘাৎ! কম্পিত কলেবরে বালিকা

শুনিল—বজ্রগম্ভীরস্বরে কামিনী বলিতেছে—"তোমার আর খাবার দিতে যেতে হবে না। ভাতারের কাছে যেতে বলেছে কি না, তাই আর দেরী সয় না। শোন্ বেহায়া শোন্, তুই নীচে গিয়ে অন্য কাজ দেখ্ গে। সকলে খেয়ে দেয়ে না শুলে, যদি ওপরে উঠ্‌বি, তবে মুড়ি খ্যাঙ্গরা তোর পিঠে ভাঙ্‌বো।"

বালিকা নীরবে ধীরে ধীরে নিচে নামিয়া গেল, যাইবার সময় একটী দীর্ঘনিশ্বাস সাবধানে ধীরে ধীরে ফেলিল, আর দুই বিন্দু অশ্রুজল অতি ভয়ে ভয়ে গোপনে মুছিয়া নিল। অল্পক্ষণ পরে অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর কামিনী যাইবার সময় যামিনীকে বলিল—"ও যামিনি, কেন দুজনে সমস্ত রাত ঝগড়া করে মর্‌বি? আয় তুই—আমার কাছে শুবি আয়, আর মুখ্‌য্যে এই ঘরেই থাক্।"

যামিনী মুখ ঘুরাইয়া "তোমার আর গিন্নোপোনায় কাজ নেই" এই কথা কয়েকটি বলিয়াই কামিনীকে ঠেলিয়া দিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। দরজা বন্ধের পর পশ্চাতে ফিরিয়া দেখে।তখন ও রামকুমার গালে হাত দিয়া কি ভাবিতেছে। যামিনী তখন গাল হইতে হাত সরাইয়া দিয়া বলিল—"ভাব্‌ছ কি?"

রাম। এই ভাব্‌ছি, যে তোমার ভগিনীর মতন আমার যদি একজন ভগিনী থাক্‌তো, তাহলে বড়ই ভাল হতো।

যামি। কি ভাল হতো?

রাম। তোমার সকল গর্ব্ব খর্ব্ব হতো।

যামিনী এ বিদ্রূপের অর্থ বুঝিল কি না জানি না, কিন্তু সে তখন অন্য উপায়ে স্বামীর মনোহরণ করিয়া বসিল। এইরূপে দম্পতির কলহ 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া' হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

কামিনী সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া তাড়াতাড়ি রসিক বাবুর গৃহে প্রবেশ করিল; এবং ভ্রাতার আহারাদির উদ্যোগ করিয়া দিল। রসিকমোহন

বলিল—"দিদি, তুমি খাবার এনে দিলে ? আমায় খাবার এনে দেবার কি আর কেউ নেই ?"

রসিকবাবুর বড় ইচ্ছা তাঁহার বড় সাধের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী নিকটে বসিয়া তাঁহাকে খাওয়ায়। কিন্তু কামিনী সে কথার উত্তরে বলিল—"আর কে এনে দেবে, তুমি যাকে বে করেছ ভাই, সে কি মানুষ ? সে একটি জন্তু। কেবল আমার হাড়মাস জ্বালাতন কর্ছে বইতো নয়।"

রসিকমোহন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিষণ্নমনে আহার করিতে বসিলেন, এবং মনে মনে ভাবিলেন—"আমি এই বালিকার রূপে মুগ্ধ হয়ে কি অন্যায় কাজই করেছি। এ গলগ্রহ কেন কর্লাম !" তাহার পর আহার শেষ করিয়া শয়ন করিলেন। শয়ন করিয়া অনেকক্ষণ সেই বালিকার প্রত্যাশায় শয্যায় শুইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন, এবং তাহার আসিতে যত বিলম্ব হইতে লাগিল, তিনিও ততই বিরক্ত হইতে লাগিলেন। শেষে যখন সমস্ত বাড়ী নিস্তব্ধ হইল, তখন সেই বালিকা চুপি চুপি চোরের ন্যায় গৃহে প্রবেশ করিয়া নিঃশব্দে আস্তে আস্তে গৃহের অর্গল বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর গৃহের আলোটি নিবাইয়া দিয়া আপনার বস্ত্রাঞ্চলে আপাদমস্তক ঢাকিয়া স্বামীর এক পার্শ্বে ধীরে ধীরে শয়ন করিল।

তখনও রসিকমোহন জাগ্রত, রসিকমোহন ভার্য্যার এরূপ ব্যবহারে মনে মনে বড়ই ক্ষুণ্ণ হইলেন। রসিকমোহনের বড় সাধ, তাঁহার ভার্য্যা আধুনিক সুশিক্ষিত রমণীর ন্যায় সকল কার্য্যের সহায়তা করিবে, জীবনের একমাত্র সঙ্গিনী হইবে, উভয়ে প্রাণে প্রাণে মিশিয়া যাইবে। দুর্ভাগ্যক্রমে রসিকমোহনের এ সাধ মেটে নাই। রসিকমোহনের মনে দৃঢ়বিশ্বাস হইয়াছিল, যে শরৎকুমারী তাহাকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসে না। সুতরাং শরৎকুমারী লইয়া তিনি কখনই সুখী হইতে পারিবেন না। ক্ষুদ্র বালিকার সেই হৃদয়নিহিত গভীর প্রণয় অনুভব করিবার ক্ষমতা রসিকমোহনের ছিল না। কিছুক্ষণ পরে রসিকমোহন বলিল—"শরৎ, তুমি আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার কর কেন ? আমি তোমায় কত ভাল বাসি। কিন্তু তোমার হৃদয়ে আমার জন্য একটুও ভালবাসাও কি নাই ?"

বালিকা ধীরে ধীরে অতি মৃদুস্বরে বলিল—"চুপি চুপি কথা কও, নইলে কেউ শুন্‌তে পাবে যে।"

দশম পরিচ্ছেদ।

রসিকমোহন পত্নীর এই উত্তরে মনে মনে বড়ই অসন্তুষ্ট হ॰ বিরক্ত হইয়া কিছুক্ষণ নীরবে শয্যায় পড়িয়া রহিলেন। কিন্তু নীরবে পড়িয়া থাকাও তাঁহার পক্ষে বড়ই অসহ্য বোধ হইল। তি শুইয়া ছটফট্ করিতে লাগিলেন, অবশেষে রাগে ও অভিমানে অ তিনি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। এই সময় শরৎকুমারী বাহিরে যাইতে নিষেধ করিত এবং দুই একটা ভাল কথা বলি গোলযোগই মিটিয়া যাইত। কিন্তু বালিকার সে সাহস অবস্থায় কি করিতে হয়, বালিকা তাহা জানিত না; পাছে ত ননদিনী তাহার কোনরূপ অস্পষ্ট কথাও শুনিতে পায়, বালিকা কেবল সেই বিষয়েই সাবধান হইতে জানিত। এদিকে তাহার যে নাশ হইতেছে, বালিকা তাহার সেই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে সে বিষয় অনুভব পারিত না।

রসিকমোহন বাহিরে আসিলেন, বাড়ীর সকলেই তখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। সকল গৃহ নীরব ও নিস্তব্ধ। তিনি সেই রাত্রে অন্ধকারে একাকী অনেকক্ষণ ছাদের উপর বেড়াইতে লাগিলেন। প্রাণের ভিতর একটা ভয়ানক চিন্তা তখন তাঁহার মনকে বড়ই অস্থির করিতেছিল। অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তখন সে চিন্তার তিনি কোন মীমাংসাই করিতে সক্ষম হইলেন না। ক্রমে বড়ই অস্থির হইলেন,—আর থাকিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে পুনরায় আপন শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া দরজায় অর্গল বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহার পর আলো জ্বালিলেন, কিন্তু আলো জ্বালিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি একবারে স্তম্ভিত হইলেন। তিনি দেখিলেন তাঁহার ভার্য্যা শরৎকুমারী গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত! তিনি যে শরৎকুমারীর ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া হৃদয়ের যন্ত্রণায় ছটফট্ করিয়া বেড়াইতেছেন, আর সেই শরৎকুমারীর হৃদয়ে কি না একটুও চিন্তা নাই, একটুও যন্ত্রণা নাই—সে গাঢ় নিদ্রায় অচেতন! এতক্ষণ তিনি যে নিদারুণ চিন্তার মীমাংসা করিতে পারিতেছিলেন না, এইবার বুঝি সে চিন্তারও একরূপ মীমাংসা হইল। কিন্তু সে সম্পূর্ণ মীমাংসাটা ও তাঁহার হৃদয়ে বড়ই আঘাত করিল, তাঁহার যন্ত্রণা শতগুণে বৃদ্ধি হইল। তখন তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া সেই নিদ্রাভিভূত বালিকার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া [illegible] বালিকাও ত্রস্ত হইতে

সে স্বামীর সহিত কথা কহিয়াছে বলিয়া তাঁহার ননদিনী তাহ ধরিয়া তাহাকে প্রহার করিতেছে। আর বালিকা সেই ননদিনী কার করিতেও পারিতেছে না। এমন সময় বালিকার নিদ্রা ভঙ্গ নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র দেখিল—ননদিনীর পরিবর্ত্তে তাহার স্বামী। কবার চখে চখে মিলন হইবামাত্র বালিকার ভয় দূরে গেল বটে, লজ্জা আসিয়া বালিকার মস্তক অবনত করিয়া দিল।

কমোহন আরম্ভ করিলেন—"তুই আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার আজ তোকে সেই কথা স্পষ্ট করে বল্‌তে হবে। তার পর আমার আছে, আমি তাই কর্‌বো—আমি কিসে তোর অনুপযুক্ত তাই ষ্ট করে বল্?"

লিকা যখন এ প্রশ্নের অর্থই বুঝিতে পারিল না, তখন উত্তর কিরূপে দেবে? বালিকা নীরব ও লজ্জাবনতমুখী। কিন্তু এদিকে রসিকমোহন তাহার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনেক তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। যখন সে প্রশ্নের কোন উত্তর না পাইয়া তাহার ক্রোধ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল, তখন—লিখিতে লজ্জা করে—রসিকমোহন সেই বালিকাকে সজোরে এক পদাঘাত করিয়া পুনরায় গৃহের বাহিরে চলিয়া আসিলেন। এবার কিন্তু তিনি আর বাড়ীর মধ্যে থাকিলেন না, অন্ধকারে ধীরে ধীরে সদর দরজা খুলিয়া একবারে বাড়ীর বাহিরে আসিয়া পড়িলেন। তাহার পর আমরা পূর্ব্বে যে কুপল্লীটার কথা উল্লেখ করিয়াছি রসিকমোহন ধীরে ধীরে সেই কুপল্লীর দিকে চলিয়া গেলেন। সেইদিন হইতেই সেই কুপল্লীতে তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইতে লাগিল, এবং সেই দিন হইতেই একে একে শরৎকুমারীর ইহ জীবনের সকল সুখ—সকল সাধ ফুরাইতে আরম্ভ করিল।

এ দিকে শরৎকুমারী সেই রাত্রে কি অপরাধে স্বামী কর্ত্তৃক এরূপ দুর্দ্দশা-গ্রস্থ হইল, তাহা বুঝিতে না পারিয়া সমস্ত রাত্রি ক্রন্দনে আপনার মাথার বালিশ ভিজাইয়া ফেলিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

এখন রামকুমার ও যামিনীর কথা কিছু বলিব। রামকুমার যামিনীকে হ লইয়া যাইতে আসিয়াছিলেন কিন্তু এখানে আসিয়া ২।৩ দিন থাকিয়া র সে বিষয়ে কোন চেষ্টাই করিলেন না। জননীর অনুমতি ও ভ্রাতার নুনয় রামকুমার দুই একদিনের মধ্যে সমস্তই বিস্মৃত হইয়া গেলেন। তবে চ রামকুমারের মাতৃভক্তি বা ভ্রাতৃস্নেহ কিছুই ছিল না? আমারা সহজে কথা এখন স্বীকার করিতে পারিব না। তবে কেন যে এইরূপ ঘটিল, সেটা বশ্যই একটা গোলের কথা। আমরা এ বিষয়ে যে মীমাংসা করিতে সক্ষম তাহা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

ারে অনেক সময় এরূপ ঘটনা ঘটে যে আমাদের বিবেক ও বুদ্ধিবৃত্তি া কার্য্যক্ষম থাকিলেও আমরা সেই বিবেক ও বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা না হইয়া অন্য কোন আকস্মিক ঘটনাস্রোতে ভাসিয়া চলিয়া আমাদের কর্ত্তব্য জ্ঞান বিলক্ষণ থাকে, কিন্তু আমরা সেই কর্ত্তব্য-ীভূত হইয়া কার্য্য করিতে সক্ষম হই না। এরূপ অবস্থায় আমরা ক প্রকার 'জড়ভরত' হইয়া যাই। রামকুমারের ও এখন ঠিক এইরূপ ঘটিয়াছিল। রামকুমার মনে মনে বুঝিতে ছিলেন যে তাঁহার কার্য্যটা হইতেছে না, এবং কি করা কর্ত্তব্য তাহাও তিনি জানিতেন, কিন্তু লে কি হহবে, ইহাতে তাঁহার হাত নাই। তিনি এখন ঘটনা স্রোতে সয়া চলিয়াছেন। এখন এই ঘটনাস্রোতটা কি তাহা একবার অনুসন্ধান রিয়া দেখা যাউক।

রামকুমার বড়ই কোমল প্রকৃতির লোক; মনের দৃঢ়তা তাঁহার কিছুমাত্র াই। কিন্তু তাঁহার ভার্য্যা যামিনীর প্রকৃতি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। যা... হা একবার মনে করে, যতক্ষণ না তাহাতে কৃতকার্য্য হয় ত...ক্ষণ যামিনী শ্চিন্ত থাকিতে পারে না। যামিনীর একান্ত ইচ্ছা যে তাহার স্বামী তাঁহার ূর্ণ বশীভূত থাকে, যামিনী 'উঠ' বলিলে তাহার স্বামীকে উঠিতে হইবে, নী 'বস' বলিলে তাহার স্বামীকে বসিতে হইবে; এবং ইহাকেই যামিনী ত্যপ্রণয়ের চরমোৎকর্ষ মনে করিত, আর সেই জন্যই যামিনী প্রাণপণে কর্ত্তা লাভের চেষ্টা করিত। এ...ন রামকুমার তাঁহার [illegible]

আসিলে যামিনীর একান্ত চেষ্টা হইল, যে যাহাতে রামকুমার তাহাকে গৃ লইয়া না গিয়া তাহারই পিতৃগৃহে অবস্থিতি করে। কেবল এই ঘটনাতে রামকুমারের এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। তবে কিরূপে রামকুমার এই ঘটন স্রোতে ভাসিয়া চলিলেন, তাহা পরে বলিতেছি।

সেইদিন সেইরূপে রাত্রি প্রভাত হইল, পরদিন প্রভাতে রামকুমার যামিনীকে বলিলেন "তোমাকে নিয়ে যেতে মা আমায় পাঠিয়েছেন, এখন সে বিষয়ের কি তা বল।"

যামিনী। আমি যাব না?

রাম। কেন?

যামি। আমার ইচ্ছা।

রাম। কেবল তোমার ইচ্ছেতে কাজ হবে না। আমি তোমার আমি যদি নিয়ে যেতে ইচ্ছে করি, তবে কে তোমায় ধরে রাখ্‌তে পা

যামি। জোর করে নিয়ে গেলে, আমি সেখানে গিয়ে ... য় মর্‌বো।

এই কথাটা রামকুমারের মনে বড় ভাল লাগিল না। রামকু... কোন কথা না বলিয়া অনেকক্ষণ স্থির হইয়া কি ভাবিলেন। তাহা... একটু নরম স্বরে বলিলেন, 'তবে একান্তই কি তুমি আমার যাবে না?"

যামিনীও তখন একটু স্বর চড়াইয়া দিয়া বলিল —"না।"

রামকুমার আর কি করিবেন? একটা স্ত্রীহত্যা পাতকের ভয়ও ত তাঁহার হইয়াছিল। সুতরাং একটা সুদীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"তবে তুমি থাক, আমি যাই?"

যা...। তা হবে না, তোমাকেও এখানে থাক্‌তে হবে।

রাম। আ... এখানে থাক্‌বো কেন?

যামি। না থাক, এখনি যাও, তুমি গেলেই আমি এখানে গলায় দ... দিয়া মর্‌বো।

আবার—আবার সেই কথা! যামিনী তুমি ধন্য! তুমি এক গলায় দ... ভয় দেখাইয়া আপনার কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইলে! আর রামকুমা... ...একজন বুদ্ধিমান লোক হইয়াও আপনার বুদ্ধির...

পদাঘাত করিলে! সেই অবধি আর কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া রামকুমার শ্বশুর গৃহেই বাস করিতে লাগিলেন।

——:——

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

এদিকে রামকুমারের গৃহে ফিরিয়া আসিতে যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, রামকুমার জননী ততই উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন। আজ আসিবে, কাল আসিবে করিয়া প্রায় এক পক্ষ অতীত হইয়া গেল, তথাপি রামকুমার গৃহে না। তখন গৃহিণীর দুর্ভাবনার আর সীমা রহিল না, তিনি নানা-রূপ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। শেষে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ দিবারাত্রি ক্রন্দন করিতে বসিলেন, আর শ্যামকুমারকে সংবাদ আসিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ আরম্ভ করিলেন। জননীর এদৃশ দেখিয়া অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে শ্যামকুমার বড়বধূর পিত্রালয়ে যাইতে স্বীকৃত হইল। পরদিন অতি প্রত্যূষে শ্যামকুমার বসন্তপুর যাত্রা করিল।

বসন্তপুরে পৌঁছিয়া কিন্তু শ্যামকুমার এক বিভ্রাটে পড়িল। কেমন করিয়া, সে একজন বড়লোকের বাড়ী প্রবেশ করিবে—সেখানে যে লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, কিরূপেই বা তাহাদের সহিত আলাপ করিবে—হয়ত তাহারা সকলই তাহাকে দেখিয়া ঘৃণা করিবে—হয়ত কেহই তাহার সহিত ভাল করিয়া বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিবে না। এইরূপ নানা চিন্তায় শ্যাম-কুমার কিছু ব্যতিব্যস্ত হইল। অবশেষে দাদা ও বড়বধূ সেখানে আছেন এই কথা যখন তাহার মনে পড়িল, তখন একটু সুস্থির হইয়া ধীরে ধীরে শ্যামকুমার নবকুমারের বাড়ী প্রবেশ করিতে সাহস হইল। শ্যামকুমারের ক্রমে বাড়ীর সম্মুখেই দাদার সহিত সাক্ষাৎ হইল। রামকুমার জননীর অবস্থার কথা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন, এবং আপনাকে ধিক্কার দিলেন। শ্যামকুমার দাদার ও তাঁহার শল সংবাদ পাইয়া আহ্লাদিত হইল, এবং তাহার কার্য্যভার শেষ হইল, এই কথা মনে মনে স্থির করিয়া রাখিল। রামকুমার

ভ্রাতাকে লইয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন, এবং ভ্রাতাকে বৈটকখানায় বসিতে বলিয়া ভ্রাতার আহারাদির চেষ্টায় অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

শ্যামকুমারের কিন্তু বৈটকখানায় প্রবেশ করিতে সাহস হইল না, সেরূপ সুসজ্জিত গৃহে প্রবেশ করিতে শ্যামকুমারের মনে কেমন ভয় হইতে লাগিল। চারিদিকে চাহিয়া শ্যামকুমার দেখিল নিকটেই একটি ক্ষুদ্র গৃহ রহিয়াছে, সেই গৃহে একখানা তক্তপোষ পাতা, তাহার উপর একখানি মাদুরি। গৃহে প্রবেশ করিয়া দরজার বামদিকে আগুণ, তামাক, হুকা, কলিকা, ইত্যাদি সরঞ্জাম সকল দেখিতে পাইলেন। তখন মহা আনন্দে শ্যামকুমার সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং নিজে এক ছিলিম তামাক সাজিতে বসিলেন, এমন সময় সেই গৃহের মালিক খোদ রূপচাঁদ খানসামা আসিয়া উপস্থিত হইল। সে একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে গৃহের দেখিয়া প্রথমেই তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। তখন উভয়ে এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

প্রথমেই রূপচাঁদ প্রশ্ন করিল—"কে তুই?"

শ্যামকুমার উত্তর করিল—"আমি শ্যামকুমার।"

রূপ। কি চাস্?

শ্যাম। ব্রাহ্মণের হুকা।

রূপ। তা দিচ্চি—বলি কা'কে খুঁজ্জ?

শ্যাম। কা'কেও খুঁজি না।

রূপ। তবে এখানে এলে কেন?

শ্যাম। মা পাঠিয়ে দিয়েছেন বলে।

রূপ। ভাল আপদ! এমন বোকা বামুন ত কখন দেখি না গা। এখানে তোমার মা পাঠিয়ে দিয়েছেন—কার কাছে?

শ্যাম। কেন—আমার দাদার কাছে।

রূপ। তোমার দাদা কে?

শ্যাম। আমার দাদা রামকুমার মুখোপাধ্যায়।

রূপ। তুমি কি তবে আমাদের জামাই বাবুর ভাই?

শ্যাম। হাঁ।

রূপ। তা এতক্ষণ বলেন নাই কেন? এই ন্যান হুকা ন্যান।

খান্। তখন শ্যামকুমার হুকা লইয়া তামাক খাইতে আরম্ভ করিল, এবং মনে মনে ভাবিল—'বাবা! বড়লোকের বাড়ী হইলে এত পরিচয় লইয়া তবে এক ছিলিম তামাক খাইতে দেয়!''

শ্যামকুমার তামাক খাইতেছে, এমন সময় অন্য একজন চাকর তথায় উপস্থিত হইল। সে আসিয়া রূপচাঁদকে বলিল—"দ্যাখ্ রূপো, জামাইবাবুর একজন ভাই এসেছে, তাঁকে আমিত কোথায় খুঁজিয়া পেলেম না।"

তখন রূপচাঁদ ইঙ্গিতের দ্বারা শ্যামকুমারকে দেখাইয়া দিল। সেই নবাগত চাকরের কিন্তু তাহা বিশ্বাস হইল না। সে বলিল—"কেন মিছে ঠাট্টা করিস? কোথায় তিনি আছেন জানিস্?"

রূপচাঁদ তখন স্পষ্ট কথায় বলিল—"ঠাট্টা কর্‌বো কেন? ইনিই জামাই ভাই, শ্যামকুমার বাবু।" চাকর তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ হইয়া রহিল, এমন সময় শ্রীমান্ নগেন্দ্র ও খগেন্দ্র তথায় আসিয়া উপহইল, এবং "কাকা বাবু এ[illegible]!" বলিয়া শ্যামকুমারের কোলে ঝাঁপাপড়িল। তখন সেই চাকরে[illegible]র কোন সন্দেহ রহিল না। সে একটু অপ্র[illegible]ত হইয়া বলিল—"মহাশয় [illegible]কটু জল খাবেন আসুন।" শ্যামকুমার কিন্তু যাইতে রাজি হইল না, সেইখানে জলখাবার আনিয়া দিতে চাকরকে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল। অগত্যা চাকর সেইখানেই জলখাবার আনিয়া দিল। তখন শ্যামকুমার মহা আহ্লাদে নগু খগুকে সঙ্গে লইয়া জলযোগে বসিল। জলযোগের দুই ঘণ্টা পরে আহার হইল, আহার ও বাহিরেই হইল, কারণ নিকট কুটুম্ব হইলেও বড়লোকের বাড়ীর ভিতর প্রবেশাধিকার থাকে না। শ্যামকুমার তাহাতে কিন্তু মহাসন্তুষ্ট হইল এবং আহারান্তে সেই রূপচাঁদ খানসামার ঘরে আসিয়া আড্‌ডা লইল।

সন্ধ্যার সময় রামকুমার শ্যামকুমারকে ডাকিয়া বলিল—"শ্যাম, তুমি ওখানে বসে থাক্‌লে কি হবে? যে জন্য এসেছ, সে বিষয়ের চেষ্টা করবে না?"

শ্যাম দাদার কথা শুনিয়া কিছু অবাক্ হইল, দাদাকে আর বড় বধূ ঠাকুরাণীকে যে লইয়া যাইতে সে আসিয়াছে, সে কথা বুঝিতে পারিল, কিন্তু ইহার জন্য আবার তাঁহাকে কি চেষ্টা করিতে হইবে তাহা বুঝিতে পারিল না। রামকুমার ভ্রাতাকে চিনিতেন, তিনি তখন বুঝাইয়া দিলেন—"তুমি

আমার শ্বশুরকে গিয়া বল, যে মা বড় বউকে নিয়ে যাবার জন্য তোমায় পাঠিয়েছেন, আর তিনি নগেন খগেনের জন্য রাতদিন কাঁদ্‌ছেন কাল তাদের সকলকে পাঠিয়ে দিতে হবে।"

শ্যাম কিন্তু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"দাদা, অত কথা আমি বল্‌তে পার্‌বো না।'

অগত্যা রামকুমার তখন শ্যামকে সঙ্গে লইয়া নিজেই সেই সকল কথা বলিতে শ্বশুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। নবকুমারের বসিবার এক স্বতন্ত্র গৃহ ছিল, সেই গৃহে তখন তিনি বসিয়া "শিবসংহিতা" পাঠ করিতেছিলেন সম্মুখে জামাতাকে দেখিয়া বসিতে আজ্ঞা করিলেন। জামাতা এক পার্শ্বে বসিলেন, কিন্তু শ্যাম ভূমিষ্ঠ হইয়া এক প্রণাম করিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। যখন নবকুমারের তাহার প্রতিও দৃষ্টি তখন তিনি জামাতার প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইটি কে?'

রাম। ইটি আমারই কনিষ্ঠ ভাই। মা নগেন খগেনের জন্য বড় হয়েছেন, তাই তাদের নিয়ে যাবার জন্য ক পাঠিয়ে দিয়েছেন। এখন র অনুমতি হলেই আমি তাদের নিয়ে ।"

নবকুমার একবার মাত্র সুদীর্ঘ এক "হুঁ" দিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর কিছুক্ষণ পরে বলিলেন—"দেখ বাবা, আমাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করা বৃথা। আমি তোমাদের সংসারের কোন কথাতেই থাকি না। আমি আমার নিজের কাজেই এত ব্যস্ত থাকি, যে সংসারিক কোন বিষয় মীমাংসা করবার আমার সময় থাকে না। আমাকে এরূপ একটী ঘোরতর সাংসারিক বিষয়ের প্রশ্ন করে, বিরক্ত করা তোমার উচিত হয় না। তোমার এরূপ কোন কথা জিজ্ঞাস্য থাকে, আমার উপযুক্ত পুত্র রসিকের কাছে যাও, আমি সমস্ত সাংসারিক বিষয় তারই উপর ভারার্পণ করেছি, আর গুরুর দয়ায় সেও একজন বুদ্ধিমান লোক, সে তোমার এ প্রশ্নের উত্তর দেবে।"

রামকুমার আর দ্বিরুক্তি করিল না। ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া এইবার বৈটকখানায় রসিকমোহনের উদ্দেশে চলিলেন।

গেটে।

প্রথম অধ্যায়।

ভূমিকা, জন্মবৃত্তান্ত ও লালন কাল।

সেক্ষপীর যেমন শুধুই ইংলণ্ডের কবি নহেন, কালিদাস যেমন শুধুই ভারতের কবি নহেন, সেইরূপ, গেটে শুধুই জার্মাণির কবি নহেন। সেক্ষপীর ও কালিদাসের ন্যায় তিনিও একজন জগতের কবি। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী সাহিত্যের সহিত ভলতেয়ারের যেরূপ সম্বন্ধ, সম্পূর্ণ জার্ম্মাণ সাহিত্যের সহিত গেটের সেইরূপ সম্বন্ধ; অর্থাৎ, অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী-সাহিত্যের জীবন যেমন ভলতেয়ার, ভলতেয়ার ভিন্ন যেমন উক্ত শতাব্দীর ফরাসী-সাহিত্যের প্রায় আর কিছুই থাকে না,—সেইরূপ গেটে ভিন্ন য়ুরোপীয় সাহিত্য-বাজারে জার্ম্মাণ সাহিত্যের মূল্য যৎ-সামান্যই। সত্য, ভলতেয়ার অপেক্ষা গেটে অধিকতর প্রতিভাশালী, প্রাজ্ঞ ও সম্মানার্হ। কিন্তু, উভয়েই যে স্ব স্ব ভাষার নব-শক্তি-স্ফূর্ত্তি-দাতা ও বিপ্লব-কর্ত্তা, স্ব স্ব সাহিত্যের কেন্দ্র ও জীবন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

জার্ম্মাণেরা একবাক্যে বলে যে, গেটেই তাহাদিগের ভাষা ও সাহিত্যের স্রষ্টা। বাস্তবিক, গেটের পূর্ব্বে, য়ুরোপে জার্ম্মাণ-সাহিত্যের বা জার্ম্মাণ-ভাষার কোন আদর ছিল না। একা গেটেতেই সমস্ত জার্ম্মাণ-সাহিত্য প্রতিভাত হইতেছে। শিলার, লেসিং, বিল্যাণ্ড, হাইনে প্রভৃতি, কেহ কেহ গেটে অপেক্ষা কোন কোন অংশে শ্রেষ্ঠ, সত্য; কিন্তু, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী, আর কোন লেখকই তাঁহার ন্যায় সঠিক জার্ম্মাণ-ভাব প্রকাশ করিতে পারেন নাই। কি ভাবের জন্য, কি কল্পনার জন্য—তিনি কোন বিজাতীয়ের নিকটে দিনেকের তরেও দাবী নহেন। তাঁহার রচনা বাল্মীকির ন্যায় সম্পূর্ণ জাতীয়।

জার্ম্মাণেরা গেটেকে যে কি চক্ষে দেখে, তাহা বুঝান দুরূহ ব্যাপার। গেটের প্রশংসা-কালে, তাহারা তাহাদিগের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য পর্য্যন্ত হারায়, গেটের সাধারণ চিঠি-পত্র হইতেও অসাধারণ তত্ত্ব-কথা বাহির করিয়া বসে।

মাদাম্ ড্ ষ্টাইল বলেন, "ফ্রীমেসনদিগের মধ্যে যেরূপ সাঙ্কেতিক শব্দের প্রচলন আছে, সেইরূপ গেটে-ভক্তগণের নিকটেও গেটের রচনার দু-একটা শব্দ ব্যবহার করিলেই তাহারা যথেষ্ট মনে করে। ফ্রীমেসনদিগের ন্যায় তাহাদেরও দু-একটা শব্দেই—তাঁহার কোথাকার কথা বা কোন্ বিষয় বলা হইবে, ইহা বুঝিতে আর বিলম্ব হয় না। গেটের প্রতি জার্ম্মাণদের এমনই ভক্তি।" সেক্ষপীরের গত ত্রিশতাব্দী উৎসবোপলক্ষে সমবেত প্রতিনিধি-মণ্ডলী মধ্যে জার্ম্মাণ-প্রতিনিধি বলিয়াছিলেন যে, "অদ্য তাঁহারা জগতের দ্বিতীয় কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য একত্রিত হইয়াছেন। প্রথম—গেটে।"

য়ুরোপে গেটের পাঁচ-খানি বিস্তৃত জীবন-চরিত প্রকাশিত হইয়াছে। তিনখানি জার্ম্মাণ-ভাষায়, একখানি ফরাসী ও অন্যখানি ইংরাজি ভাষায়। ইংরাজি-খানি জর্জ্জ ইলিয়াট নামে খ্যাত উপন্যাস-রচয়িত্রী মেরি আন্ ইভান্সের প্রথম স্বামী জর্জ্জ হেন্‌রি লিয়ুসের রচিত। এবং Dichtung und Wahrheit (কবিতা ও সত্য) নামে গেটের একখানি আত্ম-জীবনবৃত্ত আছে। এখানি তাঁহার প্রৌঢ় বয়সে স্মৃতির সাহায্যে লিখিত; তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে বিস্মৃতি-জাত ভ্রমাদি লক্ষিত হয়, বটে। কিন্তু কি কি উপাদানে তাঁহার প্রকৃতি গঠিত হইয়াছিল, কি ঘটনায় তাঁহার কোন্ ভাব উদ্রিক্ত হইয়াছিল,—এক কথায়, গেটে কিরূপে গেটে হইয়াছেন, ইহা দেখাইতে তিনি বিন্দু-মাত্র বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার ভ্রম-গুলিও অধুনা বহু লেখক কর্ত্তৃক খণ্ডিত হইয়াছে। আর, গেটের ক্ষুদ্র জীবনী, কথা-বার্ত্তা, চিঠি-পত্র, ধর্ম্ম-মত, সার কথা, অনুবাদ ইত্যাদিতে প্রায় সহস্রাধিক পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। য়ুরোপ তবু যেন এখনো গেটেকে বুঝিতেছে না!

গেটেকে বুঝিতে হইলে গেটের জীবন-চরিত সবিশেষ আলোচনা করা উচিত। গেটের ন্যায় বিশ্বগত (Objective) কবি জগতে অতি বিরল। তাঁহার প্রায় সমস্ত রচনাই জীবনী-মূলক। নিজের অধিকাংশ বাস্তব ঘটনাকেই তিনি কবির ভাষায় অভিব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং, তাঁহার জীবনী আলোচনা না করিলে তাঁহার রচনার অর্দ্ধাধিক সৌন্দর্য্য হারাইতে হয়। তাঁহার রচনা সমালোচন-কালে তাঁহার জীবন-কাহিনী অগ্রেই আসিয়া পড়ে। গেটের জীবনেও রচনায় এমনই ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। বায়রণের ন্যায় তিনি

নিজেই তাঁহার সকল কাব্যের নায়ক। তিনি আত্মগত (Subjective) কবিতার যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছেন। এবং প্রতি হাতে বুঝাইয়াছেন যে, তিনি বিশ্বগত কবি আত্মগত কবি নহেন। তন্তুকীটের ন্যায় আপনার মধ্য হইতেই কতকগুলা সূক্ষ্ম সূত্রজাল প্রকাশ করেন নাই। আপনার চারিদিক হইতে—এই ভাবোদ্বেলিত, চিন্তা-পীড়িত, কার্য্যময় জগত হইতেই তাঁহার প্রতিভার উদ্বোধনা। সত্য, তাঁহার রচনার অধিকাংশই বিশ্বগত-ভাবে পূর্ণ, কিন্তু তাঁহার রচনা-মধ্যে আত্মগত-ভাব যে আদৌ নাই, ইহা বলা যায় না। আর কাব্য বা উপন্যাস—তাঁহার সমস্ত রচনার মধ্যেই বেশ একটু গীতি-কবিতার মাধুর্য্য পাওয়া যায়, এইজন্য তাঁহাকে অনেকেই প্রধানতঃ গীতি-কাব্যকার বলে।

ইংরাজ লেখকেরা গেটেকে য়ুরোপের সর্ব্বপ্রধান কবি বলিয়া স্বীকার করে না। কিন্তু, সেক্ষপীরের পরেই তাঁহার স্থান নির্দ্দেশ করে। আবার ম্যাথু আর্ণল্ড বলেন, "গেটে য়ুরোপের সর্ব্ব-প্রধান কবি না হউন, তিনি য়ুরোপের সর্ব্বপ্রধান সমালোচক।" কিন্তু, গেটের রচনা যে সেক্ষপীরের অপেক্ষা অধিকতর কায়দা (art)-সঙ্গত, ইহা অবিসম্বাদী কথা।

যাক্। ফরাসীয় প্রধান সমালোচক স্যাঁৎ বাভের এই ধারণা ছিল যে, "মহৎ ব্যক্তির জীবনী, শুধু শৈশব হইতেই আলোচনা করিলে যথেষ্ট হইল না। তাঁহাকে, তাঁহার দেশ-কালের সহিত, তাঁহার জাতি-গোত্রের সহিত বুঝা উচিত। এবং তাঁহার পিতা—প্রধানতঃ মাতা, ভাই-ভগ্নী, এমন কি পুত্র কন্যার মধ্যেও তাঁহার মহত্ত্বের কতকটা আভাস পাওয়া যায়।" আর গেটের আত্ম-জীবনবৃত্ত-খানিও যেন সাঁৎ বাভেরই ধারণানুযায়ী লিখিত। আমরাও এ জীবন-চরিত্র-খানিতে সাঁৎ বাভের মতানুসরণ করিব। বাস্তবিকই, প্রতিভা—অবস্থা ও সংসর্গের দ্বারা নিয়মিত।

মেন নদী তীরস্থ ফ্রাঙ্কফোর্ট নগরে, ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে, আগষ্টের ২৮শে তারিখে ঠিক দিবা দ্বিপ্রহর-কালে যোহান ভল্‌ফগাঙ্গ ফন গেটে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। কিন্তু, গেটের ভূমিষ্ট হইবার তিন দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, তাঁহার জননীকে অসহ্য প্রসব-বেদনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। গর্ভধারিণীর যন্ত্রণোপশম চেষ্টায় ও ধাত্রীর অপটুতায়, শিশু মৃতবৎ ভূমিষ্ট হইয়াছিল। জীবনের কোন লক্ষণ ছিল না। সকলেই নিরাশ্বাস হইয়া, শিশুর বক্ষস্থল সুরাধারা মর্দ্দন করিতে

লাগিল। বহুক্ষণ পরে শিশু চক্ষুরুন্মীলন করিল। শিশুর পিতামহী শয্যার পার্শ্বেই ছিলেন, তিনি হর্ষে উচ্চৈস্বরে শিশুর মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শিশু জীবিত আছে।" মাতামহ, প্রসব কালীন এই যন্ত্রণা ও দুর্ঘটনা দেখিয়া—দরিদ্রাদিগের জন্য একটি দাতব্য সুতিকাগার প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য অঙ্গীকৃত হন। প্রসূতি আনন্দ-বিহ্বলা হইয়া বলিলেন, "জন্মকাল হইতেই কি আমার পুত্র মানব-জাতির আশীর্ব্বাদ ভাজন হইবে!' মাতামহ উক্ত অঙ্গীকার রক্ষা করিয়াছিলেন।

আমাদিগের ন্যায়, গেটে কতকটা ফলিত জ্যোতিষ মানিতেন। জন্মকালীন গ্রহগণের ফলাফলে মনুষ্য-জীবন নিরূপিত হয়, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন। তিনি বলেন, "তাঁহার রাশি-চক্রস্থ গ্রহের অবস্থাগুলি শুভ ছিল। রবি কন্যা রাশিতে ও দশম স্থানে ছিল। বৃহস্পতি ও শুক্রের মিত্র দৃষ্টি ছিল। বুধ প্রতিকূল ছিল না। শনি ও মঙ্গলের নৈসর্গিক বা অনাপেক্ষ-ভাব (Indifference) ছিল। চন্দ্র দণ্ডাধিপতি ও তাহার পূর্ণ দৃষ্টি ছিল।" পূর্ণিমা তিথিতে তাহার জন্ম হয়। মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত, তাহার ভূমিষ্ঠ হইবার নিষেধ কাল। গ্রহগণের এইরূপ শুভাবস্থা ছিল বলিয়াই, তিনি যথা সময়ে ভূমিষ্ঠ না হইয়াও জীবিত ছিলেন।

গেটের ঊর্দ্ধ পুরুষ—প্রপিতামহ হইতেই আরম্ভ করা যাক্। খ্রীষ্টান গেটে আর্টারণ গ্রামে অশ্বক্ষুর-মণ্ডকের ব্যবসা করিতেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পিতামহ ফ্রেডারিক জর্জ্জ গেটে ফ্রাঙ্কফোর্ট-নগরে আসিয়া সূচীজীবীর ব্যবসা অবলম্বন করেন। তিনি বেশ বাদ্য-নিপুণ ও প্রফুল্ল প্রকৃতির লোক। তিনি দুইবার বিবাহ করেন, দুইটাই সুচিজীবীর কন্যা। অপিচ, দ্বিতীয়াটী সপ্তত্রিংশ বর্ষীয়া বিধবা। হউক। কিন্তু, কর্ণেলিয়া স্বাসহরণ সুরূপা, কর্ম্মিষ্ঠা, দয়াবতী ও সদাশয়া ছিলেন। তাহার স্ত্রীধন-স্বরূপ উক্ত নগরে একটি বিখ্যাত পান্থ-নিবাস ছিল। দ্বিতীয় পাণিগ্রহণান্তর, ফ্রেডারিক সূচীজীবীর ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া, উক্ত পান্থ-নিবাসের অধ্যক্ষতা করিতেন। কালে এই পান্থ নিবাস হইতেই তিনি ফ্রাঙ্কফোর্টের একজন গণ্যমান্য ও ধনসম্পত্তি-শালী ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। গেটের পিতা—যোহান কাস্পার গেটে সর্ব্ব-কনিষ্ট। শৈশবাবস্থাতেই কাস্পার পিতৃ-ভ্রাতৃহীন হন।

কোবার্গ বিদ্যালয়ে শিক্ষান্তর, কাস্পার ব্যবহার-শাস্ত্র শিক্ষার্থে লেপ্‌জিগ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। গেসেন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে (Doctor of Jurisprudence) উপাধি লাভ করিয়া, কিছুদিন ওয়াজ্‌লার বিচারালয়ে ব্যবহারজীবীর ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তদনন্তর, ইতালী পরিভ্রমণে গিয়া, তথায় শিল্প-বিদ্যার চর্চ্চা করেন। স্বদেশে প্রত্যাগমনান্তর, তিনি অবৈতনিক রাজমন্ত্রী (Rath) উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মাতা পুত্র—উভয়ে একত্রেই বাস করিতেন। মাতার ধনসম্পত্তি-বলেই পুত্র বিনা উপার্জ্জনেও আজীবন সচ্ছল-ভাবে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

কাস্পার কিঞ্চিৎ বিদ্যা-গর্ব্বিত ও উগ্র প্রকৃতির হইলেও, তিনি বহুগুণ সম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি ন্যায়-পরায়ণ, নিয়মানুবর্ত্তী, সৎসাহসী, সারজ্ঞ ও অধ্যয়ন-শীল। ব্যবহার-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, শিল্প বিদ্যা ও সাহিত্যে প্রবলানুরাগী। ইতালীয় ভাষা—বিশেষতঃ ট্যাসোর একজন প্রধান ভক্ত। তাঁহার আকৃতিও প্রকৃত্যনুরূপ—অনেকটা পুত্রের ন্যায়—সেইরূপ ঈষৎ দীর্ঘ, নাতি স্থূল শ্রমোপযুক্ত, বলিষ্ঠ দেহ। কণ্ঠ, চিন্তা-পারগ, শৃঙ্খলা-প্রিয় ও বিজ্ঞতা-ব্যঞ্জক। আকৃতি বা প্রকৃতি—কিছুতেই তাঁহার মধ্যে কবিত্বের ছায়া পর্য্যন্ত লক্ষিত হইত না। স্নেহ বা ভালবাসার পরিবর্ত্তে, সাধারণতঃ তিনি ভক্তির পাত্র ছিলেন।

১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে ২০শে জুলাই, ফ্রাঙ্কফোর্টের প্রধানতম ম্যাজিষ্ট্রেট, যোহান ভল্‌ফগাঙ্গ টাক্সটারের সুরূপা প্রথমা কন্যার সহিত কাস্পারের পরিণয়-বন্ধন হয়। পাত্রের বয়ঃক্রম অষ্টত্রিংশ, পাত্রীর সপ্তদশ মাত্র। টাক্সটারদিগের কুল-মর্য্যাদা ও সম্ভ্রম-প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। কাথরিণ এলিজেবেথ্‌ কবিতা ও সঙ্গীত-প্রিয়া ছিলেন। স্বকল্পিত নব নব উপকথা দ্বারা শিশুদিগকে মুগ্ধ করিবার তাঁহার একটি বিশেষ গুণ ছিল। বধূ, শ্বশুর আশ্রয়েই ছিলেন; কখন গৃহ-কলহ ঘটে নাই। দম্পতির মধ্যেও প্রণয়ের অভাব ছিল না। স্বামীর প্রতি কেথেরিণের হিন্দু-পত্নীর ন্যায় ভক্তি-মিশ্রিত অকপট অনুরাগ প্রকাশ পাইত। কিন্তু,এই বিষম বয়ঃক্রম-তারতম্যে গেটে-জননী সমধিক স্নেহ-ময়ী ও পুত্রগত-প্রাণা। কেন না, উভয়েই নবীন বয়স্ক ও পর-নির্ভরাপেক্ষী। পিতার—পুত্র-শাসনকালে, মাতা পুত্র-পক্ষ। পুত্র-স্নেহে তিনি স্বামীর বহু ঔচিত্য ও ব্যবস্থার বিপরীতাচরণ করিয়াছিলেন। নিষেধ-সত্বেও তিনি দুইবার গেটের বাল্যানুশীলনী কবিতা প্রচার করিয়াছিলেন।

জীবনী-লেখকগণ একবাক্যে সকলেই গেটে-জননীর ভূয়সী প্রশংসা করে। তাঁহার অন্তঃকরণ বড়ই কমনীয় ছিল। তিনি আজীবন সকলেরই সহানুভূতি ও প্রশংসার পাত্রী ছিলেন। অনেকগুলি বিখ্যাত নরনারীর সহিত তাঁহার পত্রের আদান-প্রদান ছিল। সম্প্রতি তাঁহার পত্রাবলি প্রচারিত হইয়াছে। পত্রগুলি হৃদয় মাধুর্য্যে, ভাবোচ্ছ্বাসে ও কল্পনা-লীলায় পরিপূর্ণ। আপামর কেহই তাঁহার অকপট ব্যবহারে বিরক্ত হয় নাই। তিনি মনুষ্যজাতিকে ভাল বাসিতেন। পাপকে ঘৃণা করিতেন পাপীকে মার্জ্জনা করিতে পারিতেন। তিনি সদানন্দময়ী, শান্তি-সুখপ্রিয়া ও দুঃখ-ভীতা, আন্দোলন বা গণ্ডগোলের বিষম বিদ্বেষিণী। ভৃত্যদিগের প্রতি তাঁহার আদেশ ছিল, যে "গ্রামের বা সংসারের কোন অশান্তি তাঁহাকে যেন জানান না হয়। পল্লীতে অগ্নিদাহ উপস্থিত হইলেও তাঁহার জানিবার আবশ্যক আপন বিপদ জানিতেই পাইবেন, পরচর্চ্চা নিষ্প্রয়োজন।" ১৮ গেটে বিষম পীড়িত হইয়াছিলেন, আরোগ্য-লাভের পূর্ব্বে জননী ... র পীড়া-সংবাদ দিতে কেহই সাহস করে নাই। গেটে জননী হৃষ্ট- স্ত্রীজাতির মতে—ঈষৎ স্থূল-দেহা। পুত্রের কেশের ন্যায়—সেইরূপ পাটল-কেশা। সেইরূপ ভ্রমর কৃষ্ণোজ্জ্বল অক্ষিতারক, সেইরূপ অন্তর্ভেদিনী দৃষ্টি।

অধিকাংশই মহৎ-ব্যক্তির মহত্ব মাতৃগুণে উদ্ভাসিত। গেটের অতীব প্রসন্ন অদৃষ্ট। তাঁহার আকৃতি ও সুচরিত্রাগ্রহ পিতৃলব্ধ। তাঁহার প্রফুল্ল প্রকৃতি, গল্পানুরাগ ও আন্দোলন-বিদ্বেষ মাতৃ-লব্ধ। তাঁহার শিল্প-দ্রব্যানুরাগ ও ললনাসক্তি-মাতৃ কুলাগত।

গেটে সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠ। তাঁহার অনেকগুলি সহোদরা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; কিন্তু কর্ণেলিয়া ভিন্ন কেহই অধিক দিন জীবিত ছিল না। কর্ণে ..., তাঁহাপেক্ষা পঞ্চদশ মাসের কনিষ্ঠা; আজন্ম স্নেহ-পাত্রী। শিশু গে ... ক ভগ্নীটীর ইচ্ছামত, সদা সর্ব্বদা তাহাকে ক্রোড়ে রাখিত, তাহার শয্যাস্পা ... স্নেহ-দৃষ্টে বসিয়া থাকিত। ভগ্নীকে অন্য কেহ খাওয়াইলে বা আদর ক ... র, তাহার সহ্য হইত না, অন্য কেহ ক্রোড়ে লইলে সর্ব্বে-সর্ব্বা ক্রোধে অধীর হইত। শিশু—রোরুদ্য অপেক্ষা ক্রুদ্ধ-স্বভাব ছিল। বয়স-কালেও, গেটের এ ভগ্নীস্নেহ ন্যূন হয় নাই। কর্ণেলিয়ার স্নেহ ও সহানুভূতির ন্যায় তাঁহার আদরের সামগ্রী জগতে আর অতি অল্পই ছিল। কর্ণেলিয়া বুদ্ধিমতী ও

স্নেহময়ী। গেটের শৈশব-সখী ও উদ্দাম-যুব-হৃদয়ের একমাত্র স্নেহ-শান্তি-দাত্রী।

শিশু-গেটে অনলস, তেজস্বী, অনুসন্ধিৎসু, কল্পনা-প্রিয় ও সৌন্দর্য্যানুরাগী। সাধারণতঃ, শিশুদিগের সহিত বাল্যক্রীড়ায় অনাসক্ত, তবে সুরূপ শিশুগণের সহিত অন্য কথা। তিন বৎসর বয়ঃক্রম-কালে একটী কুরূপ শিশুকে ক্রীড়াস্থানে দেখিয়া সৌন্দর্য্য-প্রিয় সহসা বিষম সক্রন্দন চিৎকার জুড়িয়াছিল। "ঐ কুৎসিতটাকে সম্মুখ হইতে লইয়া যাও, আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না।" গৃহে অনাগমন পর্য্যন্ত এ ক্রন্দনের নিবৃত্তি হয় নাই। মাতা কর্ত্তৃক এই দুর্ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে, শিশু সেই উত্তর দিয়াছিল, "সহ্য করিতে পারি নাই।"

দুইটী বিভিন্ন পুরাতন বাটী একত্র করিয়া, গেটেদিগের বাস-ভবন গঠিত হইয়াছিল। তজ্জন্য, ভবন-মধ্যে অনেকগুলি অন্ধকারাচ্ছন্ন গলি-ঘুজি ছিল। শিশু শয্যায় অনিদ্র হইয়া, নিশীথে সেই গলি-ঘুজির মধ্যে, কল্পনায় বিবিধ সন্ত্রাস অনুভব করিত। প্রত্যহ অপরাহ্ণে, বাটীর পশ্চাদ্ভাগস্থিত একটী গবাক্ষ-ধারে বসিয়া, বালক-বালিকাগণের ক্রীড়োল্লাসে প্রতিধ্বনিত সম্মুখস্থ উদ্যানের সৌন্দর্য্য একদৃষ্টে দেখিত। আর, তথা হইতে নগর-প্রাচীর দূরে শ্যামল স্থলে (Valley) সূর্য্যাস্ত দেখিতে দেখিতে কত কি ভাবিত। বর্ষায়—সেই গবাক্ষধারে একাকী বসিয়া বজ্রনিস্বনে, ঝটিকা-গর্জ্জনে ও বিদ্যুল্লীলায় কত কি অস্ফুট আশঙ্কায় মগ্ন হইত।

পিতামহীর প্রশস্ত গৃহটী শিশুদিগের ক্রীড়াঙ্গন ছিল। তিনি পৌত্র-পৌত্রীদিগকে বড়ই ভাল বাসিতেন। বিবিধ ক্রীড়া-কৌতুক দ্বারা শিশুদিগের আনন্দ-বর্দ্ধন করিতেন। গেটের পঞ্চম বর্ষ কালে, খ্রীষ্টের জন্মদিনোৎসবে, শিশুদিগের নিমিত্ত পুতুলবাজি দিয়াছিলেন। এই ক্রীড়ায় গেটের হৃদয় অতিশয় মুগ্ধ ও বিচলিত হইয়াছিল। বহু অনুসন্ধান ও পরিশ্রমের পর গেটে স্বয়ং একবার পুতুলবাজি দেখাইয়াছিলেন। উইলহেলম্ মেইষ্টারের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই ক্রীড়ার আদ্যন্ত, ও এই ক্রীড়াজাত হৃদয়-ক্রিয়ার প্রশস্ত বর্ণনা আছে। দ্বাদশ বৎসর পরে জননী আত্ম-ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেছেন, "তোমাকে কেন পুতুলবাজি দেখিতে দিয়াছিলাম। সেই পুতুলবাজি দেখার পরিণামই—তোমার এই অদম্য নাটকানুরাগ।"

ধে।

ামু-

ডাকি।

ডাকি তোরে, জ্যোৎস্নাময়ী,
আয় কাছে আয়।
নিশীথে শুইয়া বুকে খেলিবি'ব কত সুখে
আবেশে অবশ হয়ে
দেখিববে তায়!
ডাকি তোরে, জ্যোৎস্নাময়ি,
আয় কাছে আয়।

২

ডাকি তোরে, রূপময়ি,
আয় কাছে আয়।
চেয়ে চেয়ে তরুমূলে ছেয়ে দিবি ফুলে ফুলে
কূলে কূলে দুলে নদী
লুটাইবে পায়।
ডাকি তোরে, রূপময়ি,
আয় কাছে আয়।

৩

ডাকি তোরে, প্রেমময়ি,
আয় কাছে আয়।
ভাসায়ে স্বপন তরী প্রেমের সাগর পরি,
ধীরে ধীরে বয়ে যাব
কে জানে কোথায়!
ডাকি তোরে প্রেমময়ি
আয় কাছে আয়।

৪

ডাকি তোরে, স্মৃতিময়ি,
আয় কাছে আয়

আসিয়া নন্দন হতে ভাসিয়া মলয় স্রোতে
পারিজাত-ফুল-মালা
পরাবি গলায়।
ডাকি তোরে, স্মৃতিময়ি,
আয় কাছে আয়।

৫

ডাকি তোরে, সুরময়ি,
আয় কাছে আয়।
জীবন মরণ ওরে ধীরে ধীরে বাজ স'রে
সুরে সুরে পশি বুকে
জগতের পায়।
ডাকি তোরে, সুরময়ি
আয় কাছে আয়।

শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

অতৃপ্ত বাসনা।

আর আমি এত দূরে দূরে থাকিতে পারিনা, আর কল্পনার ঘরে বাস করিতে পারি না। সংসারে কতদিন কল্পনা লইয়া বাস করা যায়? লোকে বলে শারীরিক ক্রিয়া হইতে মানসিক ক্রিয়া বিভিন্ন। আমি তাহা বুঝি না। আমি বুঝি বাহির অপেক্ষা ভিতর চিরস্থায়ী। বাহির নকল, ভিতর আসল। দর্শনে যাহাকে idea বলে আমি সেই ideaকেই real বলিয়া বুঝি। আমি বাহির বুঝি না—বাহিরের কিছু মানিনা। যদি সংসারে কিছু থাকে, তবে তাহা ভিতরে। সে ভিতরের পিপাসা কল্পনায় নিবারণ করিতে পারি না। আমার অন্তরে যে স্থান শূন্য রহিয়াছে, তাহা কল্পনা দ্বারা পূর্ণ হইবে না। প্রাণের সে শূন্য পূরণ করিতে প্রকৃত জিনিষ চাই—সে জিনিষ তুমি। তাই তোমার কাছে আসিয়াছি। আমি সংসারে অনেক পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, প্রাণের শূন্যতা কেহ পূর্ণ করিতে পারিল

না—তৃষিত প্রাণের পিপাসা কেহ মিটাইতে পারিল না। সংসারে কেহ আমার ক্রন্দন শুনিল না—সংসারে আমার দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহিল না। সেখানে ধনী মানী বিদ্বানের আদর—সেখানে পুণ্যাত্মা পবিত্রাত্মা ধার্ম্মিকের আদর। আমি মূর্খ, আমি গরিব, আমি দীন হীন পাপী আমার দিকে কে চাহিবে? সেখানে আমি ঘৃণিত—অপমানিত। শুনিয়াছিলাম তাহারা পাপীকে ঘৃণা করে না, শুনিয়াছিলাম তাহারা মানুষরে ভাই বলিয়া আদর করে, কিন্তু কোথায়। আমাকে দেখিয়াও কেহ ডাকিল না—কেহ চাহিল না। যে ফিরিয়া একবার দেখিল সেও বলিল—"ঐ দেখ জঘন্যপাপী আসিতেছে—ঐ দেখ ঘৃণিত কাঙ্গাল আসিতেছে।" সুতরাং আমি সেখান হইতে পলায়ন করিয়াছি; সেখানে নাকি সকলই প্রতারণা, তাই প্রতারণা না করিলে তথায় স্থান পাওয়া যায় না।

তুমিও কি সেইরূপ ঘৃণা কর, তাই এত দূরে দূরে থাক? আমি সংসারে এত দুঃখ কষ্ট সহিয়া ও তোমার জন্যই যে এ প্রাণ রাখিয়াছি—তাহা কি তুমি জান না? তুমি কি জান না যে তোমাকে লক্ষ্য করিয়াই এ জীর্ণ তরী এতদিন বাহিতেছি? তাহা যদি না হইত, তোমাকে পাইব এ আশা যদি না থাকিত, তবে অনেক দিন এ তরী ডুবাইতাম—তবে এতদিন অন্ধকার রাজ্যের প্রজা হইতাম। তোমাকে আমি মুখে কিছু বলিতে পারিনা—চাটুকারের ন্যায় তোমাকে তোষামোদ করিতে পারিনা—সংসারের নায়ক নায়িকের ন্যায়—"তোমাকে ভালবাসি"—"তোমায়"—প্রভৃতি মিষ্টি মিষ্টি কথা বলিতে পারিনা—এই কি আমার দোষ? তুমি কথা অপেক্ষা ভাব অধিক ভালবাস এই তো আমার বিশ্বাস। যখন নীরব নিশীথে সংসারে সকলে অচেতন—যখন প্রকৃতি স্থির—গম্ভীর—তখন শূন্য আকাশের দিকে চলিয়া প্রাণটা কেন হু হু করে উঠে? যখন জ্যোৎস্না-রাশিতে পৃথিবী ধৌত—প্রকৃতি পুণ্য সলিলে স্নাত—প্রেমের আনন্দে জগৎ তরঙ্গায়িত—চন্দ্র হইতে পৃথিবীতে, পৃথিবী হইতে নক্ষত্রে প্রেমের তরঙ্গ প্রবাহিত—তখন আমার ক্ষুদ্র হৃদয় কাহার জন্য উল্লাসে নৃত্য করে? যখন বাসন্তী উষায় কোকিলের কুহু কুহু ধ্বনিতে জগৎ প্লাবিত হয়—তখন কাহার কথা মনে পড়িয়া আমি শূন্যপানে চাহিয়া থাকি? যখন পিউ পিউ করিয়া পাপিয়ার তান দূরে দূরে অতিদূরে ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়ে—তখন কাহার প্রেম-

সংগীতের জন্য কর্ণ উৎসুক হয়? সে কি তোমার জন্য নহে? তুমি অন্তর-দর্শী হইয়া কি তাহা অস্বীকার করিতে পার?

আমার অনেক দিনের আক্ষেপ ছিল কাহাকেও "প্রিয়তম" বলিতে পারিতাম না—বাস্তবিক আমার বিশ্বাস ছিল যে কাহাকে জনমেও সে সম্বোধন করিতে পারিব না—কিন্তু তোমাকে দিয়া আর সে বিশ্বাস সে আক্ষেপ দূর করিয়াছি। তাকি তোমাকে বলি নাই? তোমাকে যে দিন "প্রিয়তম" বলিয়া ডাকিয়াছিলাম, সে দিন আমি কি আনন্দই পাইয়াছিলাম! সে দিন হৃদয়ে প্রেমের কি তাড়িতই বহিয়াছিল। আহা প্রিয়তম নিষ্ঠুর। তবু ও কি তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না? না না, এমন কথা কি আমি বিশ্বাস করিতে পারি? তোমাকে অবিশ্বাস। যদি কেহ আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে বলে তাহা ও পারি—কিন্তু "তুমি আমার" একথা অবিশ্বাস করিতে পারি না। তুমি ছাড়া আমার অন্য গতি যে আর নাই।

তবে কেন এত দূরে থাকিতে ভালবাস? আরও কি অধিক প্রেম—অধিক ভালবাসা চাও? আমি আর কোথায় পাইব? যাহা ছিল তাহাও অনেক দিন দিয়াছি। আমি কি তোমাকে প্রেমের বশে রাখিতে পারি! অনেক দিনই-ত বলিয়াছি—

"এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ,
তোমারে হৃদয়ে রাখিতে?"

তবে কেন? তুমি তো বিদুরের খুদেই সন্তুষ্ট হইয়া থাক, তবে আজ এ ভেদ কেন? একি তবে পরীক্ষা? এতদিনেও কি পরীক্ষা শেষ হইল না? কত কষ্ট করিয়া তোমার নিকট যাই—তাহা ত জান, তবুও পরীক্ষা কর? আমি যে মূর্ত্তি দেখিলে ভয় পাই—আমি যে বেশ দেখিলে শিহরিয়া উঠি—তুমি এখন সেই মূর্ত্তি সেই বেশই ধারণ করিয়া থাক। তোমার রাজরাজেশ্বর মূর্ত্তি দেখিলে আমি ভয় পাই—আমি গরিবকাঙ্গাল সেখানে কি করিয়া যাইব? তবুও প্রাণে প্রবোধ মানে না—ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে তোমার প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হই। সেখানে তোমার দ্বাররক্ষক জয় বিজয় প্রবেশ করিতে দেয় না—এ ছিন্ন বস্ত্রে এ মলিনবেশে কি আমি তোমার দরবারে যাইতে পারি? তোমার কার্পেটের মেজেতে কি এ ধূলিপূর্ণপদ লইয়া যাইতে সাহস হয়? আমি তা পারি না। তুমি কত দিন আমাকে এরকম কষ্ট দিবে? তুমি কি

বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে যাইবে না? মথুরা পরিত্যাগ করিয়া ব্রজ ধামে গমন করিবে না? রত্ন অলঙ্কার দেখিলে আমার আতঙ্ক হয়—তোমার গলে বনফুলের মালা দেখিতে চাই। প্রভো। আমার সে সাধ কি পুরিবে না? আমি কি নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে তোমার চরণতলে বসিতে পারিব না? বৃন্দাবনের কুসুমকুঞ্জে তোমার গলে বনফুলের মালা দেওয়া কি আমার ভাগ্যে ঘটিবে না?

তবুও তুমি বলিলে না! আমি কি করিয়া তোমার মনের ভাব বুঝিব? তবে কি তুমি জ্ঞান ও কর্ত্তব্যের পথে যাইতে বল? প্রেমে কি তোমাকে পাওয়া যায় না? তুমি যেমন কর্ত্তব্যপালন করিতে পার, আমি কি তাহা পারি? তুমি একাকী লক্ষ লক্ষ কর্ত্তব্যের ভারগ্রহণ করিয়াছ আমি ক্ষুদ্রজীব, আমি মর্ত্ত্যের কীট—আমি কি তাহা পারি? আমি বুঝি প্রেমই জ্ঞান—প্রেমই কর্ত্তব্য। প্রেম না হইলে কি জ্ঞান হয়? তুমি রত্নাকরকে আগে প্রেম দিয়েছিলে না—আগে জ্ঞানী করিয়াছিলে? প্রেমের ভিতরেই জ্ঞান। যে প্রেম তোমাতে মিশিয়া গেল—সে কি করিয়া তোমার জ্ঞান লাভ না করিয়া থাকিবে? যে সমস্ত জগৎ তোমাতে দেখিল—নিজে তোমাতে মজিল সেইত জগতের প্রকৃত জ্ঞান পাইল—তুমি "একমেবাদ্বিতীয়ং" একথা কি কল্পনা? তবে প্রেম আর জ্ঞান বিভিন্ন কি? আমি ভিন্ন বুঝি না। প্রেমে ভেদ নাই। মানব হইতে প্রকৃতি, প্রকৃতি হইতে মানব এক প্রেমেরই লীলা খেলা। আমি সেই খেলাকেই জ্ঞান বলি। তাহা যদি না বুঝি, তবে কি করিয়া জ্ঞান লাভ করিব? ইহা ছাড়া আর যদি কোন জ্ঞান থাকে তাহা আমি চাই না। তুমি তো চিরকালই প্রেমের আদর করিয়াছ, তবে আবার আমার প্রতি এ ভান কেন? জগাই মাধাইএর কোন্ জ্ঞান দেখিয়া তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়াছিলে? গুহক চণ্ডাল কোন্ দর্শন ও বিজ্ঞানে পণ্ডিত ছিল? তবে আজ এ ছলনা কেন? আর ছলনায় চলিবে না। অনেক দিন আশায় আশায় রহিয়াছি। অনেক কষ্টে বুক বাঁধিয়া ছিলাম—আর পারি না। তুমি সকলকে আদর কর—সকলের কাছে বসিতে পার—আমিই কি কেবল অপরাধী? আমি সকলের সঙ্গে হিংসা করি না। করিলেই বা তুমি শুনিবে কেন? যখন তুমি সকলকে আদর কর—সকলের সঙ্গে থাকিয়া কথা বল, তখন আমি দূরে থাকিয়া সে সব দেখি—দেখিয়া কি কষ্ট হয় না? কষ্ট হইলে কি করিব?'

কষ্ট হউক,—তুমি সকলকে আদর কর—তোমার শত শত কর্ত্তব্য তুমি পালন কর, কিন্তু একবার কি আমার দিকে চাহিতে তোমার অবসর হয় না? সংসারে আমি তোমার কি কিছুই নই? তুমি রাজা হইয়া রাজ্য পালন কর, কিন্তু দয়াল হইয়া কি দুঃখীর দিকে চাহিবে না? আমি তোমার ধন ঐশ্বর্য্য চাহি না—তোমার বৈকুণ্ঠের প্রাসাদ চাহি না—আমার ক্ষুদ্র কুটীরে তোমাকে দেখিতে চাই। শত শত জন শত শত তোষামোদ বাক্যে তোমায় যে প্রার্থনা করে—আমি "তুমি" বলিয়া সে প্রার্থনা করিব। শত উপকরণে তোমায় যে চরণ পূজিত হয়, আমি এক ফোঁটা চোখের জল দিয়া তাহা ভিজাইব। শত শত বাদ্যযন্ত্রে তোমার যে আরতি হয়, আমি কেবল শঙ্খের শব্দে তাহা সমাপন করিব। আমার এ প্রার্থনা—আমার এ বাসনা কি পূর্ণ হইবে না?

বলিতে "সময় হয় নাই—আরও অপেক্ষা কর।" আমি আর যে পারি না। আমি আর এতদূরে দূরে থাকিতে পারিনা—আর শূন্য প্রাণে সংসারে ঘুরিতে পারি না। তোমাকে ছেড়ে আর এখন ঘর কন্না চলে না, তুমি না হইলে আর প্রাণের তৃষা মিটেনা। এক্ষুদ্র হৃদয় তোমার জন্য —আমি সকল সময়ে তোমারি দিকে চাহিয়া আছি। সুখে দুঃখে পাপে পুণ্যে শান্তিতে অশান্তিতে আমি তোমারি। তুমি ছাড়া আর কাহাকেও স্পর্শ করিতে চাহি না। এক্ষুদ্র হৃদয়ে এ পাপ হৃদয়ে, আহ্বান করিয়া যদি তোমার অবমাননা করিয়া থাকি ক্ষমা করিও, কিন্তু তবুও তোমাকে চাই। এআশা আমার পক্ষে দুরাশা হইতে পারে, কিন্তু ইহা পূর্ণ করা তোমার অসাধ্য নহে। ক্ষুদ্র হইয়াও আমি অনন্তকে হৃদয়ে বহন করিব—পাপী হইয়াও আমি পুণ্যালোক সম্ভোগ করিব—আমার এ দুরাশা—আমার এ বাসনা কি চিরকালে অতৃপ্ত থাকিবে?

মহরম।*

নুরনবী মহম্মদ, শিষ্য মণ্ডলী মধ্যে বলিলেন, "তোমাদের কাহারো পুত্র, আমার জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র-হাসেনকে বিষ-প্রয়োগ, ও কনিষ্ঠ দৌহিত্র হোসেনকে

---

* বিষাদ-সিন্ধু দুই ভাগ। মীর মশাররফ হোসেন প্রণীত।

অস্ত্রাঘাতে নিধন করিবে।" শিষ্যগণ ভয়-ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভু কাহার পুত্র কর্ত্তৃক এরূপ সাংঘাতিক কার্য্য সংঘটিত হইবে?" গুরু কহিলেন, "আমার প্রিয়তম শিষ্য মাবিয়ার পুত্র এজিদ্ কর্ত্তৃক।" মাবিয়া ধর্ম্ম-সাক্ষী করিয়া কহিলেন "জীবনে বিবাহ করা দূরে থাকুক, স্ত্রীলোকের মুখ-দর্শন করিব না।"

পরে, একদিন মাবিয়া, মূত্র-ত্যাগান্তে বিষাক্ত কুলুখ'* লইয়া, দুশ্চিকিৎস্য রোগাক্রান্ত হইলেন। মহম্মদ, মন্ত্র-দ্বারা রোগীকে আরোগ্য করিতে গিয়া, দৈববাণী শুনিলেন, "এ রোগের ঔষধ স্ত্রী-সহবাস, অন্য ঔষধ নাই।"

রোগী স্ত্রী-সহবাসে অসম্মত, অথচ আত্মহত্যা মহাপাপ। ভাবিয়া চিন্তিয়া এক অশীতি-বর্ষীয়া বৃদ্ধাকে বিবাহ করিয়া জীবন রক্ষা করিলেন। বিধি-লীলায় সেই অশীতি-বর্ষীয়া কালক্রমে পুত্রবতী হইল। মাবিয়া, মায়া-পাশে বদ্ধ হইয়া পুত্রহত্যা করিতে সক্ষম হইলেন না, কিন্তু পূর্ব্বকথাও ভুলেন নাই। এজিদকে, হাসেন হোসেনের নিকট হইতে দূরে রাখিবার নিমিত্ত, তিনি মদিনা-ত্যাগ করিতে মনন করিলেন।

মহম্মদের কন্যা ফতেমা-বিবি, মহাবীর হজরত আলীর পরিণীতা। মাবিয়া, আলীর জ্ঞাতি-ভ্রাতা। আলীর নিকটে, মাবিয়া নিজ সংকল্প প্রকাশ করিলে তিনি সন্তুষ্ট-চিত্তে মাবিয়াকে নিজ অধিকৃত দমস্ক রাজ্য দান করিলেন। মহম্মদ বলিলেন, "যথায় যাও, বিধি বাক্য অখণ্ডনীয়।"

কাল-ক্রমে মহম্মদ, ফতেমা ও আলীর স্বর্গারোহণ হইল। আলী-পুত্র জ্যেষ্ঠ হাসেন, মদিনার সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। এদিকে দমস্ক-নগরে এজিদ্ ক্রমশ বয়ঃপ্রাপ্ত হইল।

দমস্কের একজন সামান্য প্রজার নাম জোব্বার। তাহার জয়নাব নাম্নী এক সুরূপা সাধ্বী স্ত্রী ছিল। যুবরাজ এজিদ্ সেই জয়নাবকে দেখিয়া উন্মাদ-প্রায় হইল। বাদশাহ মাবিয়া বৃদ্ধা মহিষীর মুখে এ সংবাদ অবগত হইয়া বলিলেন, "সহস্র এজিদ্ এই পাপ-কারণে প্রাণ-ত্যাগ করিলেও, আমার বিন্দু-মাত্র অশ্রুপাত হইবে না। এবং একটা পাপী জগত হইতে বহিষ্কৃত হইল বলিয়া, জগত পিতার নামে সহস্র সহস্র সাধুবাদ করিব।"

---

* জলের পরিবর্ত্তে "কুলুখ," অর্থাৎ ঢিল ব্যবহার করাই মুসলমানদিগের শাস্ত্র সঙ্গত বিধি।

মহিষী বলিল, "মন্ত্রী মরিয়ানের সহিত পরামর্শ করিয়া, ধর্ম্ম ও পুত্র-প্রাণ উভয়ই রক্ষা করিব।" মাবিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

এজিদ, জোব্বারের নিকট "কাসেদ"*-হস্তে সাহীনামা পাঠাইল। পত্রাজ্ঞা-মত জোব্বার রাজ-দরবারে আসিলে, সমাদরে খাসমহলে গৃহীত হইল। মহিষীর শিক্ষামত সরল-হৃদয় মহারাজ বলিলেন, "জোব্বার, আমার ইচ্ছা যে, তোমাকে আদরে চিরদিন রাজ-পরিবার মধ্যে রাখি।" জোব্বার সে আজ্ঞা শিরধার্য্য করিল। উপাসনার কাল অতীতপ্রায় দেখিয়া, বাদশাহ, "উজীরের মুখে আমার মনোগত অভিপ্রায় শুনিয়া, তোমার প্রতিজ্ঞা পালন করিও," এই বলিয়া উঠিয়া গেলেন। মরিয়ান, এজিদের শিক্ষামত বলিল, "রাজ-সরকার হইতে নিত্য-নিয়মিত ব্যয়োপযোগী ধন-সম্পত্তি, ও রাজকন্যা সালেহার সহিত আপনার বিবাহ দিয়া, এ স্থানে আপনাকে চিরস্থায়ী করা হইবে।"

জোব্বার আনন্দে বিহ্বল। ইঙ্গিত মাত্র পুরোহিত ও আমত্যবর্গ উপস্থিত। মঙ্গলবাদ্য বাজিল। পুরোহিতের আদেশ মত, এজিদ পাত্রী-পক্ষের প্রতি-নিধি, এবং মরিয়ান ও জনৈক সভাসদ সাক্ষী হইল।†

---

* সুধীর, সত্যবাদী, মিষ্ট-ভাষী ও সুশ্রী না হইলে কেহ "কাসেদ" হইতে পারে না। দূতের নিম্নেই তাহার মান্য।

† গ্রন্থকার বলেন, "আমাদের (মুসলমানদের) বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত পাত্র পক্ষীয় কোন পুরুষ বা স্ত্রীর—পাত্রীকে দেখিবার প্রথা নাই। পাত্র পূর্ণ-বয়স্ক হইলে, পুরোহিতের উপদেশ ক্রমে যে দেশে হউক না, কয়েকটী কথা আরবী ভাষায় উচ্চারণ করিতে হয়। পাত্রী-পক্ষীয় অভিভাবকগণের মনোনীত প্রতিনিধি পাত্রের সেই কথাগুলির প্রত্যুত্তর স্বরূপ কয়েকটী কথা বলিবেন। বিবাহের মূল কথা এই যে, প্রস্তাব আর স্বীকার (ইজাব কবুল)। পাত্রী যে বিবাহে সম্মত হইয়াছেন, তাহার প্রমাণ-স্বরূপ দুটী সাক্ষীর প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন, আমাদের (মুসলমানদের) বিবাহে অন্য কোন প্রকার ধর্ম্মালোচনা, কি মন্ত্র-পাঠ, কি অন্য প্রকারের ক্রিয়া নাই। তবে লৌকিক প্রথানুসারে ধর্ম্মভাবে শিথিল-যত্ন ব্যক্তিগণ, কি কেহ আমোদের অঙ্গ মনে করিয়া যে কিছু অনুষ্ঠান করেন, তাহা শাস্ত্র-সঙ্গত নহে।"

সাক্ষীদ্বয়-সহ প্রতিনিধি অন্তঃপুরে গিয়া, পাত্রীর স্বীকার্য-বাক্য স্বকর্ণে শুনিয়া আসিয়া, সভায় প্রকাশ করিয়া, "বিবি সালেহা পরম্পরায় শুনিয়াছেন, জোব্বার সাহেবের আর একটী স্ত্রী আছে। ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে জয়নাবকে পরিত্যাগ না করিলে তিনি এ বিবাহে সম্মতি দিবেন না।' ঘূর্ণিত মস্তিষ্ক জোব্বার কহিল, "তালক-নামা (স্ত্রী-পরিত্যাগ পত্র) এখনি লিখিয়া দিতেছি।"

তালক-নামা লইয়া, প্রতিনিধি সাক্ষীদ্বয়-সহ পুনর্ব্বার অন্তঃপুরে গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা আসিয়া, সালেহার উক্তি-স্বরূপ কহিল, "যে ব্যক্তি ধন-লোভে বা মান সম্ভ্রমের আশায় নিরপরাধা-স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে, অকাতরে বিশুদ্ধ দাম্পত্য-বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে—এমন বিশ্বাস-ঘাতক, স্ত্রী-বিনাশক নর-পিশাচকে সালেহা বিবাহ করিতে সম্মত নহে।' সভাস্থ সকলেই সেই অস্তিত্ব-শূন্য রাজকুমারীকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। জোব্বারের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে আর গৃহে ফিরিল না, ফকিরী লইল। কথা ছুটিল, জয়নাব বিধবা-বেশে পিত্রালয়ে গেল।

মুসলমান-শাস্ত্রমতে এদ্দাৎকালে (বৈধব্য-ব্রত) চারিমাস দশ দিন। বিলম্ব অসহ্য। বিবাহ-পয়গামে (প্রস্তাবে) নিষেধ নাই। এজিদ, কাসেদ, পাঠাইল।

মোসেলেম ছুটিতেছেন। মরু প্রান্তে, প্রভূত ধনী ও রূপবান আক্কাস, তৃষ্ণাতুর মোসেলেমকে ঈশ্বরের দিব্য দিয়া, তাঁহাকেই জয়নাবের জন্য ঘটকত্বে বরণ করিল। আবার অরণ্য-পথে সাহাজাদা এমাম হাসেন, বাল্যবন্ধুকে পাকড়া করিয়া কহিলেন, "আমার ধন নাই, রূপ নাই, সর্ব্ব-শেষে এ গরিবের প্রস্তাবটীও তুলিতে ভুলিও না।" মোসেলেম, একেবারে তিন তিনটী পাত্রের সংবাদ লইয়া, জয়নাবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। পরিত্যক্তা কহিল, 'ধন-সম্পত্তির আকাঙ্ক্ষা করি না। ঐহিক পারত্রিক উভয় রাজ্যের রাজা প্রভু হাসেনেরই দাসীত্ব গ্রহণ করিব।' এজিদ্‌কে এ সংবাদ দিতে, মোসেলেমের সাহসে কুলাইল না, মাবিয়াকে দিলেন।

বাদশাহ মাবিয়া পীড়া-শয্যায় শায়িত। প্রেম-কল্পনায় ব্যস্ত পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন, "দূত ফিরিয়াছে। এমন ধর্ম্ম-পরায়ণ ও বুদ্ধিমতীর কথা আমি এ পর্য্যন্ত শুনি নাই। যাঁহার পদাশ্রয়ে পরকালে মুক্তি,

পাইবেন সেই প্রভুর দৌহিত্র হাসেনের 'পয়গামই' জেনাব কবুল করিয়াছেন।" এজিদ্ সরোষে কহিল, "অসত্য। সেই নিরন্ন অক্ষম হাসেন, জয়নাবকে বিবাহ করিবে? আমি দামস্কের রাজ-পুত্র, ইহার সমুচিত প্রতিফল অবশ্যই দিব।" মাবিয়া সক্রোধে বলিলেন "নারকী, তুই কোন রাজার পুত্র? তোর পিতা যাঁহাদের দাসানুদাস, যাঁহাদের অন্নে আজিও জীবিত, তাঁহাদের প্রতি তুই একপ নর্কশ* কথা কহিতে লজ্জিত হইলি না? সম্মুখ হইতে দূর হ। হায়! হায়! প্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইল। করুণাময়, পাপ-পুরী হইতে আমাকে উদ্ধার কর।"

মাবিয়াকে পীড়া-শয্যা হইতে আর উঠিতে হইল না। তাঁহাদিগের পৈত্রিক রাজ্য—সেই হাসেন-হোসেনের হস্তেই এই দণ্ড প্রত্যর্পণ করিবেন, ইহা স্থির করিয়া, তিনি মদিনায় দূত পাঠাইলেন। নির্জ্জন পথে, এজিদ-কর্তৃক প্রথমে দূত হত ও দ্বিতীয় দূত মোসেলেম বন্দী হইলেন। জোবায়েরের মুখে এ সংবাদ পাইয়া, হাসেন-হোসেন দামস্কে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মাবিয়ার মৃত্যু হইল।

এজিদ্ প্রথম দিন বার' দিয়াই, দরবার-মধ্যে খাতুক হস্তে মোসেলেমের শিরশ্ছেদ করিল। এবং বক্তৃতায় বলিল, "শুধুই হাসেনকে নহে, মহম্মদ-বংশের একটী প্রাণীকেও জীবিত রাখিব না।" হাসেন-হোসেনকে মন্ত্রী-দ্বারা পত্রে লিখিল, 'তোমরা আজিও পর্য্যন্ত মক্কা-মদিনার খাজানা, ও অধীনতা স্বীকার করিয়া উপঢৌকন পাঠাইতেছ না কেন? উপস্থিত হইয়া, নতশিরে রাজ-সিংহাসন চুম্বন করিবে, ও এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া এজিদ্ নামদারের নামে 'খোৎবা* পড়িবে।'" হোসেন এই পত্র পাইয়া মহাক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। হাসেন বলিলেন, "নিরুত্তরই এ পত্রের সদুত্তর।" হোসেন পত্রখানি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দূতের হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন।

এজিদ্ জানিত বৃক্ষ নির্মূল, মূল জীবিত থাকিবে না। আগে-

* প্রতি শুক্রবার দুই প্রহরের পর, মুসলমানগণ আরবী ভাষায়, প্রথম ঈশ্বরের গুণানুবাদ, দ্বিতীয় উপাসনা, পরে স্বজাতীয় রাজার নামোচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করে। অধুনা, দিল্লীর শেষ সম্রাট সাহ আলমের নামে 'খোৎবা' পাঠ হয়।

আগেই যুদ্ধের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিল। দূত-মুখে হোসেনের উক্তি শুনিয়া, ও ছিন্ন পত্র দেখিয়া তদ্দণ্ডেই মদিনা আক্রমণের আদেশ দিল। অসংখ্য সুশিক্ষিত অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য জয় জয় রবে ছুটিল। অগ্রে অলিদ সেনাপতি পদে ও মন্ত্রী মরিয়ান এজিদের প্রতিনিধিস্বরূপ বরিত হইল।

এজিদ-সৈন্য কিয়দ্দিবস পরে এক প্রভাতে মদিনার অদূরে পৌঁছিল। রণ বাদ্য-শব্দে মদিনাবাসীরা জাগিল, সৈন্য সমূহ দেখিয়া বুঝিল এজিদের। হাসেন হোসেনের নিকট সংবাদ গেল। তাঁহারা 'জেহাদ' (ধর্ম্ম যুদ্ধ) ঘোষণা করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে 'সহিদ' (ধর্ম্ম যুদ্ধে শোণিতপাতে মৃত) হইবার জন্য, সমস্ত মদিনাবাসী সাজিল। বয়সের বিচার নাই, নরনারীর প্রভেদ নাই।

হাসেন, অনুজ ও আত্মীয়গণ সহ 'রওজা-মোবারকে' (মহম্মদের পবিত্র সমাধি-প্রাঙ্গণে) উপাসনা করে, অশ্বারোহণে রাজপথে বাহির হইলেন। নগর-বাসীরা ব্যগ্রতা সহকারে তাঁহাকে ঘেরিয়া বলিল "আমরা বাঁচিয়া থাকিতে আপনাকে শত্রু-সম্মুখে যাইতে দিব না।" কেহ কাহারো কথা শুনিল না, মানিল না। 'আল্লা হু আকবর'-রবে সকলেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে ছুটিল। হাসেন, নারীগণকে অনেক বুঝাইয়া, গৃহে ফিরিতে আদেশ করিলেন। তাহারা ঈশ্বরের নিকট হাসেনের বিজয়-প্রার্থনা করিতে করিতে গৃহে ফিরিল।

হাসেন যুদ্ধ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার আর যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। শত্রুপক্ষ ছিন্ন ভিন্ন। 'সহিদ,' আহত ও মৃত শত্রু-সেনার যেন রক্ত স্রোত বহিতেছে কেহ কিছু মানিতেছে না, মদিনাবাসীরা, পলাতকদিগের পশ্চাতে উন্মাদের ন্যায় অসি হস্তে ছুটিতেছে। হোসেনের শ্বেত অশ্ব ও শুভ্র বস্ত্র রক্তবর্ণে পরিণত। আর বিপক্ষ নাই। মদিনাবাসীরা বিজয় নিশান উড়াইয়া 'লা এলাহা এল্লাল্লা মহম্মদ রছুলোল্লা' বলিতে বলিতে নগরে ফিরিল। বিজয়ীদিগকে পুষ্প-বর্ষণ করিয়া, পুরনারীরা অভ্যর্থনা করিল।

বিশ পচিশটী পলাতকের মধ্যে, মন্ত্রী মরিয়ান ও সেনাপতি অলিদও ভাগ্যক্রমে এড়াইয়াছিল। মরিয়ান, এজিদের নিকট ভগ্নদূত পাঠাইল। বলিয়া দিল, "মহারাজকে বলিও, মরিয়ান মরে নাই! হাসেনকে বধ না করিয়া, মরিয়ান দমস্কে ফিরিবে না।" এদিকে, ময়মুনা নামী একটী

বন্ধাকে, সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পারিতোষিক-লোভে বশীভূত করিয়া, হাসেন-হত্যায় নিযুক্ত করিল।

পূর্ণ এক গণ্ডা পর্য্যন্ত স্ত্রী—মুসলমান-শাস্ত্র-সঙ্গত। হাসেনের এক কম এক গণ্ডা। প্রথমা হাসনে বানু, দ্বিতীয়া জায়েদা, তৃতীয়া সেই জয়নাব। রূপসী জায়েদা বড়ই সপত্নী-দ্বেষিনী। হাসনে বানু প্রধানা, সকলেরই মাননীয়া। জায়েদা, বিদ্বেষিনী হইলেও, তাঁহার কিছুই করিতে পারিত না। না পারুক, সে ভাবিত, সেই পতি-সোহাগিনী। কিন্তু, জয়নাবকে নবাগতা দেখিয়া, স্বামী-সোহাগে সন্দেহ জন্মিল। জয়নাব, তাহার চক্ষু শূল, তাহার সুখ-পথের কণ্টক স্বরূপ হইল। কিন্তু, হাসনে বানু জয়নাবকে ভাল বাসিতেন। হাসনে বানুর এক মাত্র পুত্র আবুঅল কাসেম। কাসেম পূর্ণ-বয়স্ক, অবিবাহিত, অস্ত্র-বিশারদ, পিতার আজ্ঞাবহ, পবিত্র-স্বভাব ও সর্ব্বগুণে গুণান্বিত। পবিত্র বংশের পুণ্য-চূড়া। জায়েদা বন্ধ্যা।

ময়মুনা, জায়েদার সপত্নী-বিদ্বেষানলে ইন্ধন দিয়া বুঝাইল, যে, পতীকে সপত্নীর হস্তে দেওয়া অপেক্ষা, বরং বিধবা হওয়াই শ্রেয়। জায়েদা, ময়মুনা-দত্ত বিষ মধুর সহিত স্বামীকে খাওয়াইল। ঈশ্বরের কৃপায় হাসেন সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন। পরদিন আবার বিষ-মিশ্রিত খর্জ্জুর খাওয়াইল। বিষের জ্বালায় অস্থির হইয়া, হাসেন পুনর্ব্বার ‘রওজায়’ যাইয়া, ঈশ্বর-সমীপে আরোগ্য-প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনা সফল হইল। কিন্তু, এবার আর জায়েদার আচরণ বুঝিতে বাকী রহিল না। কাহাকে কিছু না বলিয়া, আব্বাস প্রভৃতি কয়েকজন সঙ্গী-সহ, মদিনা ত্যাগ করিয়া, মুসাল নগরস্থ ভজনালয়ে গিয়া বাস করিলেন।

জনৈক এক-চক্ষুহীন বৃদ্ধ, মহম্মদের জাতি-শত্রু ছিল। মহম্মদের অবর্ত্তমানে, তাহার ক্রোধ হাসেন-হোসেনের উপর অর্পিয়াছিল। কপটে, মুসালে আসিয়া, হাসেনের শিষ্য হইল। সুবিধা ক্রমে, একদিন হাসেনকে বিষাক্ত-বর্শা দ্বারা লক্ষ্য করিতেছে, আব্বাস ইহা দেখিতে পাইয়া, ত্বরিতে হাসেনকে টানিয়া উঠাইলেন। কিন্তু হস্ত নিক্ষিপ্ত বর্শা, বুকের পরিবর্ত্তে পদতলে বিদ্ধ হইল। আব্বাস দ্রুত যাইয়া বৃদ্ধকে ধরিল। হাসেন বলিলেন, “যাহা হইবার হইয়াছে, বৃদ্ধকে ছাড়িয়া দাও। আমায় রওজায় লইয়া চল। সেথায় থাকিলে কোন বিপদেই পড়িতাম না।”

'রওজার' ধূলা মাখিয়া, হাসেন মৃত্যু হইতে উদ্ধার পাইলেন বটে ; কিন্তু, ক্ষত-স্থান সম্পূর্ণ আরোগ্য হইল না। ক্ষত-স্থান দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমশঃ উত্থান-শক্তি রহিত হইলেন। হোসেন, জ্যেষ্ঠকে নিজ গৃহে রাখিয়া, শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। হাসনে বানু স্বয়ং পথ্যের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। একদিন নিশীথে সকলে নিদ্রিত হইলে, রাক্ষসী জায়েদা, আবার এজিদ-প্রেরিত, ময়মুনা-দত্ত উগ্র বিষ, হাসেনের পানীয় জলে মিশ্রিত করিয়া দিল।

নিমেষ-পরে, হাসেন, পিতামাতা ও মাতামহকে স্বপ্নে দেখিয়া জাগিয়া উঠিলেন। তৃষার্ত্ত হইয়া, জলপান করিলেন। আর রক্ষা পাইলেন না। অনুজকে আলিঙ্গন করিয়া পুত্রকে একখানি কবচ দিয়া, পরিজনবর্গকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, জায়েদাকে নির্জ্জনে বলিলেন 'চলিলাম। তুমি সুখে থাক। আমি ক্ষমা করিলাম, ঈশ্বর তোমায় ক্ষমা করুন।" পরে, "মাতামহ স্বর্গ-দ্বারে আমায় ডাকিতেছেন" বলিতে বলিতে, তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। মদিনায় হাহাকার উঠিল। সংবাদ দমস্কে গেল। শত্রুর মৃত্যু-উপলক্ষে এজিদ অকাতরে ধন-রত্ন বিতরণ করিতে লাগিল। মদিনার প্রান্ত-সীমাস্থ পর্ব্বত-গুহায় ক্রমশঃ দমস্ক-সৈন্য জমিল।

হাসেনের মৃত্যুর ত্রিরাত্রে, জায়েদা ময়মুনার সঙ্গে, মরিয়ানের সাহায্যে দমস্কে পলাইল। সাদরে দরবারে গৃহীত হইল। ময়মুনা সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক পাইল। পূর্ব্ব অঙ্গীকার মত, সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ও মণিময় অলঙ্কারাদি দিয়া, এজিদ, জায়েদাকে নিজ বাম পার্শ্বে বসাইল। বলিল, "আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিলাম।" ত্বরিতে, সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া কহিল, "যে নারী সামান্য অর্থলোভে পতির প্রাণ-বিনাশ করিতে পারে সে রাক্ষসীকে আমি কিরূপে সহধর্ম্মিণী-পদে বরণ করিব? আমি দণ্ডধর রাজা, শত্রু হউক মিত্র হউক, পতি ঘাতিনীকে স্বহস্তে উপযুক্ত শাস্তি দিব।' তৎক্ষণাৎ জায়েদার মস্তক-শূন্য দেহ সভামধ্যে লুটিতে লাগিল। আর, ময়মুনাকে তৎপরে মৃত্তিকায় অর্দ্ধ-প্রোথিত করিয়া, স্বর্ণমুদ্রাঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ করা হইল।'

হজরত হোসেন ভ্রাতৃ-শোকে কাতর; দিবারাত্র 'রওজায়' পড়িয়া শোক করিতেছেন। 'রওজায়' প্রবেশ করিতে, শত্রুপক্ষের কেহই সাহস করিল

না। 'রওজায়' হোসেনের মৃত্যু হইবে না। বিধি-লিপি কে খণ্ডন করিবে? হোসেন ভাবিলেন, "এ শোক-সন্তপ্ত হৃদয় লইয়া, যুদ্ধ-জয়ী হইতে পারিব না। অকারণে মদিনাবাসীরা আমার জন্য প্রাণবিসর্জ্জন করিবে। কিছু দিন সপরিবারে, কুফা-নগরে প্রিয়তম বন্ধু আবদুল্লা জেয়াদের আশ্রয়ে থাকিয়া এ শোক-সন্তপ্ত হৃদয় শান্ত করি।"

এজিদ্, হোসেনের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া, কুফা-রাজ আবদুল্লা জেয়াদকে অধীনত্ব হইতে মুক্তি, ও তিন লক্ষ মুদ্রা উপহার দিয়া বশীভূত করিল। জেয়াদ রটাইল, "হজরত হোসেনকে আমার রাজত্ব উৎসর্গ করিয়া আমি তাঁহার ভৃত্য-স্বরূপ রহিলাম।" এ রটনা মদিনায় গেল। এ বিপত্তি-কালে, জেয়াদের এ আচরণে, হোসেন আরো মুগ্ধ হইয়া, মদিনা-ত্যাগ করিতে ব্যস্ত হইলেন।

কিন্তু, মদিনাবাসীরা হোসেনকে ছাড়িতে চাহিল না। অনেকে, জেয়াদের এ আচরণে বিবিধ গুঢ়-অভিসন্ধি দেখিল। শেষে, মদিনাবাসীর পরামর্শ মত, দ্বিতীয় মোসেলেম, সহস্র মদিনাবাসীর সহিত, এ অভিসন্ধির গুঢ় কারণ নির্ণয় করিতে কুফায় গেলেন। আবদুল্লা বড়ই চতুর। সে মোসেলেমকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিল, স্বয়ং ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। মোসেলেম, বর্ষকাল কুফায় থাকিয়াও, জেয়াদের চাতুরী ভেদ করিতে পারিলেন না। হোসেনকে লিখিলেন, "কোন কপটতাই দেখিলাম না।" হোসেন, মহা সন্তুষ্ট হইয়া, কুফা-মুখে চলিলেন। সঙ্গে স্ত্রী-পুরুষ, বালক বালিকা, সকলসমেত ষষ্টি-সহস্র মদিনাবাসী চলিল। এজিদ্ আবদুল্লা ওমরের নেতৃত্বে লক্ষাধিক সৈন্য দামস্ক কারবালার পথে পাঠাইল।

এদিকে, এজিদ্ আদেশে, মবিয়ান ও অলিদ সসৈন্যে মদিনা-ত্যাগ করিয়া কুফা-নগর আক্রমনার্থে আসিল। জেয়াদ মোসেলেমকে বলিল, "প্রভু হোসেন তো আজিও আসিলেন না। শত্রু-সৈন্য নিকটবর্ত্তী, এক্ষণে কি আদেশ হয়?" মোসেলেম নিজ সহস্র সৈন্য লইয়া, নগর প্রান্তে এজিদ-সৈন্য আক্রমণার্থে গেলেন। জেয়াদ বলিল, "আমি সৈন্য-সংগ্রহ করিয়া পশ্চাতে যাইতেছি।" মোসেলেমের পরাক্রমে শত্রু-সৈন্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পলায়নোন্মুখ হইল। এমন সময়ে জেয়াদ, লক্ষাধিক সৈন্য লইয়া

মোসেলেমকে পশ্চাদ্ভাগ হইতে আক্রমণ করিল। মহাবীর মোসেলেম সহস্র মদিনাবাসীর সহিত 'সহিদ' হইলেন।

হোসেন নিয়তির পথে চলিয়াছেন। কুফায় যাইতে, দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া, সদলে এক প্রান্তরে গিয়া পড়িলেন। দেখিলেন, সম্মুখে মহা-প্রান্তর ধুধু করিতেছে; কোথাও জীব-জন্তুর চিহ্ন নাই, বৃক্ষ নাই, ছায়া নাই। পার্শ্বে নিবিড় বন। সহসা হোসেনের অশ্ব-পদ মৃত্তিকায় দাবিয়া গেল। হোসেনের নির্ভীক হৃদয় শিহরিয়া উঠিল। মাতামহের ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়িল; "যেথায় তোমার অশ্বপদ দাবিয়া যাইবে, যেথায় বায়ুতে অবিরাম হায় হায় শব্দ শুনিবে, সেই স্থানের নাম দাস্ত কার্‌বালা জানিও। সেই কার্‌বালাই তোমার মৃত্যুস্থান।" হোসেন প্রকাশ্যে বলিলেন, "আর কেন, তাম্বু গাড়।" কেহ কাষ্ঠ, কেহ জল অন্বেষণার্থে গেল।

কাষ্ঠান্বেষণকারীগণ রক্তাক্ত কুঠার হস্তে আসিয়া বলিল, "হজরত, যে বৃক্ষেই কুঠারাঘাত করি, অজস্র রক্ত-ধারা নির্গত হয়। এমন কখন দেখি নাই, শুনি নাই।" হোসেন বলিলেন, "এই সেই কার্‌বালা। শীঘ্রই আমরা 'সহিদ' হইয়া স্বর্গসুখভোগ করিব। ভীত হইও না, ঐ কাষ্ঠই সংগ্রহ কর। বৃক্ষ-নির্যাস রক্তে পরিণত হইয়াছে।" জলান্বেষণকারীরা শূন্যহস্তে আসিয়া বলিল, "কোথাও জল-বিন্দু নাই। অদূরে ফোরাত-নদী দক্ষিণবাহিনী হইয়া বহিতেছে সত্য, প্রভো; কিন্তু লক্ষাধিক সৈন্য সশস্ত্রে নদীকূল রক্ষা করিতেছে।" ক্রমে চারিদিকে 'জল' 'জল' চিৎকার উঠিল। হোসেন বলিলেন, "ঈশ্বরের নামামৃত ভিন্ন পিপাসা-নিবৃত্তির আর অন্য উপায় নাই।" এইরূপে নয়দিন কাটিল।

হোসেনের স্ত্রীর নাম সাহার বানু। পাঁচপুত্র—আলী আক্‌বর, আলী আস্‌গার, আবদুল্লা, জয়নাল আবেদীন, ও সর্ব্ব-কনিষ্ঠটী দুগ্ধ-পোষ্য। এক কন্যা—নাম সখিনা। দশম দিন, সাহার বানু দুগ্ধ-পোষ্য শিশুটী স্বামীর ক্রোড়ে দিয়া বলিলেন "আমরা পিপাসা সহ্য করিব। স্তনে দুগ্ধ নাই; ইহাকে বিন্দুমাত্র জল দিয়া রক্ষা কর।" হোসেন বলিলেন, "জীবনে বিধর্ম্মীর নিকট যাচ্‌ঞা করি নাই। দেখি।" তিনি শিশুটী ক্রোড়ে লইয়া, অশ্বারোহণে নদীকূলে গেলেন। নিজ পরিচয় দিয়া নদীরক্ষকদিগকে বলিলেন, "আমি তোমাদের নিকট অপরাধী [illegible] পারি; দুগ্ধপোষ্য নিরপরাধী।

উহাকে রক্ষা কর।" শত্রু নিক্ষিপ্ত শরে, শিশুর বক্ষ-বিদারিত হইল। হোসেন মৃতশিশু সাহার বানুর ক্রোড়ে আনিয়া দিলেন।

ওহাব, রহমান্, জাফর প্রভৃতি, মদিনার প্রধান বীরেরা দেড় লক্ষ শত্রু সৈন্য আহান্নমে (নরকে) পাঠাইয়া, আপনারা 'সহিদ' হইলেন। কিন্তু ফেরাত নদী অধিকৃত হইল না। অবশেষে হাসেন-পুত্র কাসেম যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত হইলেন। পিতৃব্য-দেব বারম্বার নিষেধ করিলেন। শেষ, মাতৃ-আজ্ঞা লইতে আদেশ করিলেন। হাসনে বানু আশীর্ব্বাদে আজ্ঞা দিলেন। পিতৃব্য বলিলেন, "কাসেম, একটু অপেক্ষা কর। আমি অগ্রজের নিকট প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি; আমাকে প্রতিজ্ঞা হইতে উদ্ধার করিয়া, পরে যুদ্ধে যাইও।"

সেই যোদ্ধবেশেই, সেই অদূরস্থ শত্রুদিগের জয়োল্লাস,ও পিপাসিত স্বজনাদিগের হাহাকার মধ্যে, কাসেম সখিনাকে বিবাহ করিলেন। জলাভাবে অশ্রুজলেই বর-কন্যার বরণ হইল। হাসনে বানু ও সাহার বানু একবার প্রাণ ভরিয়া নব-দম্পতীকে দেখিয়া লইলেন। কাসেম সখিনাকে বলিলেন, "বীর-কন্যা, বীর-জায়া, মুহূর্ত্তে সপ্তদিবসের পিপাসা ভুলিয়াছি। এ নব পিপাসা এ জীবনে আর পরিতৃপ্ত হইবে না।"

মহাবীর কাসেম রণক্ষেত্রে অসংখ্য অগণ্য শত্রু নিপাত করিলেন, কেহই আর সম্মুখে আসিতে সাহস করিল না। সম্মুখে কাহাকেও না পাইয়া, নদীকূল-রক্ষীদিগকে আক্রমণ করিলেন। ক্রমে তাহারাও পলাইতে লাগিল। বুঝি—ফেরাত-নদী অধিকৃত হইল! শত্রু পক্ষ পশ্চাত হইতে অনবরত শর-নিক্ষেপ করিতে লাগিল। আর হইল না। কাসেমের দেহ অবসন্ন, চক্ষু অন্ধকার দেখিতেছে, অশ্ব-রশ্মি শিথিল হইল। শিক্ষিত অশ্ব প্রাণপণে দৌড়িয়া আরোহী সমেত শিবির সম্মুখে আসিল। কাসেম বলিলেন, "সখিন", তোমার স্বামীর 'সাজানা'* দেখ।" সখিনার আলিঙ্গন মধ্যে কাসেমের প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইল। সখিনা কাসেমের রক্তাক্ত মৃতদেহে লুটিয়া লুটিয়া কাঁদিতে লাগিল, "তোমার এই পবিত্র রক্ত মাখিয়া চিরজীবন এই বেশেই থাকিব।" হোসেন মূর্চ্ছান্তে বলিলেন, "অস্ত্র কই?"

জ্যেষ্ঠপুত্র কিশোর-বয়স্ক আলী আকবর, অনেক অনুনয় বিনয়ের পর যুদ্ধ-

---

* লাল পোষাক। লাল পোষাক পরিয়াই বিবাহ করা, মুসলমান-রীতি।

যাত্রানুমতি পাইলেন। তিনি একেবারে ফেরাত্‌ কূল-রক্ষীদিগকে আক্রমণ করিলেন। কেহই তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিল না। ফেরাত্ অধিকার নিশ্চয়। কিন্তু দৈব প্রতিকূল। ঠিক এমন সময়ে, কুফারাজ আবদুল্লা জেয়াদ লক্ষাধিক সৈন্য লইয়া উপস্থিত। জেয়াদ সসৈন্যে তাঁহাকে ঘেরিল। পলায়িত রক্ষীরা পুনরায় একত্রিত হইল। আলী আকবর সৈন্য-ব্যূহ ভেদ করিয়া শিবিরে ফিরিলেন। পিতাকে বলিলেন, "পিপাসায় প্রাণ যায়—জল।" হোসেন বলিলেন, "দশ দিন অশ্রুজল ছিল, আজ তাহাও নাই। বৎস, আমার জিহ্বায় যদি রস থাকে, পান কর।" আলী আকবর পিতার জিহ্বা চুষিয়া, পুনর্ব্বার রণক্ষেত্রে গেলেন। আবার বহু শত্রু নিপাত করিলেন। শত্রুপক্ষ তাঁহাকেও দূর হইতে গুপ্ত-লক্ষ্য করিয়া তীরবিদ্ধ করিল। শূন্য পৃষ্ঠে অশ্ব শিবিরে আসিল।

আলী আসগার ও আবদুল্লা ভ্রাতৃশোকে আকুল হইয়া, পিতৃ-অনুমতি না লইয়াই শত্রু-সম্মুখীন হইলেন। বহু শত্রু নিপাত করিয়া, তাঁহারাও 'সহিদ' হইলেন। শূন্যপৃষ্ঠে অশ্বদ্বয় শিবিরে ফিরিলে, সপ্তম বর্ষীয় শিশু জয়নাল আবেদীন, কাঁদিতে কাঁদিতে শত্রু-সেনাভিমুখে দৌড়াইল। হোসেন পুত্রকে ধরিলেন। সাহার বানুর হস্তে জয়নালকে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, "সৈয়দ বংশ নির্ম্মূল হইলে কেয়ামতের দিনে পিতা ও মাতামহের নিকট কি বলিব?" সাহার বানু শিশুকে সাবধানে রাখিলেন।

হোসেন, কাহারও জন্য আর শোক প্রকাশ না করিয়া, উপাসনান্তে স্বয়ং যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত হইলেন। মহম্মদের শিরস্ত্রাণ, হজরত আলীর অঙ্গত্রাণ, দাউদ পয়গম্বরের কটিবন্ধ, সাহাব পয়গম্বরের পদচ্ছদ ধারণ করিলেন। পরিজনবর্গ কাঁদিয়া উঠিল। হোসেন বলিলেন, "এই যুদ্ধ-যাত্রাই আমার জীবনের যদি শেষ যাত্রা হয়, আর বৃথা যুদ্ধ করিও না। আমার জন্য কেহ শোকার্ত্ত হইও না। ঈশ্বরের চরণ-ছায়ায় তোমাদিগকে রাখিয়া গেলাম।"

হোসেনকে রণ-প্রবৃত্ত দেখিয়া বিধর্ম্মীগণ কাঁপিতে লাগিল। রহমান প্রভৃতি—যাহারা তাঁহার সম্মুখীন হইল, এক এক অসি-ঘাতে অশ্বসহ দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভূমে লুটাইল। রণাঙ্গণে আর কাহাকেও না দেখিয়া, শত্রু শিবিরাভিমুখে ছুটিলেন। তাঁহার অস্ত্রাঘাতে ও অশ্বপদাঘাতে অসংখ্য সৈন্য প্রেতপুরে প্রস্থান করিল। অবশিষ্টেরা বন-মধ্যে লুকাইল। তখন তিনি

ফেরাত-কুল-রক্ষীদিগের উপর পড়িলেন। তাঁহারাও তাঁহার সম্মুখে ক্ষণকাল তিষ্ঠিতে পারিল না। ফেরাত নদী অধিকৃত হইল।

পিপাসাতুর হোসেন অশ্ব হইতে জলে নামিলেন। অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া জল মুখের নিকটে আনিলেন; সমস্ত কথা মনে পড়িল। যে বিন্দু মাত্র জলের জন্য তাহার প্রিয়ঙ্কর আত্মীয় বন্ধু, প্রাণাধিক পুত্র-ভ্রাতস্পুত্র প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছে, সে জল আবার তিনি পান করিবেন? যে বিন্দু মাত্র জলের জন্য শত সহস্র বালক বালিকা ও অক্ষম স্ত্রীপুরুষ মৃত-প্রায়, তাহাদিগকে জল পান না করাইয়া, সর্ব্বাগ্রে তিনিই জলপান করিবেন? তাঁহার প্রাণের মায়া কি এতই অধিক? না। নদীর জল নদীতেই পড়িল তীরে উঠিলেন। আকাশের দিকে চাহিয়া, কে জানে কি ভাবিলেন। পবিত্র শিরস্ত্রাণ, অঙ্গত্রাণ, কটিবন্ধ, পদচ্ছদ দূরে নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্রশস্ত্র কূলে পড়িয়া রহিল, তিনি অশ্বের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। অশ্ব, প্রভুর এ অবস্থা দেখিয়া, ঝর ঝর কাঁদিতে লাগিল।

বিপক্ষেরা দূর হইতে সমস্তই দেখিল। কয়েকজন তীর ধনু হস্তে ঘেরিল। হোসেন ধনুর্দ্ধারীদিগকে দেখিতেছেন, তবু—তবু সেই স্থিরনেত্রে, অন্যমনস্ক-ভাবে, ধীরে ধীরে পদ-ব্রজে অবণ্যমুখে চলিয়াছেন। জেয়াদ প্রথম বিষাক্ত শর নিক্ষেপ করিল, ক্রমে অজস্র নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল; তবুও হোসেনের চমক নাই। সীমারের নিক্ষিপ্ত এক বিষাক্ত শরে, হোসেনের গ্রীবা স্পর্শ-ভেদ হইল, তিনি সেই অন্যমনস্কভাবে ক্ষত স্থানে হাত দিলেন। চমক ভাঙ্গিল, এ জল নহে, রক্ত! সভয়ে চতুর্দ্দিক চাহিলেন, দেখিলেন, তিনি অসংখ্য শত্রুসৈন্য পরিবেষ্টিত; বুঝিলেন তিনি অস্ত্র-হীন আবার অন্যমনস্ক হইয়া আকাশের দিকে দুই তিনবার চাহিলেন। সহসা ভূতলে পড়িয়া গেলেন। ক্ষত জ্বালায়, পিপাসার-জ্বালায়, শোকতাপের-জ্বালায় অধীর হইলেন। বিপক্ষ-পক্ষ ভাবিল, হোসেনের মৃত্যু-যন্ত্রণা উপস্থিত।

কিন্তু, জেয়াদ, ওমার প্রভৃতি কেহই হোসেনের শিরশ্ছেদন করিতে সাহস করিল না। পাষাণ হৃদয় সীমার খঞ্জর (এক প্রকার ছোরা)-হস্তে হোসেনের বক্ষের উপর গিয়া বসিল। হোসেন চক্ষুরুন্মীলন করিয়া বলিলেন, 'মহম্মদের মতাবলম্বী হইয়া, এমাম হোসেনের বক্ষের উপর পা রাখিয়া বসিলে?' সীমার কর্কশ-স্বরে উত্তর দিল, "আমি মহম্মদকে চিনি

না; এজিদ্ কে তোমার মুণ্ড দেখাইতে পারিলে, আমি লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক পাইব।" হোসেন বলিলেন, "এই কারবালাই আমার মৃত্যু-স্থান। একটু অপেক্ষা কর। নিশ্বাস ফেলিতে দাও।" সীমার অপেক্ষা করিল না। হোসেনের কণ্ঠে বারম্বার খঞ্জরাঘাত করিতে লাগিল। কিন্তু, কণ্ঠের তিলার্দ্ধ মাত্র চর্ম্মও কাটিতে পারিল না। হোসেন বলিলেন, "অনর্থক কেন কষ্ট দাও, শীঘ্র সংহার কর।" সীমার বলিল, 'তাহাই তো ইচ্ছা, পারিতেছি না কেন?"

হোসেন বলিলেন, 'তোমার বক্ষাবরণ উন্মোচন কর। দেখি, তুমি আমার কাতেল (হন্তা) কি না। মাতামহ বলিয়াছিলেন, যাহার বক্ষ লোম শূন্য, তাহার হস্তেই আমার মৃত্যু হইবে।" সীমারের নির্লোম বক্ষ দেখিয়া, হোসেন দুই হস্তে নিজ চক্ষু আবৃত করিয়া বলিলেন, "আমার কণ্ঠ-চ্ছেদ হইবে না, মাতামহ কর্ত্তৃক এই স্থান বহুবার চুম্বিত হইয়াছে আমার গলদেশের পশ্চাদ্ভাগে—শরাঘাতে যে স্থান হইতে রক্তধারা ছুটিতেছে সেই স্থানে খঞ্জর বসাও, শীঘ্রই আমার মস্তক বিচ্ছিন্ন হইবে।"

তীর-বিদ্ধ স্থানে খঞ্জর স্পর্শ করিবা মাত্র হোসেনের দেহ হইতে শির বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। ত্রিজগত বিদীর্ণ-প্রায় হইয়া শব্দ উঠিল, "হায় হোসেন, হায় হোসেন!" সীমার কম্পান্বিত কলেবরে হোসেনের মস্তক লইয়া চলিয়া গেল।

দুইখানি ছবি।

(বিরহ।)

সাধ নাহি হয় কভু হৃদয়ের তিষা,
পরিপূর্ণ সদা হের পান পাত্র মোর!
ঢাল ঢাল আরো সুধা, পিয়ে হই ভোর,
মধুময় হ'য়ে গেছে আমার সে আশা!
যত কাঁদি তত যেন নূতন পিপাসা
ঢালে হৃদে নব নব প্রণয়ের কথা,
মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে থাকি, শুনি কি বারতা—

দেবতা শিখাবে বুঝি দিয়াছে সে ভাষা!
এস এস প্রিয় সখি, প্রাণের দেবতা,
হৃদয়-কুসুম মোর লও উপহার;
জনম ভরিয়া আমি পূজি গো তোমার
সে রাঙ্গা চরণ দুটী, গঠেছে বিধাতা!
কি-অমিয়া দিয়ে গড়া আকুল মুখানি,
বিরহে—মিলন যেন সহিছে পরাণী!

(মিলন।)

মধুর মধুর বড় অলস তনুয়া,
মুরছি পড়িতে যেন চাহে সে সতত;
হৃদয়ের ভারে হৃদি পড়িছে নুইয়া,
এখন কি করি বল সহি আর কত!
বাঁধিল—বেড়িল মোরে উর্ণাজাল, হায়!
স্বাধীন হৃদয় মোর পরাধীন হ'লো,
গেল—গেল, সব গেল, অমরতা গেল—
তুচ্ছ ধরা পরে বাঁচি পতঙ্গের প্রায়।
দাও সখি, দাও ছেড়ে বাহুর বন্ধন,
মোহের আবেশে আর ডুবায়ো না মোরে,
পূজিব তোমারে আমি আজীবন ভোরে,
আজিকে বিদায় দাও ও মধু-চুম্বন।
কি-বাসনা দিয়ে গড়া তোমার মুখানি,
মিলনে—বিরহ-শেল দিতেছে গো হানি!

শ্রী সুরেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

—o—

অভিনয় সমালোচনা।

বীণা রঙ্গভূমি। এবারকার বীণা রঙ্গভূমিতে যে কয়েক খানি নূতন নাটকের অভিনয় হইতেছে, তাহার মধ্যে "মীরাবাইয়ের" সমকক্ষ কেহই নহে। আমরা এই নাটকের অভিনয় দেখিয়া বিশেষ সন্তোষলাভ করিয়াছি। গ্রন্থের কোন কোন স্থল আমাদের অনুমোদনীয় না হইলেও নাটকখানি যে অভিনয়োপযোগী হইয়াছে, তাহা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে অনেকগুলি গান আছে গানগুলির রচনা ও সুরলয় প্রশংসার্হ, বিশেষত তান সেনের গীত কয়েকটী শ্রবণ করিয়া আমরা মোহিত হইয়াছি। অভিনয় কালে বিজ্ঞান সাহায্যে অনেক অদ্ভুত ঘটনাও প্রদর্শিত হইয়া থাকে। আমরা সকলকেই "মীরবাই" দেখিতে অনুরোধ করি।

বঙ্গ রঙ্গভূমি। আমরা এই রঙ্গভূমির দিন দিন উন্নতি দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই সম্প্রদায়ের চেষ্টা, উদ্যমও এবং উৎসাহ প্রশংসার্হ। যখন অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী রঙ্গভূমিতে সামাজিক নাটকের স্রোত চলিয়াছে, সেই সময় গীতিমূলক পৌরাণিক নাটকের অভিনয় দ্বারা যে ইঁহারা সুখ্যাতি লাভ করিতেছেন—ইহা অভিনয়ের পক্ষে অল্প বাহাদুরী নহে। এই রঙ্গভূমি "জন্মাষ্টমীর" অভিনয় দ্বারা দর্শকবৃন্দকে যেরূপ মোহিত করিয়াছে, সম্প্রতি জগজ্জন পূজিত সুপ্রসিদ্ধ "শকুন্তলার" অভিনয় করিয়া সেইরূপ মোহিত করিতেছেন। এই সম্প্রদায় সর্ব্বসাধারণের উৎসাহ পাইবার উপযুক্ত।

এমারেল্ড থিয়েটার। এই থিয়েটারে অনেকগুলি বহুদর্শী ও প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও অভিনেত্রী আছেন, এবং ইহার দৃশ্যপটও অতি সুন্দর, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে তত্রাচ ইহার অভিনয়াদি সর্ব্বসাধারণের সেরূপ হৃদয়গ্রাহী হয় না। কেবল অর্থ ব্যয় করিলে যে অভিনয় ভাল হয় না এই থিয়েটারই তাহার দৃষ্টান্তস্থল। ভরসা করি, ইহার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবেন।

ষ্টার থিয়েটার। 'প্রফুল্লের' অভিনয় দেখিয়া আমরা যেরূপ সন্তোষ লাভ করিয়াছিলাম সম্প্রতি "হারানিধির" অভিনয়েও সেইরূপ সন্তোষলাভ করিয়াছি। ধন্য গিরিশ বাবু! ধন্য তোমার লেখনী!